পরিচয়

শ্রাবণ ১৩৫১—পৌষ ১৩৫১

ষাণ্মাসিক সূচী

লেখক — বিষয়

চতুর্দশ বর্ষ—১ম সংখ্যা।
শ্রাবণ, ১৩৫১

পরিচয়

পূর্ব্বকথা

এই সংখ্যা হইতে পবিচযেব নবপর্য্যায় শুরু হইল। সবকাবী আদেশে ক্ষীণতনুত্বই তাহাব একমাত্র লক্ষণ নহে, সম্পাদকীয় পবিবর্ত্তনও লক্ষ্যযোগ্য। ইহাব আগেও পবিচয়েব সম্পাদনায় ও পবিচালনায় পবিবর্ত্তন ঘটিযাছে। ত্রৈমাসিক রূপে প্রথম আবির্ভূত হইযা পবিচয় মাসিকে পবিণত হইয়াছে। আদি সম্পাদক সুধীন্দ্রনাথ দত্ত কালক্রমে হিবণকুমাব সান্যালকে সহযোগীরূপে গ্রহণ কবিয়া পবে সম্পাদকত্ব হইতে পূর্ণ অবসব গ্রহণ কবিয়াছেন। পবিচয়েব পবিচালকত্বে দু'-তিনবাব হাতবদল হইয়াছে। এই পবিবর্ত্তনগুলি গুরুত্ববিহীন না হইলেও ইহাদেব কাবণ ছিল প্রধানতঃ ব্যক্তিগত সুবিধা-অসুবিধা। বর্ত্তমানে যে পবিবর্ত্তন ঘটিল তাহা অনেকাংশে পবিচয়-পবিচালনাব মর্ম্মগত। ইহা বুঝাইযা বলাব জন্য এই পূর্ব্বকথাব অবতাবণা।

বলা যাইতে পাবে, পবিচয-প্রকাশেব সূত্রপাত হইল সেইদিন যেদিন সুধীনবাবুর সহিত নীবেন্দ্রনাথ রায়েব প্রথম আলাপ হইল সংযোজক বন্ধু গিবিজাপতি ভট্টাচার্য্যেব মধ্যস্থতায়। চৌদ্দ বৎসর আগে সে এক গ্রীষ্মেব সকাল। তিনজনে বহুক্ষণ ধবিয়া আলোচনা হইল সাহিত্যেব, বাংলা, ইংবাজী ও ইউবোপীয। ফলে একটি বিষযে তিন-জনকে একমত দেখা গেল যে বাংলাভাষায় পত্রিকা-প্রাচুর্য্য সত্বেও এমন একখানিও পত্রিকা নাই যাহাকে ইংবাজী বা ফবাসী রিভিউ-পত্রিকাব সমকক্ষ হওয়া দূবে থাকুক সমশ্রেণীব বলিয়া গণ্য করা চলে। তথনই গৃহীত হইল একরূপ একখানি উচ্চাদর্শের রিভিউ বাহিব কবিবাব সঙ্কল্প; যাহাতে বাংলাভাষাব মাধ্যমে বিশ্বেব চিন্তানায়কগণের ভাবধাবা দেশেব মধ্যে প্রচাবিত হইবে ও সমসাময়িক বাংলা সাহিত্যের গতিপ্রকৃতিব নিবপেক্ষ বিশ্লেষণে পাঠকেব রুচি উন্নত কবা যাইবে। সেই সঙ্গে অবশ্য চেষ্টা চলিবে

গল্প উপন্যাস কবিতা ইত্যাদি সাহিত্যের সৃজনশীল বিভাগকে পুষ্ট করার। কিন্তু প্রধান দৃষ্টি থাকিবে প্রবন্ধ ও সমালোচনার উপর, কারণ সৃজনী-সাহিত্য ত সম্পাদনার তাগিদে গড়িয়া তোলা যায় না।

সেই দিনই স্থির হইল, পিছনে একটি সাহিত্যিক গোষ্ঠী না থাকিলে এরূপ পত্রিকা প্রকাশের প্রচেষ্টা বিড়ম্বনামাত্র। এই গোষ্ঠীর যাঁহারা অন্তর্ভুক্ত হইবেন ব্যক্তিগত মতামতের বিভিন্নতা উপেক্ষা না করিয়া তাঁহারা মিলিত হইবেন সাবেগ সাহিত্যপ্রীতিতে ও অনাবেগ বিচারনিষ্ঠায়। প্রতি শুক্রবারের সন্ধ্যায় এই গোষ্ঠীর বৈঠক বসিবে, তাহাতে চেষ্টা হইবে সাহিত্যরসিক সুধীবর্গের সহযোগিতায় পরিচয়ের বিষয়বস্তুকে কূপমাণ্ডুক্য ও গ্রাম্যতা দোষ হইতে মুক্ত রাখিবার।

এই প্রচেষ্টায় প্রথম হইতেই উৎসাহের সহিত যোগদান করিয়াছিলেন চারুচন্দ্র দত্ত, সত্যেন্দ্রনাথ বসু, ধূর্জ্জটিপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়, সুবোধচন্দ্র মুখোপাধ্যায়, প্রবোধচন্দ্র বাগচী, সুশোভন সরকার, বিষ্ণু দে ও শ্যামলকৃষ্ণ ঘোষ। হিরণকুমার সান্যাল যোগ দেন প্রথম সংখ্যা প্রকাশিত হইবার পর।

পরিচয় নামটি নীরেনবাবুর দেওয়া ও গোষ্ঠীর অনুমোদনে গৃহীত। পত্রিকাটি ত্রৈমাসিক হওয়াই বাঞ্ছনীয় বিবেচিত হইল যাহাতে প্রবন্ধকারেরা ও পুস্তক-পরিচয় বিভাগের লেখকেরা পড়িবার ও লিখিবার জন্য উপযুক্ত অবসর পান। সমালোচিতব্য পুস্তকের তালিকা ইউরোপ ও আমেরিকার সাময়িক পত্রাদি হইতে সযত্নে চয়ন করা হইত, আর তাহাদের আলোচনার ভার দেওয়া হইত এমন সব লেখককে নির্ব্বাচিত বিষয়ে যাঁহাদের বলিবার মতো কথা আছে ও লিখিবার মতো ভাষা আছে। ব্যতিক্রম ঘটে নাই এ দম্ভ সাজে না, তবু এটুকু নিশ্চয় বলা যায় পরিচয়ের পুস্তক-আলোচনা ধীমান্ পাঠক সমাজে তৃপ্তির সাড়া জাগাইতে পারিয়াছিল।

বাংলা সাহিত্যের সমালোচনাতেও পরিচয় একদিকে বন্ধুপ্রীতি অন্যদিকে শত্রুবিদ্বেষ এড়াইয়া চলিতে পারিয়াছে। দল থাকিলেই দলাদলি করিতে হয়—পরিচয়ের অস্তিত্বই এ উক্তির ব্যর্থতার নিদর্শন। বিভিন্ন মতের প্রবন্ধ ও বিভিন্ন আঙ্গিকের কবিতা নির্ব্বাচনে উচ্চ ও উদার আদর্শ, ছন্দানুবাদে ও ছন্দ-বিতর্কে পারদর্শিতা, গল্প ও উপন্যাসে সমাজ-বোধের বাস্তবতা—এই বিশেষত্বগুলি পরিচয়কে যে মর্য্যাদা আনিয়া দিয়াছে তাহা বাংলা-দেশের অতি অল্প পত্রিকার ভাগ্যে মিলিয়াছে। এজন্য পরিচয় তাহার অনুরাগী পাঠক মণ্ডলীর নিকট চিরদিন কৃতজ্ঞ থাকিবে।

তের বৎসর ধরিয়া পরিচয়-গোষ্ঠীর বৈঠক প্রতি শুক্রবারে বসিয়া আসিতেছে, তাহার অনিয়ন্ত্রিত যতিভঙ্গ ঘটে নাই—বাংলাদেশের সাহিত্যিক গোষ্ঠীর ইতিহাসে ইহার তুলনা আছে কিনা বলা কঠিন। পরিচয়ের পৃষ্ঠায় যাঁহাদের রচনা প্রকাশিত হয় নাই এমন অনেক ব্যক্তিও সাময়িকভাবে পরিচয় গোষ্ঠীতে যোগ দিয়া তাহাকে সরস রাখায় সহায়তা করিয়াছেন। এ প্রসঙ্গে শাহেদ সোহ্‌রাওয়ার্দী, বসন্তকুমার মল্লিক (ওরফে মল্লিকদা), তুলসীচরণ গোস্বামী ও অপূর্ব্বকুমার চন্দের নাম উল্লেখযোগ্য। কলিকাতা প্রবাসী কয়েকজন ইংরাজ সাহিত্যিক মাঝে মাঝে শুক্রবারে আসিয়া আসর সরগরম করিয়াছেন, যেমন এডওয়ার্ড টমসন, ম্যালকম মাগারিজ ও হমফ্রে হাউস। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুও একাধিকবার শুক্রবারের বৈঠককে স্বকীয় মহিমায় উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। শ্যামলবাবুর ডায়েরীতে এই বৈঠকগুলির বিবরণ লিপিবদ্ধ আছে।

কিন্তু পরিচয়-সভার সাপ্তাহিক অধিবেশনে এযাবৎ কোনও ব্যাঘাত না ঘটিলেও এই পত্রিকার পূর্ব্বতন লেখক ও উৎসাহকগণ কেহ কেহ নানা কারণে দূরে চলিয়া গেলেন, যাঁহারা রহিলেন, তাঁহাদেরও অনেকের উৎসাহে ভাঁটা পড়িল। তদুপরি বাধিল যুদ্ধ ও তাহার প্রচণ্ড আলোড়নে যে নিঃসংশয় সাহিত্যিক আবেগ ছিল পরিচয়-পত্রিকার প্রাণ তাহা অনেকটা মন্দীভূত হইল। এদিকে সুধীন্দ্রনাথ দত্তও জরুরি কার্য্যের তাগিদে সাহিত্যক্ষেত্র হইতে একরূপ অবসর গ্রহণ করিলেন। তিনি ছিলেন পরিচয়-গোষ্ঠীর কেন্দ্র, পরিচয়ের লেখক-মণ্ডলীর প্রধান উৎসাহক। তাঁহার ও অন্যান্য বন্ধুবর্গের অভাবে পরিচয় ক্ষতিগ্রস্ত হইল সন্দেহ নাই কিন্তু পাঠক ও লেখকগণের সম্মিলিত উৎসাহে পরিচয় যে শক্তি সঞ্চয় করিয়াছিল তাহা একেবারে নষ্ট হইল না। ক্রমশঃ নূতন লেখকগণের অভ্যাগম হইয়াছে। পুরাতন লেখকেরা অনুপ্রাণিত হইয়াছেন নূতন উৎসাহে। পুরাতন ও নবীনের সমাবেশে পরিচয়-গোষ্ঠী নূতন প্রাণলাভ করিয়াছে, নূতন দৃষ্টিভঙ্গীর প্রভাবে দৃঢ়তর বন্ধনে আবদ্ধ হইয়াছে। এই নূতন সাহিত্যিক প্রেরণার বাহকরূপে পরিচয় পত্রিকার যে-নব পর্য্যায়ের প্রবর্ত্তন হইল এই সংখ্যা তাহারই সূচনা।

বাংলা নাট্যকলার নূতন সূচনা

বাংলা নাট্যকলার উপর আমাদের অনেকের দরদ আছে। কিন্তু তা নিয়ে গৌরব করবার মত নিদর্শন আমাদের বেশী নেই। এর কারণ অনেক, তা আমরা বুঝি। যে-সব সামাজিক-রাষ্ট্রিক কারণে নাট্যকলা স্বাভাবিক ভাবে গড়ে ওঠে, আমাদের ভাগ্যে সে সব কারণ জোটে নি। আবার এক কালে আমাদের দেশে নাট্যকলার যে বিশেষ রূপটি প্রকাশ লাভ করেছিল তার ঐতিহ্যও বেঁচে নেই। বাংলা "যাত্রা"ও মরতে বসেছে, থিয়েটারী ঢং গ্রহণ করে তা কোনো রকমে তবু টিকে থাকতে চায়। অথচ বাংলা থিয়েটারও খুব শক্তিশালী জিনিস নয়—যদিও সমস্ত ভারতবর্ষে নাকি আমাদের 'সাধারণ রঙ্গমঞ্চই' প্রধান রঙ্গমঞ্চ।

বাংলা রঙ্গমঞ্চ বা বাংলা নাট্যকলার ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করবার দরকার এখানে নেই। বাংলার নূতন সাহিত্যের মত বাংলার নাট্যকলারও নূতন প্রেরণা আসে পাশ্চাত্য সাহিত্যের ও জীবনের সঙ্গে আমাদের পরিচয়ে। সেক্স্পীয়র পড়ে যে বাঙালী মেতে যায়, তারা নাট্যকলা সংবন্ধে উদাসীন হয়ে থাকলেই, আশ্চর্য হবার কথা হত। কাজেই নাট্যকলা সৃষ্টির প্রয়াসও প্রথম থেকেই আমরা করেছি। কিন্তু নাট্যকলা বড় বেশি রকম সামাজিক শিল্প—সাহিত্যের মত তা ব্যক্তির সৃষ্টি নয়, নাট্যকলা সম্মিলিত সৃষ্টি। তাকে এজন্য সমন্বিত শিল্প বলা যায়। নাট্যসাহিত্য, অভিনয়-কলা, ও প্রযোজন-শিল্প, অন্তত এই তিন কলার সমন্বয় তাতে চাই। আর চাই সঙ্গে সঙ্গে দর্শকেরও সহযোগিতা। এ যুগে বাজারের 'ভাও' বুঝে এ সব কলাকেও কাটতে-ছাঁটতে হয়। দর্শক সমাজের রুচির উপর তাই নাট্যকলারও রূপ নির্ভর করে। বলা বাহুল্য, সামাজিক পরিবেশের সঙ্গে আর্থিক কারণেও তাই নাট্যকলা আবার জড়িত। মোটের উপর, এত বেশি পরিমাণে 'সামাজিক জিনিষ' বলেই আমাদের পক্ষে নাট্যকলা সৃষ্টি সহজ হয়নি। আর তা না হলে নাট্যসাহিত্যও ঠিক লেখা হয় না— প্রত্যেক কলাই তো অন্য কলার সঙ্গে জড়িত। তথাপি, বাংলা দেশে 'সাধারণ রঙ্গমঞ্চ' চলছে; তার বাইরেও সৌখীন নাট্য পরিষদ অনেক রয়েছে। আর দু' ক্ষেত্রেই গুণীর অভাব হয় নি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের সঙ্গে যাঁরা সংযুক্ত ছিলেন তাঁদের মধ্যে কেউ লেখার জন্য, কেউ অভিনয় নৈপুণ্যের জন্য স্মরণীয় হয়ে আছেন। সাধারণ রঙ্গমঞ্চের বাইরেও বহু স্মরণীয় নাম রয়েছে। বাংলার নাট্যকলা জন্মেছিল তাঁদের চেষ্টায়

বেলগাছিয়ার বাগানে; ঠাকুরবাড়ি আর শেষ দিকে শান্তিনিকেতন-বিশ্বভারতী তাতে নূতন প্রেরণা জুগিয়েছে; আর শত শত ছোট বড় সৌখীন অভিনয় ক্ষেত্রে, পাড়ার বখাটে ছোকরারা, গ্রামের বাবুরা, কলেজের ছাত্ররা, তাকে পরিপুষ্ট করেছে।

আমাদেরই জীবনে আমরা বাংলা নাট্যকলার তবু তিনটা যুগ দেখেছি; আজ তা স্মরণ করতে পারি। সাধারণ রঙ্গমঞ্চে তখনো গিরীশবাবুর শেষ যুগ, অমৃতলাল বসু, দানীবাবুর যুগ চলেছে। যে স্তরের অভিনেতা; অভিনেত্রী নিয়ে তারা কাজ চালাতেন, তাঁদের দর্শক সমাজও ছিল যে স্তরের, তাতে তাঁদের শক্তিকে শ্রদ্ধা না করে পারা যায় না। রঙ্গালয়ে রঙ্গলোভী, আমোদ প্রিয় দর্শকেরা তখনকার অভিনয় দেখত, শিক্ষিত রুচি প্রায়ই তাতে তৃপ্ত হত না। কিন্তু বাংলা নাট্যকলার ইতিহাসে এক নূতন ঘটনা 'ফাল্গুনীর' প্রথম অভিনয়, 'ডাক ঘরের' অভিনয়। তার নাট্য কথা, তার অভিনয়কলা, বিশেষত তার মঞ্চসজ্জা—সূক্ষ্ম সৌন্দর্য পিপাসাকে তখন পরিতৃপ্ত করেছিল। সাধারণ রঙ্গমঞ্চ তত সূক্ষ্ম জিনিস গ্রহণও করতে পারত না, পরিবেশনও করতে পারত না। রবীন্দ্র অনুপ্রাণিত নাট্যকলা সাধারণের জিনিস হল না। তবে অসাধারণের রসবোধকে তা জাগ্রত করে; আর তাতেই আবার শিক্ষিত সাধারণের রস-বোধকে উন্নত করে। সেই শিক্ষিত সাধারণের স্তরে—খাঁটি মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকের মধ্যে—তৃতীয় যুগে নেমে এসে দাঁড়ালেন শিশিরকুমার আর তাঁর সুযোগ্য সহকর্মীরা। তিনি এই মধ্য স্তরে সূচনা করলেন নাট্যকলায় মধ্যবিত্তের যুগ। সেদিন মনে হয়েছিল বাংলায় সত্যই বুঝি নাট্যকলার নবজন্ম হবে—বাংলা নাট্যকলার এবার সত্যকারের আবির্ভাব দেখতে পাব।

তা হল না। কারণ অনেক ছিল। ছোট বড় কারণ হিসাব করে লাভ নেই। মূলের কারণটিই আজ স্পষ্ট। বাংলার মধ্যবিত্ত কাল্‌চারের তখন সঙ্কটকাল এসে গেছে। বরাবরই তার গোড়ায় মাটি ছিল কম। তার প্রেরণা বেশিটাই আমাদের মনোভূমি থেকে নেওয়া;—আর সে মনোভূমি তৈরী হয়েছিল পাশ্চাত্য জীবন ও সাহিত্যের সঙ্গে সম্পর্কে, সজ্ঘাতে। তাতে সাহিত্য সৃষ্টি সম্ভব হয়েছে। মোটামুটি সাহিত্য একজনেই সৃষ্টি করে, শিক্ষিত লোকেরা পড়ে। কিন্তু নাট্যকলা দশ-জনের জিনিস, তার সৃষ্টি হয় কলা-সমন্বয়ে; আর তার সার্থকতা আবার এক বড় দর্শক-সমাজের গ্রহণ শক্তির উপর নির্ভর করে। এই কারণেই বরাবর আমাদের নাট্যকলা দুর্বল ছিল। শুধু মধ্যবিত্তের আসরও নাট্যকলা-সৃষ্টির পক্ষে যথেষ্ট

প্রশস্ত আসর নয়। তাতেও আবার শিশিরকুমার যখন এলেন তখন সেই মধ্যবিত্ত শিক্ষিত সমাজে ভাঙন ধরেছে—বাংলার মধ্যবিত্তদের তখন নিজের শক্তিতেও আস্থা নেই; আর ইউরোপের যে জীবন ও সৃষ্টিক্ষেত্র থেকে তারা প্রেরণা আহরণ করত, ইউরোপের সেই জীবন ও সৃষ্টিক্ষেত্রেও তখন ভাঙন ধরেছে। শিশিরকুমারের 'মধ্যবিত্ত' বাংলা নাট্যকলা সৃষ্টির চেষ্টা—শিক্ষিত ভদ্র বাঙালীর জন্য সাধারণ রঙ্গমঞ্চ প্রতিষ্ঠার চেষ্টা—খানিকটার বেশি তাই সার্থক হতে পারল না। কারণ, নাট্যকলা অমন একটা সঙ্কীর্ণ গোষ্ঠীর মধ্যে সবল ও স্বাভাবিক শ্রী লাভ করতে পারে না—বিশেষত যখন তার আসল সামাজিক পরিবেশ আগেকার মতই রয়েছে প্রতিকূল, তার সঙ্কীর্ণ আসরেও ভাঙন ধরেছে, আবার নূতন কালের সবাক্‌চিত্র এসে তাকে সকল ক্ষেত্রেই কোণঠাসা করছে।

এই তিন যুগের পরে বাংলা নাট্যকলা দেখে একটা কথায় আমরা বুঝেছিলাম—বাংলা নাট্যকলা সাধারণ বাঙালীর সঙ্গে জীবন্ত সম্পর্ক স্থাপন করতে পারছে না। অনেক দেশেই নাট্যকলার এ দশা ঘট্‌ছে কারণ, অনেক দেশেই কলাবিদের সঙ্গে দেশের জনসাধারণের যোগাযোগ কমে আসছিল। বাংলা দেশে এই বাংলা নাট্যকলার ও বাঙালীর যোগাযোগ বরাবরই ছিল সামান্যতম। তাই দু' একটি নাটক ও দু'একটি অভিনয়-ছাড়া সর্বত্রই ছিল একটা রোমান্টিক আবহাওয়া সৃষ্টির চেষ্টা। আমাদের সামাজিক নাট্য ও অভিনয়ও বাস্তব জীবনকে বড় স্বীকার করতে চাইত না।

কিন্তু একটা কথা, জনগণ এই নাট্যকলা চায় না—এ কথা বলাও হবে ভুল। গ্রামে নগরে যারা সৌখীন দলের অভিনয় দেখেছেন, তারাই জানেন জনগণ এ সব নাটকের অভিনয় দেখতেও কত উৎসাহ পায়। হয়ত সাজ-পোষাক আলো-চমক; এ সবই তাদের সরল মনে ভালো লাগে। কিন্তু তারা শুধু 'যাত্রাই' চায়, 'ভাসান গানই' বোঝে, 'কীর্তনেই' আনন্দ পায়, এ কথা বল্‌লে ভুল করব। দেখ্‌ছি, সে সব পরিচিত বিষয়বস্তু ও পরিচিত শিল্পপদ্ধতি যতই পরিচিত হোক তাদের সম্পূর্ণ তৃপ্ত করতে পারে না। কাল বদলেছে, তাদের রুচি ও দৃষ্টিও জানা-না-জানায় বদ্‌লেছে;—সিনেমা গ্রামোফন কোম্পানি তা বুঝেই ব্যবসা করছে। কিন্তু জনগণেরও রস পিপাসা আছে, সে রস পিপাসা নতুন কিছু চায়। সেই জিনিসই আমরা দিতে পারছি না—এমন কিছু যার বিষয়বস্তু (content) তাদের কাছে নিতান্ত "পরের জিনিষ" বলে

মনে হবে না, এবং যার শিল্প-পদ্ধতিও (form) অতিরিক্ত সূক্ষ্ম বলে তাদের কাছে ঠেক্‌বে না।

"ভদ্র"-নাট্যের এই বানচাল অবস্থা থেকেই বোধ হয় গণনাট্যের প্রয়োজন আমরা সকলেই উপলব্ধি করেছিলাম। সেই গণনাট্য আন্দোলনের পুঁথিপড়া বিদ্যা নিয়ে অপেক্ষাও করেছি। কৌতূহল ছিল, কৌতুকও বোধ করেছি, একটু বিদ্রূপের ভাবও মনে মনে পোষণ না করতাম তা নয়। তবু বাংলা নাট্যকলার প্রতি দরদ ছিল। হঠাৎ এবার কলকাতায় বাংলার গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয় দেখে আমরা কেউ কেউ আশান্বিত হয়ে উঠেছি। মনে হল, বাংলা নাট্যকলার অন্তত একটা চতুর্থ যুগের সূচনা দেখ্‌ছি।

এই সঙ্ঘ আর তার অভিনয়কলার নাম শুনেছিলাম। জানতাম এর আরম্ভ বড় এক বাস্তব রাজনৈতিক সঙ্কটের টানে; শুনেছিলাম এর প্রকাশ ঘট্‌ছে কঠিনতর এক বাস্তব সামাজিক সঙ্কটের টানে, পড়েছিলাম অনেক রসিক ও গুণীর এঁদের অভিনয়াদি সম্পর্কেও প্রশংসার কথা।

এদেশে গণনাট্য সঙ্ঘের উৎপত্তির ইতিহাস জানতাম। যাঁরা এর প্রথম প্রবর্তক তাঁরা জেনে-না-জেনে দুটা জিনিস বুঝেছিলেন—প্রথমত, নাট্যকলা কলা হিসাবেও জনমুখাপেক্ষী, জন-সংযোগ ছাড়া তার স্ফুরণ সম্ভব নয়। দ্বিতীয়ত, অন্যান্য কলার অপেক্ষাও নাট্যকলার সামাজিক প্রভাব বেশি—শুধু মাত্র 'বিশুদ্ধ' রসোপভোগের জিনিস তা নয়। কলকাতায় ১৯৪০ সালে ইয়ুথ কাল্‌চারাল ইন্‌ষ্টিটিউট্‌ এই উপলব্ধি থেকে জন্মে। বোম্বাই-এ ১৯৪২ সালে পণ্ডিত জওহর-লালের আশীর্বাদ নিয়ে জন্মে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘ। দু'এরই পিছনে ছিল রাজনৈতিক প্রেরণা, সামাজিক দায়িত্ববোধ আর শিল্পের প্রতি অনুরাগ। কিন্তু বাংলার শিল্পীদের দৃষ্টি ছিল শিল্প সৃষ্টির দিকে, বাংলার প্রগতিকামী মধ্যবিত্ত সমাজে তাঁদের একটা আসর ছিল তৈরী। বোম্বাইর শিল্পীরা বিলাতের Unity Theatre-এর কায়দায় শ্রমিক-শ্রেণীর দিকে দৃষ্টি রাখেন, বোম্বাইর শ্রমিকশ্রেণী ছিল তাঁদের লক্ষ্যবস্তু। দুই প্রয়াস পরে সংগঠনের দিক থেকে একত্র হয়ে এবং ক্রমে শিল্প কলার দিক থেকেও তাদের সংযোগ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। বাংলার শিল্পীরা পল্লী গীতি, জন-সঙ্গীত, প্রভৃতিকে উদ্বোধন করতে অগ্রসর হয়। আর মন্বন্তর এলে তার সত্যকে আশ্রয় করে অভিনয়, নৃত্য প্রভৃতি পরিবেশন করে। সাহায্যের

জন্য তাদের ডাক পড়ে পাঞ্জাবে, নূতন দর্শক সমাজের জন্য নূতন-শেখা হিন্দুস্থানীতে তারা অভিনয় করেন, আর, বাংলার জন্য সাহায্য নিয়ে আসেন প্রায় সওয়া লক্ষ টাকা। কিন্তু বড় কথা তাদের অভিজ্ঞতার পরিধি বাড়ে। সে পরিধি আরও বাড়ল যখন জামসেদপুর ছাড়িয়ে তাদের অভিনয়ের জন্য ডাক পড়ল বোম্বাই উপকূলে। নূতন করে তাঁদের শিল্পজ্ঞানকে পুষ্ট করতে হল, যাতে একই কালে সেখানকার গুণী সমাজ তৃপ্ত হয়, আবার শ্রমিক সমাজ অনুপ্রাণিত হয়। তারা বাংলার দুস্থদের জন্য সাহায্য পান দেড় লক্ষ টাকা। বোম্বাইর শিল্প সমালোচকেরাও বুঝলেন গণনাট্য শিল্প হিসারেও দাঁড়িয়েছে।

কলকাতায় অভিনয় দেখে আমাদের যা মনে হল তা এই—বাংলা নাট্যকলার একটা নূতন আরম্ভ দেখলাম। 'ফাল্গুনী' 'ডাকঘরে' যে সূক্ষ্ম শিল্প পরিবেশনের চেষ্টা হয়েছিল, তা নাট্যকলার মূল সত্যকেই যেন ভুলে যেতে চেয়েছিল। জন-সমাজ সে রস গ্রহণ করতে পারে না। "ফাল্গুনীতে" তাদের চেনা বাউলের মুখে তারা আধ-চেনা সুরের গান শুনছিল; কিন্তু তার কথাবস্তু তার অতি হেঁয়ালি কথা-বার্তা তারা এক বর্ণও বুঝতে পারে না। বাউল আর সংগীতের কাঠামোতে রবীন্দ্রনাথ তার নাটককে জনতার চেনা 'যাত্রার' রূপ খানিকটা দিচ্ছিলেন। কিন্তু রবীন্দ্রনাথের বাউলও রবীন্দ্রনাথই। অসামান্য সে, অতি সূক্ষ্ম রসের রসিক। বুঝলাম, সে সূক্ষ্মতা সাধারণের জন্য নয়। সে সূক্ষ্ম মঞ্চসজ্জা—যা দেখে তখন বিমুগ্ধ হয়েছিলাম—বুঝলাম, তা-ও বড় বেশি অসাধারণ। সে নাট্যকলা জনগণকে দূরে সরিয়ে রাখে। এবার বুঝলাম, বাংলা নাট্যকলা সেই শিক্ষিত বাঙালীর নাট্যকলা 'শিশির যুগও' জনসমাজের পাশ কাটিয়ে যায়। শিশিরকুমারের মধুসূদন দেখে সেদিনও বিমুগ্ধ হয়ে ফিরেছি। গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয় দেখে বুঝছি—কোথায় ছিল মধুসূদনের ট্রাজিডি, শিশির কুমারের ট্রাজিডি—বাংলার সমস্ত "ভদ্র" নাট্যকলার ট্রাজিডি—ইউরোপীয় ধনিকতন্ত্রের যুগের নাট্যসাহিত্য তার অভিনয়-কলা, তার প্রযোজন বিদ্যাকেই সর্বস্ব করে আমরা এও তখন গ্রহণ করেছিলাম। এদেশে মধুসূদন, শিশিরকুমার বা আমরা কেউ বাস্তবক্ষেত্রে সেই ধনিকতন্ত্রের সুস্থ প্রকাশ দেখিনি। চারদিকে দেখলাম তার সাম্রাজ্যবাদী রুক্ষ দৌরাত্ম্য, ঔপনিবেশিক উপদ্রব, পেলাম না বুর্জোয়ার সেই সমাজ, সেই নাট্য সাহিত্য, সেই নাট্যকলা, সেই প্রযোজন-দক্ষতা। তাই মধুসূদনের প্রতিভা তার প্রকাণ্ড

প্রকাশ সত্বেও ট্র্যাজিডি হয়; শিশিরকুমার তাঁর আশ্চর্য শক্তি ও একক সার্থকতা সত্বেও ট্রাজিডি থাকেন। আমরা পথ পাইনা প্রকাশের, না সার্থকতার। 'ভদ্র' নাট্যকলা হয়ে ওঠে বিদ্রূপের বস্তু।

গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয়ে দেখলাম ত্রুটী অনেক, একটা সমন্বিত শিল্প এখনো গড়ে ওঠে নি। কিন্তু দৃষ্টিভঙ্গী বদলে গেছে—সমস্ত জুড়ে এক নূতন দৃষ্টিভঙ্গী। একজন নায়ক বা একজন অভিনেতাকে কেন্দ্র করে আর নাটক ও নাট্যকলা আবর্তিত হয় না। রবীন্দ্রনাথ থেকে শিশিরকুমার পর্যন্ত অতিরিক্ত রকমের ব্যক্তি কেন্দ্রিক (individualistic) অভিনয় কলার পরিচয় রেখে গেছেন। এবার এই প্রথম দেখলাম অভিনয়ে, সঙ্গীতে, সমস্ত জুড়ে একটি ঐক রীতির প্রয়োগ। একজনই শুধু অভিনয় করবেন, আর সকলে হয় পার্শ্বচর; এ যেন আমাদের দেখা অভ্যাস হয়ে উঠছিল। অথচ সমস্ত নাট্যকলার মূল সূত্রই তার বিরোধী। সে সূত্র দাবী করে সমন্বয়—সমগ্রের সম-বিকাশ। এবার গণনাট্য সঙ্ঘের অভিনয়ে এই নূতন নীতিরই প্রতিষ্ঠা দেখলাম। প্রযোজন-বিদ্যায়ও টেক্‌নিকের খুঁটিনাটি অপেক্ষা চেষ্টা দেখলাম সমস্তকে পরিপুষ্ট করবার। 'মহামারী নৃত্যে' নেপথ্য সংগীত আর ক্রন্দন আর মঞ্চে আলো আঁধারের সান্নিবেশ তার সুন্দর নিদর্শন। আর সঙ্গে সঙ্গে কি নাট্যকলায়, কি অভিনয়ে, কি মঞ্চ সজ্জায় দেখলাম এক বাস্তবতা, জীবন মুখীনতা। ফলে সমস্ত অভিনয়ে একটা অদ্ভূত সবলতার সঞ্চার হয়েছে—আগেকার যুগের চমক, চটক ও রোমান্সের স্থানে এসেছে সহজ বলিষ্ঠ জীবন। তা সেই অতিসূক্ষ্মতারই যেন একটা প্রতিবাদ জনতার বলিষ্ঠতার, স্বাভাবিকতার, যেন একটা ইঙ্গিত তাদের এই সামগ্রিক ও বাস্তব অভিনয় কলার মধ্য দিয়ে দর্শককেও সচকিত ও সচেতন করে তোলে—বুঝি, বাংলা নাট্যকলা বাঙালী জীবনের কাছে এগিয়ে আসতে চাইছে।

তারই একটা প্রমাণ রয়েছে এই নাট্যকলার সমস্ত পরিকল্পনায়। ঘরে বসেই আমরা অভিনয় দেখছিলাম। তার মানে বাইরে থেকে নিজেদের একটু স্বতন্ত্র করে নিয়ে দেখছিলাম অভিনয়। জীবন যাত্রার থেকে, বাস্তবের থেকে একটু আড়াল রচনা করে দেয় একরূপ ঘরের দেয়াল। তাতে সুবিধা আছে, অসুবিধাও আছে। খাঁটি জননাট্য এ আড়াল চায় না, তা মুক্ত প্রান্তরে মানুষের চোখের সামনে ফুটতে পারলে তবেই মনে করে, সার্থক হলাম। বাংলা যাত্রা আমাদের জনতার বেশি নিজের জিনিস

হতে পাবত। এ কালেব 'মুক্ত প্রান্তবে অভিনয়' "Open Air Theatre" সেই গ্রীক অভিনয় পদ্ধতি, Passion Play, ও আমাদেব 'যাত্রা' 'রামলীলা' প্রভৃতিব সেই মূল সত্যটিকে আবাব উর্ধ্বতব স্তরে স্বীকাব কবে নিতে চায়, দর্শকের সঙ্গে অভিনেতাব ঘনিষ্ঠ সংযোগ স্থাপন কবতে চেষ্টা কবে। ঘবে বসে গণনাট্য সঙ্ঘেব অভিনয় দেখ্‌তে দেখ্‌তে বুঝ্‌ছিলাম, এ অভিনযও মুক্ত প্রান্তবেব উপযোগী। শুনেছিলাম, সত্যই মুক্ত প্রান্তরে অভিনয় কবতে পাবলে শুধু এদেব অভিনয়েব উদ্দেশ্য বেশি সিদ্ধ হয় তা নয়, এদেব অভিনয়-কলাও নাকি স্ফূর্ত হয় বেশী। নাট্যকলাব এই অববোধ-মুক্তি বাংলা নাট্যকলাব ইতিহাসে তাই আব এক শুভ সূচনা।

ঠিক এসব ধাবণা, নীতি ও বীতির সঙ্গে সঙ্গতি বেখেই যে নূতন নাট্যসাহিত্য বচিত হবে, তা না উল্লেখ কবলেও চলে। কাবণ, নইলে নাট্যকলাব মত সমন্বিত শিল্প রূপ লাভই করত না। এই নূতন নাট্যসাহিত্য সৃষ্টিব যে সূচনা দেখলাম তাও তাই লক্ষ্য করতে হয়। দেখলাম—যে নাটক এবা অভিনয় করছেন তা সাধাবণ মানুযের সাধারণ কথা। উদ্দেশ্য তাব স্পষ্ট। তাতে ছলনাব চেষ্টা নেই। এই উদ্দেশ্য স্বীকাব কবতে লেখক ও শিল্পীবা কেউ কুণ্ঠিত নয়। তাবা বলতে চায় না, 'না, না, আমাদেব উদ্দেশ্য নেই। আমবা শুধু শিল্পেব জন্য শিল্প সৃষ্টি কবি।' ববং এইটাই বলতে চায়। আমরা শিল্প সৃষ্টি কবি ; কাবণ, আমাদেব উদ্দেশ্য আছে, লক্ষ্য আছে, আদর্শ আছে।' এই অকুণ্ঠ সত্যেব বলেই তাবা সাধাবণকে তৃপ্ত কবে, আব দৃষ্টিবান সমালোচকেব থেকেও স্বীকৃতি আদায় করে নেয়। এরূপ সমালোচকেবা বোঝেন—'আমাদেব 'বিশুদ্ধ শিল্প' পবিবেশনের প্রতিশ্রুতি দেওয়া হয় নি, তাবপব প্রতাবিত করা হয় নি প্রচাব-দৃশ্য দিয়ে। তাঁবা জানেন, এবা দিতে চায় বাস্তব শিল্প ; আমবা দেখ্‌ব ঠিকমত প্রকাশ হল কিনা জীবন।'

এদেব নাট্যসাহিত্যে কোথাও তাই ছলনা নেই। বিজন ভট্টাচার্যেব নাটক 'জবানবন্দীতে' তাই নাটকীয় হবাব চেষ্টা নেই—গান নেই, হাসি নেই, স্মার্ট কথাবার্তা নেই, আছে একেবাবে সহজ, সুস্পষ্ট ঘটনা। গৃহ ছেড়ে একটি কৃষক পবিবাব এল শহবে অন্নেব খোঁজে, অনাহাবে তাদেব মধ্যে স্নেহ-প্রেমেব বন্ধন দুদিনে ছিঁড়ে যেতে লাগল, ছোট ছেলেটি মরল ; কৃষকবধু দেহ বিক্রয় কবলে, আব পবিবাবেব বৃদ্ধ কর্তা মাবা গেল চোখে নিয়ে তাব ক্ষেতভবা ফসলেব স্বপ্ন। চাব দৃশ্যে এক অঙ্কে এক ঘণ্টাব মধ্যে এই নাটকেব অভিনয় হয। এ নাটক নাট্যসাহিত্য হিসাবে যে সার্থক তা

দর্শকদের দিকে তাকালেই বোঝা যায়। নাট্যসাহিত্যের প্রধান মানদণ্ড তাই। এ নাটকের শক্তির উৎস হল তার সত্যনিষ্ঠা, ঘটনা আর বলিষ্ঠ সংলাপ। এর ত্রুটি সম্ভবত এই যে, তাতে নিঃশ্বাস ফেলবার কোনো অবকাশ নেই—হাসি নেই, গান নেই, ট্রাজিক রিলিফ্ কোথাও মেলে না। হয়ত নাট্যকার দিতেও চান না।

তবু 'জবানবন্দী' পুরো নাটক নয় একে চিত্র বা নক্সা বল্লেই ঠিক বলা হবে। লেখক নতুন নাটক রচনা করেছেন 'নবান্ন'। তা চার অঙ্কের নাটক, তাতে অনেক দৃশ্য, অনেক ঘটনা। 'অরণিতে' তা ক্রমশ প্রকাশিত হয়েছে। তার বিষয় বস্তুও এই মন্বন্তর, মন্বন্তরের ক্রমিক প্রকাশ, প্রসার ও পরিণতি তিনি এই নাটকে তুলে ধরেছেন। নাট্যসাহিত্য সংবন্ধে লেখক যেরূপ দৃষ্টিশক্তির ও সৃষ্টিশক্তির পরিচয় দিয়েছেন, 'নবান্নে' তার স্ফুরণ দেখছি। আশা করে থাকব এর অভিনয়ের জন্য। কারণ, আশার কথা আছে। বাংলার লেখকদের মতই অভিনয় শিল্পীরাও অনেকেই 'গণনাট্য সঙ্ঘের' সহায়তা করতে এগিয়ে এসেছেন—শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন ভট্টাচার্য প্রথম থেকেই ছিলেন এঁদের সভাপতি। গণনাট্যের মধ্যে তাঁরাও একটা নূতন সম্ভাবনা দেখ্ছেন। সাহিত্যিক ও রঙ্গমঞ্চের কর্ণধারদের এই শুভ সম্মেলন ঘটলে বাংলার নাট্যকলার এই চতুর্থ যুগের সূচনা ব্যর্থ হবে না। আমরাও দেখব—এবার বাংলা নাট্যকলা বাঙালীর নাট্যকলা হয়ে উঠ্ল।

শ্রীরঙ্গীন হালদার

পৌষের রাত

(হিন্দুস্থানী গল্প)

হল্কু এসে স্ত্রীকে বলল—সহনা এসেছে। যে টাকাটা জমিয়েছিস দে, ওকে দিয়ে দিই—কোন মতে মাথাটা ত বাঁচাই।

মুন্নী ঘর ঝাঁট দিচ্ছিল। মুখ ফিরিয়ে বলল, তিনটী ত মোট টাকা আছে, যদি সহনাকে দিয়ে দাও ত কম্বল আসবে কোথা থেকে? পোষ মাঘ মাসে জমি পাহারা দেবার সময় রাত কাটাবে কেমন করে? ওকে বলে দাও, ফসল হোক টাকা দিয়ে দেব। এখন নেই।

হল্‌কু এক মুহূর্ত দ্বিধাভবে দাঁড়িয়ে রইল। তাব মনে হল, সামনেই পৌষ মাস, কম্বল না থাকলে তখন রাত্রে জাগাই যাবে না। কিন্তু সহনাও যে শুনবে না, গালমন্দ করবে। না, হয় শীতেই মরব, সে ত পবেব কথা, আজ ত এ বিপদ থেকে উদ্ধাব পাই।

এই ভেবে সে স্ত্রীর কাছে গিয়ে খোসামোদের সুবে বলল, আজ দিয়েই দে, মাথা ত বাঁচুক; কম্বলেব জন্য না হয় অন্য কোন উপায় ঠিক কবব।

মুন্নী পিছনে সবে গিয়ে ভ্রুকুটী কবে বলল, অন্য উপায় করবে,—কি করবে শুনি? কেউ তোমাকে দান করবে কম্বল? জানি না বাপু, কত আব বাকি আছে, যত দাও শোধ আব হয় না। জিগ্যেস কবি পোড়াব চাষ ছাড না কেন? মরে মবে কাজ কববে আব যদি কিছু ফসল হয ত ধাব শোধ কবতে দিযে দেবে। ব্যস্ ফুবিয়ে গেল! বাকি শোধ কবতেই যেন আমবা জন্মেছি। পেটেব জন্য মজুরীই না হয় করো, পোড়া চাষ ছেড়ে দাও। টাকা আমি দেব না, দেব না।

হল্‌কু উদাস সুবে বলল, তাহলে কি গালমন্দ শুনব?

মুন্নী রুখে উঠে বলল, কেন গাল দেবে শুনি, ওর বাজত্বে বাস করি?

কিন্তু কথাটা বলতে বলতেই তাব সুব নবম হয়ে এল, ভ্রুকুটী মিলিযে গেল। হল্‌কুব কথাব মধ্যে যে কঠোব সত্য ছিল সেটা যেন একটা ভীষণ জন্তুব মত ক্রুব দৃষ্টিতে তার দিকে চাইল। সে তাড়াতাড়ি ঘবেব ভিতবে গিয়ে তাকেব উপব থেকে টাকা বের করে এনে হল্‌কুব হাতে দিল। দিয়ে বলল, এবাব থেকে চাষ কবা ছাড। মজুরী করলে দুমুঠো ভাত জুটবে। কারু গালমন্দ ত শুনতে হবে না। ভাল চাষ বটে, খেটে খুটে যা আনবে, সবই ওব হাতে সঁপে দিতে হবে, তাব ওপব আবাব গালমন্দ।

হল্‌কু টাকাটা নিযে বাইবে এল। তাব মুখ দেখলে মনে হয় বুঝি সে টাকা দিচ্ছে না, তার বুকটাই উপড়ে দিচ্ছে।... খেটে খেটে এক এক পযসা জমিযে সে তিন টাকা কবেছিল কম্বল কিনবে বলে। আজ সে টাকা দিযে দিতে হচ্ছে বাকি শোধ কবতে। দুঃখেব ভাবে তাব মাথা যেন নুযে আসছিল।

(২)

পৌষ মাসের অন্ধকাব বাত। আকাশেব তারাগুলি মনে হচ্ছিল যেন কাঁপছে। হল্‌কু তার জমিব এক পাশে আখেব পাতাব ছাউনি কবা ছত্রীব তলায় বাঁশেব খাটুলিব

উপব বসে পুরানো জীর্ণ গায়ের চাদবটা দিয়ে কোন মতে গা ঢেকে শীতে ঠক্‌ঠক্ কবে কাঁপছিল। ··· খাটুলিব তলায তাব সঙ্গী কুকুব জবরা পেটের ভিতব মাথাগুঁজে কুণ্ডলী হয়ে শুয়ে শীতে কুঁ কুঁ করছিল। দুজনেব কারুবই চোখে ঘুম আসছিল না।

হল্‌কু মাথাটা হাঁটু দুটোব মধ্যে গুঁজে বলল—কিরে জববা, শীত লাগছে বুঝি? বলেছিলাম ত ঘবে বিচালীব ওপব শুয়ে থাক—কেন মরতে এখানে এসেছিলি? এখন মব্ শীতে। আমি কি করব? ভেবেছিলি বুঝি আমি এখানে হালুয় পুবি খাব তাই আগে আগে দৌড়ে দৌড়ে এসেছিলি। এখন টেবটি পাও যাদু।

জবরা শুয়ে শুয়েই লেজ নাড়তে লাগল আব কুঁ কুঁ স্ববটা লম্বা কবতে কবতে একবাব হাই তুলে চুপ করে গেল। বোধ করি তাব কুকুব বুদ্ধিতে সে বুঝতে পেবেছিল যে তাব প্রভুব এই কুঁ কুঁ শব্দে ঘুম আসছে না।

হল্‌কু হাতটা বাব করে জববাব ঠাণ্ডা পিঠে হাত বোলাতে বোলাতে বলল, কাল থেকে আর আমাব সঙ্গে আসিস না—এলে একেবাবে ঠাণ্ডা হয়ে যবি। ··· হতভাগা পশ্চিমে বাতাস যেন ববফ বইযে দিচ্ছে। উঠি, এক কলকে তামাক খাই। আট কলকে খাওয়া হয়ে গেছে, আব কতই বা খাব? কিন্তু কোন বকমে বাতটা ত কাটাতে হবে। এই হল চাষেব মজা। কারুব এমন ভাগ্য যে তাব কাছে শীত গেলে গবমেব ভয়ে পালিয়ে বাঁচে--মোটা মোটা গদি, লেপ, কম্বল। শীতেব শক্তি কি তার কাছে ঘেঁসে? এমনই অদৃষ্ট বটে! আমবা করি মজুরী, আব তারা লোটে মজা!

হল্‌কু উঠে গর্ত থেকে আগুন নিয়ে কলকে ভবল। জববাও উঠে বসল।

হল্‌কু তামাক টানতে টানতে বলল—তামাক খাবি? খেলে শীত যায় না জানি তবু মনটা ত ভাল থাকে।

জববা তাব মুখেব দিকে চাইল তার চাউনি ভালবাসায় ভবা।

হল্‌কু আজকের মত শীত ভোগ কবে নে। কাল থেকে এখানে পোয়াল বিছিয়ে দেব; তাব ভেতরে থাকিস্ আব শীত লাগবে না।

জবরা সামনের পা দুটো হল্‌কুব হাঁটু দুটোব উপব রেখে তাব মুখের কাছে মুখ নিয়ে গেল। তাব গরম নিঃশ্বাস হল্‌কুব গায়ে এসে লাগতে লাগল।

তামাক খেযে হল্‌কু আবার শুয়ে পড়ল। এবার সে ঠিক কবেছিল, যেমন কবেই হোক ঘুমুতে হবে। ··· কিন্তু একটু যেতে না যেতেই শীতে বুক কেঁপে উঠল। সে একবাব এপাশ একরাব ওপাশ কবে কিন্তু শীত আব যায় না, ঘুম আব হয় না।

যখন কোনো মতেই কিছু হল না তখন সে আস্তে আস্তে জববাকে উঠিয়ে তাকে কোলে টেনে নিযে তার মাথায হাত বুলোতে লাগল। কুকুবটার গা থেকে বড় দুর্গন্ধ আসছিল কিন্তু তাতে কি যায় আসে; তাকে কোলে নিয়ে তার এমন আরাম বোধ হচ্ছিল যেন এবকম আরাম সে অনেক দিন পায়নি। জবরাও বোধ হয় ভাবছিল এই বুঝি স্বর্গ। হল্‌কু কুকুবটাকে বড় ভালবাসত; তাব মনে একটুও ঘৃণা ছিল না। নিজেব বন্ধু বা ভাইকে লোকে যেমন করে সেও কুকুবটাকে তেমনই কবে কোলে টেনে নিয়েছিল।

হঠাৎ জববা কোন জানোয়াবেব শব্দ পেল। প্রভুব আদব পেয়ে তাব এমন স্ফূর্তি বেড়েছিল যেন মনে হয় শীতেব হাওয়াষ আর তাব কোন কষ্টই হচ্ছিল না। সে তাড়াতাড়ি উঠে দাঁড়াল আর বাড়ীব বাইবে গিয়ে ডাকতে শুরু কবে দিল। হল্‌কু তাকে কয়েকবাব ডাকল কিন্তু জবরা তাব কাছে ফিরে এল না। সে ক্ষেতেব চারিদিকে দৌড়ে দৌড়ে ডাকতে লাগল। মাঝে মাঝে এক একবার হল্‌কুব কাছে আসে আবাব ছুটে যায় এমনই কবে সে ছুটোছুটি আব ডাকাডাকি শুরু কবে দিল।

(৩)

আবও এক ঘণ্টা কেটে গেল। রাত্রি যেন শীতের হাওয়ায কাঁপতে লাগলো। হল্‌কু উঠে দুই হাঁটুব মধ্যে মাথা গুঁজে বসল। তবুও শীত যায় না। যেন মনে হতে লাগল শিবা উপশিরায় বক্ত জমে ববফ হয়ে গেছে। ভোব হতে আবও কত দেবী? হল্‌কু ঝুঁকে আকাশেব দিকে চেয়ে দেখল, সপ্তর্ষি এখনও আকাশেব অর্ধেকও উপবে ওঠেনি। যখন আকাশেব মাথায় উঠবে তখন বোধ কবি ভোব হবে; এখনও তাব প্রহরখানেক বাকি।

হল্‌কুব জমির কিছু দূরে এক আম বাগান ছিল। সেখানে পাতা পড়া শুরু হয়ে গিয়েছিল। লোকে জ্বালানিব জন্য পাতাগুলো একত্র কবে বেখেছে।

হল্‌কু ভাবল, যাই কিছু পাতা জমা করে আগুন জ্বালি গে। লোকে দেখলে ভাববে ভূত; তা ভাবুক্ গে। কিন্তু যদি কোন জানোয়াব বাগানে লুকিয়ে থাকে? থাক্‌গে আব বসে থাকতে পাবছি না।

পাশেব অড়হবেব ক্ষেত থেকে কয়েকটা গাছ তুলে সেগুলোকে একত্র করে ঝাঁটাব মত করে এক হাতে সেটা আব এক হাতে আগুনের খুবিটা নিয়ে হল্‌কু চলল বাগানেব দিকে। জববা তাকে দেখে লেজ দুলোতে দুলোতে পিছনে পিছনে চলল।

হল্‌কু বলল, জবরু, বাবা, আর ত থাকা যায় না; চল্‌ বাগানে গিয়ে পাতা জমিয়ে আগুন তাপি; গা একটু গরম হলে এসে আবার শোবো। এখনও ত রাত অনেক আছে।

জাবরু কুঁ কুঁ করে মত জানাল আর আগে আগে চলল।

বাগানে ঘুটঘুটে অন্ধকার; শীতের হাওয়া পাতাগুলো এধার ওধার উড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছে; গাছের উপর থেকে টপ্‌টপ্‌ করে হিম পড়ছে। মাঝে মাঝে এক এক ঝলক মেহদী ফুলের সুগন্ধ বাতাসে ভেসে আসছে।

হল্‌কু বল্‌ল, কিরে জবরু, কেমন সুন্দর গন্ধ আসছে! তোর নাকে কি কিছু পাস্‌?

জবরা কোথা থেকে এক টুকরো হাড় সংগ্রহ করে সেটা চিবোতে ব্যস্ত ছিল।

হল্‌কু আগুনের খুরিটা রেখে পাতা জমা করতে লাগল; শীতে হাত পা চলে না; তবুও খানিকক্ষণের মধ্যেই অনেক পাতা জমা হল। এবার আগুন জ্বালতে পারলেই শীত যাবে।

কুণ্ডে আগুন জ্বালা হল। আগুণের শিখাগুলি গাছের ডালগুলি ছুঁয়ে ছুঁয়ে যেন নাচতে লাগল। সে চঞ্চল আলোতে বড় বড় গাছগুলি যেন মনে হতে লাগল অন্ধকারের বোঝা মাথায় নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে আলোর ক্ষীণ শিখা যেন অসীম অন্ধকারের সমুদ্রে ছোট এক নৌকার মত ঢেউয়ের উপর দিয়ে নাচতে নাচতে চলেছে।

হল্‌কু কুণ্ডের সামনে বসেছিল। খানিকপরেই সে গায়ের কাপড়টা খুলে ফেলল আর পা দুটো সামনে মেলে দিয়ে আরাম করে বসল। তার মনের ভাবটা যেন শীতকে বলছে, এবার তোমার যা খুশী করো। শীতকে হারিয়ে দিয়ে বিজয়গর্বে তার মুখ প্রসন্ন হয়ে উঠেছে। জবরার দিকে চেয়ে হল্‌কু বলল, কেমন রে জব্বর, এখন ত ঠাণ্ডা লাগছে না? জব্বর কুঁ কুঁ করে উত্তর দিল; যেন বলল, এখন আর কি ঠাণ্ডা লাগ্‌বে! আগে এ বুদ্ধি মাথায় আসে নি, নইলে এতক্ষণ ঠাণ্ডায় ভুগতে হত না। জব্বর লেজ নেড়ে উত্তর দিল।

আয়, দেখি কে আগুনটা লাফিয়ে যেতে পারে। লাগলে কিন্তু ওষুধ টষুধ দেব না।

জব্বর কাতর দৃষ্টিতে আগুনের দিকে চাইল।

মুন্নীকে আবার যেন কাল বলে দিস্‌না, তাহলে সে ঝগড়া করবে।

এই বলে হল্‌কু আগুনটা লাফিয়ে পার হয়ে গেল। পায়ে একটু আঁচ লাগল বটে কিন্তু তাতে কি আসে যায়? জবরা আগুনের কুণ্ডটা ঘুরে এপাশে এসে দাঁড়াল।

হল্‌কু বলল, ও হবে না। লাফিয়ে আসতে হবে।

এই বলে সে আবার লাফিয়ে ওপারে গেল।

৪

পাতা জ্বলে শেষ হয়ে গিয়েছিল। বাগান আবার অন্ধকার ঘিরে এসেছিল। ছাইয়ের নীচে কিছু আগুন ছিল; মাঝে মাঝে হাওয়ায় সে আগুন এক একবার জ্বলে উঠে আবার পরমুহূর্তেই নিভে যাচ্ছিল।

হল্‌কু চাদরটা গায়ে ঢেকে দিয়ে গুন গুন সুরে গান শুরু করে দিল। তার গা গরম হয়ে গিয়েছিল। কিন্তু আগুন নেভার পর আস্তে আস্তে আবার শীত করতে লাগল। আর শীতের সঙ্গে সঙ্গে আলস্যে শরীর ভেঙে পড়ল।

জবরা ডাক দিতে দিতে ক্ষেতের দিকে ছুটে গেল। হল্‌কুর মনে হল যেন একদল জানোয়ার এসে ক্ষেতে ঢুকছে। বোধ হল যেন একদল নীল গাই। তাদের শব্দ স্পষ্ট কানে আসছিল; যেন তারা ফসল খাচ্ছে; তাদের খাবার আওয়াজ ঐ শোনা যাচ্ছে!

হলকু মনকে প্রবোধ দিয়ে বলল, নাঃ, জবরা থাকতে কোন জানোয়ারই ক্ষেতে আসতে পারবে না। যদি ফসল খেয়ে ফেলে? ওটা আমার ভুল! কৈ আর ত কোন শব্দ শোনা যাচ্ছে না। নিশ্চয়ই তখন ভুল হয়েছিল।

সে চীৎকার করে ডাকল, জবরা, জবরা।

জবরা ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগলো বটে কিন্তু কাছে এল না।

আবার জানোয়ারদের আওয়াজ শোনা গেল। এবার আর মনকে প্রবোধ দেওয়া গেল না। কিন্তু জায়গা ছেড়ে তার মোটেই উঠতে ইচ্ছা হচ্ছিল না। কেমন আরাম করে বসেছিল! শেষ পর্যন্ত আর সে উঠল না। সেইখানে বসে বসেই তাড়া দিয়ে হাঁক দিল।

জবরা আবার ঘেউ ঘেউ করে ডাকতে লাগল। জানোয়ার ক্ষেতে ঢুকে খাচ্ছিল। ফসল ত একেবারে তৈরী! কেটে ঘরে তুললেই হয়। আর সেই ফসল ব্যাটারা খেয়ে তার সর্বনাশ করল।

হল্‌কু এবার উঠে দাঁড়াল! দু এক পা এগিয়েও গেল। কিন্তু কোথা হতে এক দমকা শীতের হাওয়া এসে যেন নতুন করে তাকে কাঁপিয়ে দিল, যেন হাজার হাজার বিছে তাকে এক সঙ্গে কামড়াল। সে টলতে টলতে আর একবার আগুনের কুণ্ডের কাছে এসে বসে পড়ল আর ছাই নাড়িয়ে আগুনে হাত-পা সেঁকতে লাগল।

জবরা প্রাণপণে ডাক দিচ্ছিল, নীল গাইগুলো ফসল নিঃশেষ করে খাচ্ছিল আর এদিকে হল্‌কু বসে বসে আগুন তাপছিল। কুড়েমি যেন নাগপাশের মত তাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বেঁধে রেখেছিল।

আগুনের কুণ্ডের পাশে চাদর বিছিয়ে হল্‌কু শুয়ে পড়ল।

সকালে যখন তার ঘুম ভাঙল তখন চারিদিকে রোদ উঠে গিয়েছিল আর মুন্নী বলছিল, কি আজ ঘুমিয়েই থাকবে নাকি? তুমি ত এখানে আরাম করছিলে আর ওদিকে ক্ষেত যে শেষ হয়ে গেল।

হল্‌কু উঠে বসে বলল, তুই ক্ষেত দেখে এলি নাকি?

মুন্নী বলল, হাঁ সব ক্ষেত শেষ হয়ে গেছে। এমন করেও কি কেউ ঘুমোয়? তুমি যে মাচা করেছিলে এই তার ফল নাকি?

হল্‌কু বাহানা করে বলল, আমি মরতে মরতে বেঁচে গেছি; আর তুই ক্ষেতের কথা ভাবছিস। পেটে এমন ব্যথা হয়েছিল যে তোকে কি বলব?

দুজনে ক্ষেতে আলের উপর এসে দাঁড়িয়েছিল। দেখল ক্ষেত খালি, একটুও ফসল নেই। আর মাচার নীচে জবরা চিৎ হয়ে শুয়ে ঘুমোচ্ছে যেন মরে গেছে।

দুজনেই ক্ষেতের অবস্থা দেখছিল। মুন্নীর মুখ উদাস কিন্তু হল্‌কুর মুখ প্রসন্ন, সেখানে কোন ভাবনার ছাপই নেই।

মুন্নী খুব চিন্তিত হয়ে বলল, এখন মজুরী করে খাজনা দিতে হবে।

হল্‌কু প্রসন্ন মুখে উত্তর দিল, রাতে ঠাণ্ডায় ত এখানে আর পড়ে থাকতে হবে না।

মূললেখক—**প্রেমচন্দ**

অনুবাদক—**শ্রীঅনাথনাথ বসু**

আরাগঁ-র দুটি কবিতা

দ্বিতীয় রিচার্ড—চালশে

স্বদেশ আমার নৌকা নোঙরহীন
হালে আজ তার মাল্লারা কেউ নেই
আমি যেন সেই রাজা অসহায় দীন
দুঃখের চেয়ে দুঃখী ছিল গো যেই
বিরাট দুঃখ-সিংহাসনে আসীন।

জীবন আজকে ব্যূহ এক সঙ্গীন
দূষিত হাওয়ায় অশ্রু শুকায় কবে
যা কিছু প্রিয় তা ঘৃণায় শুধ্‌ছে ঋণ
যা নেই আমার তাও দিয়ে দিতে হবে
আমি যে দুঃখ-সিংহাসনে আসীন।

ছিঁড়ে যাক্ তার, থামুক হৃদয়বীণ
রক্তে ছড়াক্ মৃত্যু তার তুষার
দুই আর দুয়ে চার নয়, হোক্ তিন
চোর জুয়াচোর চালাকি থামাক্ তার
আমি তো দুঃখ-সিংহাসনে আসীন।

সূর্য যখন নবজীবনের পীন
রাত্রে গোপন, বর্ণহীন আকাশ
হে আমার পারী! যৌবনে সৌখীন
বিদায় পুষ্পবীথিকা চৈত্রমাস
আমি তো দুঃখ-সিংহাসনে আসীন।

নির্ঝরিণী ও বন হোক দূরে লীন
খামারে কাকলী মুখর পাখিরা শোন
চাল্‌শের কানে ও গান যে সুরহীন
জানিস এসেছে ব্যাধের যুগ এখন
আমি তো দুঃখ-সিংহাসনে আসীন।

এখন এসেছে দুঃখ-সহন দিন
জীন্‌ যেই দিন গিয়েছিল ভোকুল্যর
(আহা ফ্রাঁস যে গো শতধা অঙ্গহীন)
সেই দিনও ছিল এমনি হিমকঠোর
আমি তো দুঃখ-সিংহাসনে আসীন।

(শতাব্দীব সমবযসী কবি। তাই এই চল্লিশ নিযে বসিকতা। আবাগঁ, এলুআব এবং ব্রের্তো সুব্‌বেআলিস্‌মেব নেতা হিসাবে প্রথম হৈ চৈ কবেন। তাঁদেব এবং তাঁদের দলেব চিত্রকবদেব কাণ্ডকাবখানা লণ্ডনপাবীব উঁচ্‌কপালে জগতে এখনো স্মবণীয়। স্বপ্নাদিষ্ট হয়ে' আবার্গ তাবপবে মারকেসাস্‌ দ্বীপে অভিযান কবেন। আশাভঙ্গ ও আত্মবিবাগেব মধ্যে ১৯৩১ সালে বাজনৈতিক কাবণে তিনি অতিপ্রাকৃতবাদী দল ছেড়ে নৈর্ব্যক্তিক কম্যুনিষ্ট্‌ দলে যোগ দেন। কিছুকাল পবে যুদ্ধবিবোধী বচনাব জন্য গ্রেপ্তাব হন, রুশিয়া যান এবং উপন্যাস বচনা ও বামপন্থী সংবাদপত্র সম্পাদনা করেন। জীদ্‌ এ সময়ে বলেন, আবার্গ সাহিত্যিক হিসাবে গোল্লায় গেছেন। যুদ্ধাবম্ভে কম্যুনিষ্ট্‌ বদ্‌নাম থাকায় আবার্গকে অতি বিপজ্জনক কাজেব ভাব দেওযা হয। স্বভাবতই তাতে তিনি অসামান্য সাহস দেখান এবং কয়েকটি পদক লাভ কবেন—*Le Creve-Cœur* প্রেমেব কবিতাব বই, তাঁব স্ত্রী এল্‌সা ও ফ্রান্সেব প্রেম। জীদেব প্রশংসার পবে বইটি জর্মান নজবে পড়ে। লণ্ডন সংস্করণে ইংবেজ সিবিল্‌ কনলি-ব মুখবন্ধ থেকে এই উদ্ধৃতি দিচ্ছি :

Of the metres and imagery of *Le Creve-Cœur* Aragon has himself much to say, and in his preface to *Les Yeux D'Elsa* he justifies, like Eliot, a considered plagiarism. The lover of French poetry will notice many echoes of Apollinarire

who also tried to combine new words and sophisticated thought in the lyrical tradition of the popular chanson, and he will also detect in other poems the controlled heaving swell of the Baudelairean alexandrine ইত্যাদি এবং Nowhere else (অবশ্য পশ্চিম য়ুরোপে) has the situation called forth the man or the intellectual poet (and the poet who is not an intellectual is today at a technical disadvantage) been able to liberate in himself the music for which so many are waiting. Considered in relation to the war, Auden is an oracle in a cave and Eliot a philosopher on a dark mountain... Why should only he (আরাগঁ) be the singer of that heat-wave when France fell, he alone of the men at Dunkirk write a good poem about it? To answer that one must ask deep and disturbing questions about the structure of literary life in England, where our poets have wings, but lack the power to make themselves airborne. Aragon (always a lover and a thinker), as a Surrealist, developed his imagination; as a Communist, his sense of political reality; as a soldier, his humanity and patriotism; and the defeat of his country bestowed on him the privacy and leisure without which he could never create. Now let our poets give us, from their own design, a music as lucid, as moving, and as largely conceived.

স্বাধীন এলাকায়

বাতাসে বিষাদ হারায় বিস্মরণ
ক্ষীয়মান ভাঙা হৃদয়ের ক্রন্দন
অঙ্গারে নেভা ভস্মবিভূতি ভায়
মদের মতন বৈশাখ শেষ করি
সারা আউষের মাসটা স্বপ্নে ভরি
লাল পাথরের সাবেকী মহলে গাঁয়ে।

হঠাৎ কোথায় কে আনে শিশু কি নারী
বাগানে কিসের কান্না বাতাস ভারি
ঘোমটায় চাপা ও কার তিরস্কার
জাগিও না আহা আমায় কয় নিমেষ
আর কিছু নয় ক্ষণিক এ সুখাবেশ
কেটে দেবে জানি হতাশার টঙ্কার।

মুহূর্ত শুধু মনে হয় রেশ টানে
পাকা ফসলের শয্যায় যায় কানে
এলোমেলো ছেঁড়া অস্ত্রের হুঙ্কারে
কোথা থেকে কাছে আসে এ বিবাট গ্লানি
ঢাকা পড়ে নাকো অশ্রুস্ব্বাস জানি
জুঁই চামেলিতে রজনীগন্ধা-ঝাড়ে।

কেমন করে' যে ভুলেছি, ভুলেছি তাও
আমার সে ঘোর কুটিল যন্ত্রণাও
নিজেই নিজেকে খণ্ডিত করে ছায়া
অন্তবিহীন আমার অন্বেষণ
স্মৃতিরও চিহ্ন হারানো আমাব মন
আশ্বিনে হেরে নতুন উষাব মায়া।

প্রেয়সী, ছিলাম তোমার আলিঙ্গনে
বাইরে গাইল অস্ফুট গুঞ্জনে
কে এক পুরানো ফরাসী দেশের গান
যন্ত্রণা থেকে খস্‌ল ছদ্মবেশ
নগ্ন পদধ্বনির তড়িৎ রেশ
স্পন্দিত করে মৌন হরিতে প্রাণ॥

পল এলুআরের অনুসরণে

প্রেয়সী তোমার দুর্জয় অভিমান।
তোমাকেই জানি তোমাকেই জানতাম,
বারেক ভুলেছি বুঝি চাও তার দাম!
স্বাধীনতা তুমি স্বাধীনতা চায় প্রাণ।

স্বাধীনতাহীন কেই বা বাঁচতে চায়!
স্বাধীনতা শুধু স্বাধীনতা ধরি পায়ে,
হে প্রেয়সী কবে করবে আত্মদান?
জীবনে মরণে লিখেছি তোমার নাম
স্বাধীনতা প্রিয়া স্বাধীনতা লিখলাম
হৃদয়ে বাহুতে বুদ্ধির একতায়।
স্বাধীনতাহীন কেই বা বাঁচতে চায়

মজা নদী মরা খাল ও তেপান্তরে
তালদীঘি আর পোড়ো নারিকেল বনে
আমবাগানের পাতাপচা প্রতি গাঁয়ে!
হৃদয়ে বাহুতে বুদ্ধির একতায়
সুজলা সুফলা শস্যশ্যামলা গাঁয়ে
স্বচ্ছ নদীর স্রোতে একাগ্র মনে
কোঠাবাড়ী আর নিকানো মাটির ঘরে
সব ছেয়ে গেল তোমার মধুর নাম।
ছেয়েছি সহর ছেয়েছি প্রতিটি গ্রাম।

নিশিদিন ধরে' তোমার নামটি বলি,
দেহমন ঘিরে তোমারই তো নামাবলী।
আমার প্রেমের তোমার নামের গান

স্বাধীনতা শুধু, একটি ঐক্যতান
হৃদয়ে দেয়ালে কাগজে রাত্রিদিন
প্রেয়সী তোমায় চাই, স্বাধীনতাহীন।
আল্‌পনা শুধু তুমিই সারাটা দেশে,
জীবনমরণ তোমাকেই ভালোবেসে॥

বিষ্ণু দে

রাস্তা বোঝাই তোমরা কাঁপ্‌তে থাক্‌লে

রাস্তা বোঝাই তোমবা কাঁপ্‌তে থাক্‌লে
আগু পিছু অস্থির সওয়ার
নিয়ে যাবে ঠাসা মৃত্যুর খাসা ঘরে।
কুম্ভকর্ণ বাড়ীগুলো
খড়খড়ি মেলে তাকাল নীচে
যেখানে অথই সকলে দাঁড়িয়ে,
লঙ্গরখানা বিনীত যেখানে
সেখানে।
খোলা ঝাপ্টায় কাঁপ্‌তে থাক্‌ল জঙ্গল।

কোন্ মান্ধাতা আমলের ঢাল
ছিন্ন ভিন্ন। অমোঘ বর্শাফলক
চোখের পলক ফেল্‌তে না ফেল্‌তেই
বায়ুভরে হৃৎপিণ্ডে যে পৌছায়।
হাঙর-হাওয়ায় জীবন জুড়াতে কে পারে?
কাঁটাতারে ভর দিয়ে ক্ষণিক
শুধু নিষ্ঠুর বাগানকে দেখা—
প্রাণান্তিক।

অক্ষয় ক্ষত চিতায় পোড়ে
কাফনে ঢাকে।
ঝরে অকাতরে পার্কে মোড়ে
অকুণ্ঠ আয়ু।
দুর্দম আয়ু শেষ ঘোষণায় বাঁচ্‌বে বুঝি।

বরফ-রাত্রি খুঁড়ে খুঁড়ে
তোমরা চল্‌লে।
কি কথা বল্‌লে?
ছেঁড়া স্বর-দল্‌-বিধুনিত ঘুম সারা পথে।
ডানে বাঁয়ে ঘোর পতনের মুখে
নিরেট পাথরে কোন্‌ ধিক্কার
তোমরা রাখ্‌লে?—

আমরা পেয়েছি আঁধার বন্যা
বিস্তর কাল।
আমনে আউষে ডুবেছি আমরা
ক্ষুদের ভেলায় ভেসেছি শ্রান্ত গ্রামান্তরে।
সোহাগে রুদ্ধশ্বাস বহু রাত,
ছাতিফাটা সেই জোয়ারে জেগে
জ্বলেছি আহত
জ্বলেছি দ্বীপের কিনারে আমরা
গলেছি রুগ্ন ভিটায়, বেঁচেছি বুকের বাঁধে।
সে-কালো বন্যা এখানে আন্‌ল
গল্পের শেষ ছত্র টান্‌ল।
আর কি চাই?
ধনধান্যে ও পুষ্পে ভরা

দুই পারে আহা বসুন্ধরা !
বাড়ী দিয়ে আর গাড়ী দিয়ে আর শাড়ী দিয়ে
তৈরী সেরা
দুই পাড় আহা !
এক দুর্বোধ মুহূর্তে খালি দেখে নিলাম।
মাঝখানে স্রোত বইলাম।
ক্ষুদকুঁড়ো গেল, বুক বাঁধবার ভান গেল খসে' ;
গ্রাম থেকে বানে
রাক্ষুসে টানে চল্‌লাম।
আর কি চাই ?

তোমরা চল্‌লে।
ভিটেমাটি-ছাড়া ভাব্‌নার পাখা
উড়াল অন্ধ পাতাগুলো
শেষ ছত্রটা গুঁড়াল ভেঙে।
দৃশ্য জমাট বাঁধ্‌বে, যখন
ফিরবে তোমরা
অক্ষয় ক্ষত-বীজে জন্মানো
জীবন ভরে'
ফিরবে তোমরা,
পার্কে মোড়ে
ঘিরবে তোমরা
হিংস্র এলাকা ঘিরবে।

অরুণ মিত্র

একটি সনেট

সূর্য উঠেছে। অসংখ্য লাল পালে
আলোকের তীর লেগেছে, হাওয়াও লেগেছে।
দিগন্ত-ছোঁওয়া যাত্রার প্রাক্কালে
নাবিক নাবিক-প্রণয়ীব ভীরু গালে
মুগ্ধ নিবিড় মৃদু চুম্বন মেগেছে॥

প্রলয়ঙ্কব ঝড় হয়ে গেছে কাল রাত্রে।
ক্রুদ্ধ মেঘের মদিরা নভের নীল পাত্রে
পান করে' ছোটে খর বিদ্যুৎ-বাহিনী—
বজ্র আঁখরে রচে ধ্বংসের কাহিনী।

তাবপর বীর সূর্য উঠেছে তিমির জয়ী।
হিংসা মুখব রাত্রি পালায়,—মৃত্যুময়ী।
উদয়ারক্ত মেঘে মেঘে লাল্ ফৌজ।
নাবিকের মুখে নূতন দেশের গান।
জাহাজের পালে সৃজনের আহ্বান॥

জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র

ফসল

ফসল বুনিতে মোবে একদিন ডেকেছিল যাবা—
শুনিনি তাদেব কথা, গালি দিনু ইতব ভাষায়।
ফসল বুনিয়া তারা ক্লান্তিতে ঝবিয়া পড়ে আজ,
হাসিয়া প্রস্তুত আমি সে ফসল তোলাব আশায়।

সরোজকুমার দত্ত

উপন্যাসের যুগ

বাঙলা সাহিত্যে কি 'উপন্যাসের যুগ' আসিতেছে? দেখিতেছি বাঙলায় আজ কবিতা ও ছোট গল্পের মতই উপন্যাসেরও প্রসার বাড়িতেছে। ছোট গল্প ও কবিতার দিন ফুরায় নাই,—বর্তমানকালে মাসিক পত্র ও ছোট গল্প কিংবা খণ্ড কবিতার দিন ফুরাইতেও পারে না। কিন্তু গ্রন্থ প্রকাশকেরা বলিবেন, উপন্যাসের চাহিদা উহাদের অপেক্ষা বেশী। তাহা বরাবরই বেশী ছিল। কিন্তু কথা এই যে, উপন্যাসে বাঙলার সৃষ্টি প্রতিভা এবার পথ পাইতেছে, স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিতেছে। অবশ্য ইহার মানে এই নয় যে, পূর্ববর্তী বাঙলা ঔপন্যাসিকেরা পথ চিনিতেন না, নিজেদের সৃষ্টিতে স্বচ্ছন্দ হইতে পারেন নাই। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ ও শরৎচন্দ্র অন্তত এই তিন মহাস্রষ্টার প্রতিভা কেহই অস্বীকার করিতে পারে না। কিন্তু কথা এই যে, তত বড় বিরাট প্রতিভা কেহ না থাকুন, বাঙলায় আজ প্রথম শ্রেণীর ঔপন্যাসিক আছেন জন কয়, আর সেই প্রথম শ্রেণীর উপকণ্ঠেও আসিয়া পৌঁছিয়াছেন আরও কয়েকজন বাঙালী লেখক। একই কালে এতগুলি সৃষ্টিক্ষম ঔপন্যাসিক বাঙলায় আর কোনো যুগে ছিলেন কি? এত সক্ষম ঔপন্যাসিকের আবির্ভাব নিতান্ত দৈব নহে, আকস্মিকও নহে। ইহার পিছনে যে কারণ আছে সে-জন্যই আরও বেশী করিয়া ভাবা চলে যে, বাঙালী সাহিত্যস্রষ্টার পক্ষে আজ উপন্যাস লেখা স্বাভাবিক হইতেছে। আর তাই প্রশ্ন করিতে হয়—বাঙলা সাহিত্যে কি 'উপন্যাসের যুগ' আসিতেছে?

'উপন্যাসের যুগ' বলিতেই আমাদের মনে পড়ে পাশ্চাত্যদেশের উপন্যাসের যুগ। তাহা মনে পড়া খুবই স্বাভাবিক। কম বেশী আমরা উপন্যাস লিখিতেও আরম্ভ করি তাহারই আদর্শে, তাহারই প্রেরণায়, অনেক সময়ে তাহারই অনুকরণে। ইহার পূর্বে আমরা গল্প শুনিতাম, নানা আখ্যান, উপাখ্যান, গাথা, রচনা করিতাম। গল্পের নেশা আমাদের অপেক্ষা কোনো জাতির বেশী ছিল কিনা সন্দেহ। কিন্তু "উপন্যাস" যাহাকে বলে তাহা আমরা তখনো সৃষ্টি করি নাই। সেই সমাজে তাহার সৃষ্টি সম্ভবও ছিল না। উপন্যাস জন্মে ব্যক্তির স্বাতন্ত্র্যবোধের যুগে—উহা ধনিকতন্ত্রেরও যুগ। উপন্যাস তো শুধু গল্প বলে না, বলে স্বতন্ত্র ব্যক্তির কথা—যে শুধু 'বর্গ চরিত্র' নয়। যাহারা বিশিষ্ট মানুষ, পরিবেশের সঙ্গে সম্পর্কে বিশিষ্ট হইতেছে, বিচিত্র হইতেছে, বিকাশ লাভ করিতেছে, আবার পরিবেশকেও প্রভাবান্বিত করিতেছে—তাহারা, তাহাদের জীবনই উপন্যাসের

উপাদান। ছাঁচে-ঢালা মানুষ তাহারা নয়; ছাঁচে ঢালা সমাজ যেখানে সেখানে তাই উপন্যাস জন্মে না। উপন্যাস জন্মিতে থাকে যখন সমাজেব ছাঁচ ভাঙ্গিয়া স্বতন্ত্র মানুষ বাহিব হইতে চায়, বাহিব হইতে থাকে।

আমাদেব দেশে উপন্যাস জন্মে ইংবেজি আমলে। ইংবেজি-পড়া বঙ্কিমকে আমাদেব প্রথম ঔপন্যাসিক বলিতে পাবি। নিশ্চয়ই ইংবেজি 'নভেলের' আদর্শ ইঁহাদেব অনু-প্রাণিত কবিয়াছিল। তাই তাঁহাবা উপন্যাস লিখিতেনই লিখিতেন। কিন্তু তাহাবও পূর্বে আমাদেব সমাজেব ছাঁচ-ভাঙা শুরু হইয়াছিল, আব উহাবও কারণ ইংবেজেব বাজ্য জয়, এদেশেব উপর ধনিকতান্ত্রিক সমাজেব আঘাত। তাহাতেই আমাদেব পুবাতন সমাজেব ছাঁচ ভাঙ্গিয়া যাইতে থাকে। সেই বাস্তব আঘাতে ও পাশ্চাত্য শিক্ষাব ফলে আমাদেব দেশেও ব্যক্তি নিজেব স্বাতন্ত্র্য সংবন্ধে সচেতন হইতে থাকে। উহারই প্রথম প্রমাণ—'হিন্দু ইস্কুলেব' ছাত্রগণেব পুবাতন আচাব-বিচাব সমাজ-সংস্কাবেব বিরুদ্ধে বিদ্রোহ—ইংবাজি আমলেব নূতন ভাগ্যবান্‌দেব সেই সন্তানেবাই এই বিদ্রোহেব নেতৃত্ব গ্রহণ কবেন। পুবাতন ধরা-বাঁধা সামাজিক সম্পর্কগুলি তাহাদেব চক্ষে আব শাশ্বত বা অলঙ্ঘনীয় বহিল না। মানে, ব্যক্তি তখন তাহার স্বাতন্ত্র্য ঘোষণা কবিতে লাগিল। আমাদেব সমাজেও তাই ব্যক্তিব উদ্বোধন্ বঙ্কিমের আগেই শুরু হইয়া গিয়াছিল। এই সামাজিক পটভূমিকাতে বঙ্কিম তাহাব ইংবেজি-পড়া মন লইয়া উপন্যাস লিখিতে আবম্ভ কবেন।

কিন্তু আমাদেব পক্ষে এই ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যেব যুগ স্বাভাবিক ভাবে আসিতে পাবিতে-ছিল না। আমাদেব বাধা ছিল দুই দিকেই—এক বাধা বিদেশীয়, আব এক বাধা দেশীয়। দেশীয় বাধা—পুবাতন সমাজশক্তি ও সামন্তসমাজ। বিদেশীয় বাধা—সাম্রাজ্যবাদ! তাহা এক ছাঁচে-ঢালা সমাজকে ভাঙ্গিল, কিন্তু চাহিল আমাদের আর এক ছাঁচে-ঢালা সমাজে পুবিয়া বাখিতে। আমবা স্বাধীনতা পাইলাম,—স্বাধীনতা পাইলাম কেবাণী হইবার; স্বাধীনতা পাইলাম কতকটা ধনিকতান্ত্রিক জীবন ও সাহিত্য বুঝিবাব; কিন্তু স্বাধীনতা পাইলাম না ধনিকতান্ত্রিক সমাজ গড়িবাব। আমাদেব যে কাঠামোতে পুরিয়া দেওয়া হইল তাহাব চাবদিকেই সাম্রাজ্যবাদের স্বার্থেব বেড়া, উহাব অভ্যন্তবে আবাব আব এক প্রস্থ বেড়া তাহাদের নূতন জমিদার, নূতন তল্লীদাব স্বার্থেব। ব্যক্তিব স্বাধীনতা এই ব্যবস্থায় কতটুকু ছিল? এই কারণেই এই সাম্রাজ্যবাদীরা আমাদেব পুবাতন সমাজকে ভাঙ্গিতে লাগিল বলিয়াই আমাদেব চক্ষে সেই অচল সমাজের মূল্য পর্যন্ত

বাড়িয়া গেল। আমরা শশধর তর্কচূড়ামণির সহিত প্রত্যেক প্রাচীন জিনিসের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যায় একটা সান্ত্বনা খুঁজিতে লাগিলাম।

কিন্তু উপন্যাসের দিক হইতে কথা এই যে, এই যে জটিলতা আমাদের সমাজ ও জীবনে দেখা দিল তাহাতে এই দেশের মানুষ সেই মুহূর্তেই উপন্যাসের এক বিশেষ উপাদান হইয়া উঠিবার কথা। ব্যক্তি জাগিতেছে, আর জাগিতে না জাগিতেই দেখিতেছে দুই দিকে তাহার দুই দুস্তর বাধা—রাষ্ট্রক্ষেত্রে তাহার পঙ্গুতা আর সমাজক্ষেত্রে আচারে-বিচারে তাহার বন্দীত্ব। আবার বাস্তবক্ষেত্রের এই বাধা তাহার মানসক্ষেত্রে আরও জটিলতার সৃষ্টি করিল—সে ধনিকতন্ত্রকেও স্বাগত করিতে পারিল না, আবার তাহার ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্যবাদকেও অস্বীকার করিতে পারিল না; সে পুরাতন অচল সমাজকেও আঁকড়াইয়া থাকিতে পারে না, অথচ উহার ধ্বংসেও সায় দিতে চাহে না। এই বাস্তব ও মানসক্ষেত্রের ঘটনা ও আবেগের সংঘাতে এইরূপ সমাজের মানুষ স্বভাবতই উপন্যাসের উপযুক্ত "চরিত্র"রূপে লেখক ও স্রষ্টাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার কথা।

তাহাই করিয়াছিলও। বঙ্কিম, রবীন্দ্রনাথ, শরৎচন্দ্র ইহারা এই বাঙালী জীবনকে উপন্যাসের উপযুক্ত উপাদান বলিয়া বেশ বুঝিয়াছিলেন। কিন্তু অপেক্ষাকৃত কম শক্তিশালী লেখকেরা তখনো ভাবিতেছিলেন—এ বাঙালী জীবনে বৈচিত্র্য নাই, ঘটনা নাই। তাহার কারণ তাঁহারা এই জীবনকে প্রত্যক্ষ দেখিতে চাহেন নাই, জীবনকে দেখিতেছিলেন পরোক্ষে—বিলাতী নভেলের ও পুঁথিপড়া দৃষ্টিতে। তাই দুই একজন প্রতিভাশালী স্রষ্টাই তখন সার্থক ঔপন্যাসিক হইয়া উঠিয়াছেন। অন্যেরা উপন্যাসের সত্য বুঝিতে পারেন নাই, গ্রহণও করিতে পারেন নাই—তাঁহারা বিলাতী নভেল হইতে প্লট খুঁজিতেছিলেন; পরবর্তী কালে বিলাতী উপন্যাসের অনুসরণে কেহ কেহ লিখিতেছিলেন চতুর কথাবার্তা, মতামত, মনস্তত্ত্ব। অথচ সম্মুখেই তাহাদের উপন্যাসের উপাদানের অভাব ছিলনা।

আমাদের সমাজে সেই উপাদান আজও তেমনি আছে। মূল সামাজিক অবস্থা পরিবর্তিত হয় নাই। সামন্ততন্ত্র মরিয়াও মরে নাই, ধনিকতন্ত্র জন্মিয়াও জন্মে নাই; তাই ব্যক্তিত্ব ফুটিয়াও ফুটিতে পায় না; আর স্তর-বিভাগ বাড়িয়াও সুচিহ্নিত হয় না। কিন্তু ইহারই উপরে আরও নূতন সামাজিক শক্তির আঘাত আসিয়া পড়িতেছে, পৃথিবী-জোড়া সংকটের ঘাত-প্রতিঘাত এই সমাজেও আমরা দেখিতেছি।

তাহাতেই একদিকে আমাদেব অর্ধস্ফুট ব্যক্তি-চেতনা আবও তীব্র ও চঞ্চল হইয়া উঠিতেছে; অন্যদিকে সাহিত্যিক ও লেখক সমাজ উহাব নিষ্ঠুবতম আঘাতে হইয়া উঠিতেছেন এইবাব বাস্তবমুখী,—এমন কি, সমাজ সচেতন। আজিকাব জীবনযাত্রা এমন সংকট-সংকুল হইয়া উঠিতেছে যে, সাহিত্যিক তাহা না দেখিয়া পাবেন না। আব সঙ্গে সঙ্গে তিনি দেখিতেছেন—এই যুগেব আমবা নানা বিরোধী ঘটনা ও ভাবেব তবঙ্গে কত আকর্ষণীয় উপাদান হইয়া উঠিয়াছি—কত জটিল ও বিচিত্র আমবা—কত বিশিষ্ট আমবা প্রত্যেকে, আব কত অপবিস্ফুট রহিতেছে আমাদেব বৈশিষ্ট্য তথাপি,—আমাদেব ব্যক্তিত্ব সুসংহত হইতে না হইতে কত ব্যহত আর কত ভগ্ন; কত হাস্যকব আমবা আব কত শোকাবহও!

এই নানা ঘাত-প্রতিঘাতেব একটা হিসাব লইলেই বুঝিতে পাবি এই কথার সত্য। গোড়াব কাবণ বাবেবাবে বলিয়া লাভ নাই—তবু একবাব স্মবণ করিব। আমাদেব জীবন ছিল সাম্রাজ্যবাদেব আওতায় এক ঔপনিবেশিক জীবন—আধা-সামন্ততন্ত্র, আধা-ধনিকতন্ত্রেব সমাজে আমবা মানুষ। এই সমাজে একদিকে হাষদ্রাবাদ, কাশ্মীব হইতে কুচবিহাব বাজকোটও আছে, আব আছে জমিদার-তালুকদাব, জায়গীবদাববা, আছি সাম্রাজ্যবাদেব তল্পীদাব মধ্যবিত্ত আমবা, আছে অসংখ্য কৃষক ও ক্ষুদ্র কাবিগব; আবাব ইহাবই মধ্যে আসিয়া গিযাছে নবজাত দেশী ও বিদেশী টাটা, বাটা, বিড়লা, আব তাহাদেব এবং বেলওযে ও ডকেব শ্রমিক দল। অসামঞ্জস্যেব অভাব নাই, তাই সবই অপবিস্ফুট; কিন্তু বৈচিত্র্যও কম নাই।

জীবনক্ষেত্রে ও মানসক্ষেত্রে এই অসামঞ্জস্যেব ফল ফুটিযা উঠিতেছে। তাই একই কালে আমবা বিংশ শতাব্দীর মানুষ আবাব টোটেম-টেবুব যুগেবও মানুষ। যে প্রাচীন জাতি ধাবাবাহিকতা বজায বাখে তাহাদের এই অবস্থা অসম্ভব নয়। কিন্তু যাহাবা সাম্রাজ্যবাদেব বন্ধনে বন্দী না হয় তাহাবা সমাজ বিকাশেব সহজ নিয়মেই সমাজ-বিপ্লব সংসাধিত কবে, পুবাতনকে আক্ষবিক মূল্য দেয় না, তাহাব ঐতিহ্যকে রূপান্তরিত করে, নূতনকে আয়ত্ত কবে, পুবাতনকে বিকাশেব সহায়ক কবিয়া লয়। তাহাবা তুর্কীদেব পথে তাল ঠুকিয়া অগ্রসর হয়, চীনাদেব পথ দ্বিধাজড়িত চবণে গ্রহণ করে, কালক্রমে সোভিয়েট দেশেব মত বৈপ্লবিক স্পর্ধাবও অধিকাবী হইতে পাবে। কিন্তু আমবা 'ঔপনিবেশিক' শাসনেব চাপে সেরূপ স্বাভাবিক ভাবে কিছুই ঝাড়িয়া ফেলিতে পাবি নাই। আচাবে-বিচাবে হিন্দু-মুসলমান সবাই আমরা

তিন হাজার বৎসরের বোঝা কাঁধে বহিয়া ফিরি—আবার এ যুগের যন্ত্রচালিত সভ্যতাকেও স্বীকার না করিয়া পারি না। বিজ্ঞান পড়ি, রেডিও শুনি, সিনেমা দেখি, রেল, ট্রাম, ষ্টিমার, তার, বেতার, সংবাদপত্র কিছুই বাদ দিই না; ইহারই মধ্যে আবার করকোষ্ঠী বিচার করি, গণ মিলাইয়া পুত্র কন্যার বিবাহ দিই, ধনতান্ত্রিক নীতির সহিত খাপ খাওয়াইয়া sacramental বিবাহকে সহজেই পণ্য করিয়া লই; অথচ মেয়েদেরও পড়াই, নিজেরাও এক আধটুকু প্রেমের চর্চা না করি তাহা নয়, কিন্তু বিবাহকালে আবার পিতৃভক্ত রামচন্দ্রও হই, মৃতাশৌচেরও দিন প্রায় প্রত্যেকেই কামাইতে চাই;—সকলেই ব্রাহ্মণ হই, ক্ষত্রিয় হই, পাইলে কেহই বিলাতী খানা খাইতেও দ্বিধা করি না—এই অপূর্ব জগা-খিচুড়ীর তালিকা দেওয়া অসম্ভব। কারণ, ইহাই আমাদের জীবন। আর, ইহাতে হাস্যকরতা যেমন আছে তেমন শোচনীয়তাও আছে, আছে মানুষের নানা ছোট বড় জিনিসের টানে মরিবার—ও বাড়িবার— অবকাশ।

প্রাচীন-নবীনের সংঘর্ষের মূল সংকটেরই মধ্যে আরও ছোট বড় সংঘাত যে রহিয়াছে তাহাও আমরা এইখানেই স্মরণ করিতে পারি। প্রশ্নটা মূলত আমাদের স্বাধীনতার—ব্যক্তি-স্বাধীনতার তথা জাতীয় স্বাধীনতার প্রশ্ন। এই শতাব্দীতে অন্য কোনো নাম দিয়া আমাদের সামাজিক চেতনাকে বুঝানো যায় না। কিন্তু মুশকিল এই—এই জাতীয়তাবোধ আবার আমাদের মনে ও কাজে কোন একটা সুস্থির রূপ গ্রহণ করে নাই। আমরা একই কালে ভারতীয় জাতীয়তা ও বাঙালী জাতীয়তা দুই ধারণাতেই বর্ধিত হইয়াছি। স্বাধীনতাবোধ তীব্র হইয়া উঠিতেই আজ ভাবিতে হইতেছে—কতটা ভারতীয় সচেতনতা কতটা বাঙালীর জাতীয়তার সহিত খাপ খাওয়াইতে পারি। বাঙালীর আর্থিক জীবন সাম্রাজ্যবাদীর হাতে ছিল, আজ ভাটিয়া-মারোয়াড়ী-বোম্বাইওয়ালা তাহাতে অংশীদার হইতেছে; তাহারই ফলে বাঙলার রাষ্ট্রীয় জীবনেরও তাহারা কর্ণধার হইতেছে—যাহারা বাঙলা ভাষাও জানে না, বলে না, তাহারাই হইতেছে বাঙালী জাতির ভাগ্য নিয়ন্তা—এই সব কথা হিন্দুমুসলমান, 'পাকিস্তান-ওয়ালা' 'হিন্দুস্থানওয়ালা', কোন্ বাঙলীর মনে আঘাত না দেয়? মানসিকক্ষেত্রে ও জীবনের ক্ষেত্রে বাঙালী এই সংঘাতে কম বেশি চঞ্চল হইবেই।

কিন্তু ইহার অপেক্ষা কম নাড়া দেয় না—হিন্দু-মুসলমানের সম্প্রদায়গত আনুগত্য ও বিরোধ। তাহার পিছনেও অনেক ঐতিহ্য, অনেক আবেগ সঞ্চিত হইয়াছে, অনেক স্বার্থও দানা বাঁধিতেছে। "ভারতীয় জাতীয়তা বনাম বাঙালী জাতীয়তা"

আধুনিক সামাজিক বিকাশের একটা অপবিহার্য স্তব। কিন্তু "হিন্দু-জাতীয়তা বনাম. মুসলিম জাতীয়তা"-র সেইরূপ আধুনিক সামাজিক ভিত্তি নাই। তাহাব ভিত্তি মধ্যযুগীয জীবন-পন্থা ও চিন্তাব; কিন্তু তাহাব জট আরও শক্ত। হিন্দু-মুসলমানেব জীবনযাত্রায় হাজাব খুঁটিনাটিতে তফাৎ আছে, তাহা লইয়াই হিন্দু হিন্দু, মুসলমান মুসলমান। তাহা সত্ত্বেও তাহাবা বাঙালী—ভাবতবাসীও। কিন্তু তাহাব জন্যই সেই আধুনিক জাতি-চেতনা পুবাতন সম্প্রদায়গত চেতনাব দ্বাঁরা আবাব ব্যাহত হইতেছে।

মানে, একই কালে আমাদেব জীবন এই দুই পৃথক পৃথক আবেগে-আকাঙ্ক্ষায় বিভক্ত ও খণ্ড হয। সামাজিক বিন্যাসেব দিক হইতে যে ঔপনিবেশিক ব্যবস্থা চলিযাছে তাহাতে পাশাপাশি দুইরূপ শ্রেণীবিভাগ চলিতেছে, সামন্তযুগেব ও ধনিকযুগেব। শোষণধর্মীরা একই সঙ্গে শোষণ চালাইতেছেন; এই সমান্তরাল বিভাগ আবাব গুলাইয়া দিতেছে সম্প্রদাযগত খাড়া বিভাগ। সংকট আবও জটিল হয়—আমাদেব মানসিক ও বাস্তব জীবন এই দুইরূপ দ্বন্দ্বে সংগ্রামসঙ্কুল হয়।

ইহাবই সঙ্গে জড়িত হইলেও আবার ইহা হইতে পৃথক আমাদের আব এক সংকট —বাঙলাব সংস্কৃতি-বিভ্রাট। উহাকে এক দিক হইতে বাঙলাব হিন্দু-মুসলমান-সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব বলা যাইতে পারে, আবার বাঙলার পৌর ও পল্লী সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব বলিতে পারি। কিন্তু তাহা আংশিক দেখা হইবে। এবং উহাকে বলিতে পাবি জন-সংস্কৃতিব ও বাঙলাব ভদ্র-সংস্কৃতিব অর্থাৎ ঔপনিবেশিক ব্যবস্থাব সাংস্কৃতিক রূপ। ইহার ফলে বাঙলায় একটা মধ্যবিত্ত ভদ্রশ্রেণীব প্রতিষ্ঠা হয়। তাহারা ধনিকতান্ত্রিক সংস্কৃতিব মানস-সন্তান; তাই তাহাদেব সৃষ্টি প্রয়াসে ধনিকতন্ত্রেব চিন্তা, কল্পনা, আদর্শ প্রভৃতি সবাসবি গৃহীত হয়। যতদিন ধনিকতন্ত্রের সৃষ্টি স্বচ্ছন্দ ছিল ততদিন উহার এই পুঁথিগত ও ভাবগত প্রেরণা এই ভদ্রশ্রেণীব সৃষ্টিকে প্রবুদ্ধ কবিযাছে। কিন্তু আবাব ধণিকতন্ত্রের বিকৃতিব সঙ্গে সঙ্গে ধণিকতন্ত্রেব সৃষ্টিতে বিকার যেমন দেখা দেয়, এদেশেব ভদ্রশ্রেণীব ধার-কবা প্রেরণায়ও তেমনি আবিলতা আসিতে থাকে—মানে, ভদ্রকাল্‌চার তাহাব স্বাচ্ছন্দ্য হারায়। কোনো কালেই তাহার উৎস ঠিক এ-দেশেব জীবনক্ষেত্রে সে পায নাই, তাই তাহাব সেই ব্যর্থতাব বোঝাই তখন তাহাকে চাপিয়া ধরে। ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায়, ভদ্র-কাল্‌চাবের (কি বাবু কালচারেব, কি মিঞা কাল্‌চাবেব—যদি তাহা জন্মে) ইহাই হয় পরিণতি।

অন্য দিকে জনসমাজে যে স্বচ্ছন্দ সংস্কৃতিধারা বহিয়া আসিতেছিল—বাঙলায় প্রধানত তাহা ছিল পল্লী-সংস্কৃতি—বণিক সভ্যতার আঘাতে তাহারও দিন ফুরায়। পুরাতন সমাজ ও পল্লীজীবন নাই,—জীবন শহরে হাটে-বাজারে কেন্দ্রীভূত হইতেছে—পল্লীর যাত্রা, কথকতা, কীর্তন, জারি গান, সারিগানও তাই স্বাভাবিক ভাবে বিকশিত হয় নাই। এমন কি, শুধুমাত্র ঐ সব রূপে ও কথায় আজ পল্লীর কৃষকও তৃপ্তি পায় না, তাহারা থিয়েটার দেখে, সিনেমায় ভিড় করিয়া আসে, উদ্ভার গানে গল্পে আনন্দ পায়। তাই অবস্থাটা এই—বাঙলার ঔপনিবেশিক কালচার তো পল্লী-সংস্কৃতি ও ভদ্র-সংস্কৃতি এই দুই রূপে দ্বিধাবিভক্তই, অধিকন্তু ঐ দুই ধারাই ঔপনিবেশিক ব্যবস্থায় আজ স্রোতোহীন। আর বঙ্গীয় সংস্কৃতির এই সংকট—বা ঔপনিবেশিক সংস্কৃতির এই অচলতা—কোন্ বাঙালীকে চঞ্চল না করে ?

মোটের উপর এই ছিল আধুনিক বাঙালী জীবনের আসল রূপ—'ঔপনিবেশিক' সংকটে চাপা-পড়া জীবনযাত্রা, সে সমাজের শ্রেণীবিভাগ অস্পষ্ট. জাতীয়বোধ অস্ফুট। ইহার মধ্যে সম্প্রদায়গত বিরোধ-আনুগত্যের টান, আচারে-বিচারে পুরাতনের প্রভাব ও নূতনের স্বীকৃতি, আবার শিক্ষায় দীক্ষায় দুই নিষ্প্রাণ সংস্কৃতির দ্বন্দ্ব ও বিভ্রাট;—এই সকলে মিলিয়া আধুনিক বাঙালী জীবনে আমরা যেমন নিজেদের ব্যক্তিত্বকে বেশি ব্যাহত দেখিতেছি, তেমনি সে ব্যক্তিত্বের অসম্ভব বৈচিত্র্য ও সম্ভাবনার কথাও বেশি বুঝিতেছি। এই কারণে লেখকের চোখে আমাদের জীবন হাস্যকর ঠেকিবার কথা, আবার শোচনীয়ও ঠেকিবার কথা,—কিন্তু জটিল ও আকর্ষণীয় তো ঠেকিবেই। ঔপন্যাসিকের পক্ষে এ-কালের বাঙালী সত্যই ভালো উপাদান—শরৎচন্দ্র তাহার প্রমাণ রাখিয়া গিয়াছেন।

কিন্তু সেই বিচিত্র বিভ্রান্ত জীবন আরও বিচিত্র আরও জটিল হইয়া উঠিয়াছে বর্তমান সময়কার ঘটনাবলীর দুর্বার আঘাতে। প্রধানত, যুদ্ধ হইতেই উহার উৎপত্তি ধরা যায়—যদিও যুদ্ধের উৎস আবার সাম্রাজ্যবাদ ও ধনতন্ত্রের সংকটে, আর সেই ধনতন্ত্রেরই ঔপনিবেশিক রূপ আমাদের দেশে আমরা দেখি।

এই যুদ্ধকে একটা সরল, বাঁধাধরা চেনা-পরিচিত সূত্রে আমরা ব্যাখ্যা করিতে পারিলে নিশ্চিন্ত হইতাম; কিন্তু তাহা পারি না। একই কালে এই যুদ্ধ জাতিতে জাতিতে যুদ্ধও বটে, কিন্তু আবার প্রত্যেক দেশেই গৃহযুদ্ধও বটে। জাতিতে জাতিতে যুদ্ধ বলিতেছি, কারণ, অনেক জাতির পক্ষে ইহা Patriotic War. গৃহযুদ্ধ

বলিতেছি, কাবণ, স্পেনের ফ্রাংকোব দল, ফ্রান্সেব দুইশ' পবিবাব হইতে নরওয়ের কুইস্‌লিং ও পোল্যাণ্ডেব পূর্বতন বাষ্ট্রকর্তাবা কে না চাহিয়াছে হিটলারের হাতে নিজেদেব দেশেব জনশক্তিব পবাজয় ? কিন্তু যুদ্ধেব এই দুই রূপে অধিকাংশ দেশেব মানুষ দিশা-হাবা হয়। ইংলণ্ডেও প্রথম যুদ্ধ বাধিতে তাহাব কবিকুলেবা কোনো প্রেবণা পায় নাই, 'বেশি মন্দেব ভয়ে কম মন্দেব জন্য' প্রাণ দিবাব সার্থকতা দেখে নাই। তখন যুদ্ধ লইয়া তাহাদেব মনে একটা অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয়। এ যুদ্ধে সেই অন্তর্দ্বন্দ্ব দেখা দেয় নাই একমাত্র সোভিয়েট দেশে। কারণ, সেখানে মানুষ শ্রেণীবিভক্ত নয়; তাই সহজেই বুঝিয়াছিল যুদ্ধ তাহাদেব যুদ্ধ। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব অন্যান্য দেশেব জনমনে কমিতে থাকে যতই ফ্যাসিজম্-এব বিশ্বজয়েব চেষ্টা পরিষ্কাব হয়। আব শেষে যখন হিটলাব সোভিয়েট দেশ আক্রমণ করিল তখন জনচিত্তেব বিভ্রম তখন ঐ সব দেশে কমিয়া আসিল। তবু কি একেবারে লোপ পাইয়াছে ? কিন্তু যুদ্ধ সংবন্ধে ঔপনিবেশিক দেশের লোকের মনে বিভ্রম আরও বেশি হইবার কথা—হইয়াছেও তাহাই। আমবা জানি—ফ্যাশিজম্ ও সাম্রাজ্যবাদ এপিঠ-ওপিঠ; আমবা দেখি—সাম্রাজ্যবাদ এক চুলও পরিবর্তিত হয় নাই; আমরা মনে কবি—এই যুদ্ধে জিতিয়া উহা বুঝি নিষ্কণ্টক ও দুর্ধর্ষ হইবে। অতএব, 'ফ্যাসিজম্-এব বিরুদ্ধে যুদ্ধ করিব' বলিতে আমবা প্রেরণা পাই না। অথচ এই কথাও সত্য, আমাদেব কোনো স্বাভাবিকচিত্ত মানুষই ফাশিস্তদের বিজয় চাহে না। যুদ্ধ সম্পর্কে আমাদের এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সুপবিচিত। এই অন্তর্দ্বন্দ্ব সুতীক্ষ্ণও। আমরা আজ দেখিতেছি পৃথিবীর জনশক্তি সত্যই অগ্রসব হইতেছে। কিন্তু তবুও ভাবিতে পাবি না এশিয়াব এই কালা আদমীদেব জন্য সেই জনশক্তিব মাথা ব্যথা আছে—অন্তত ব্রিটিশ জনশক্তিব কোনো দবদ থাকিবে। এমনি কবিয়া এই যুদ্ধকে আশ্রয় করিয়া আমাদেব চেতনায় গভীব দ্বন্দ্ব ও জটিলতা দেখা দিয়াছে। এক-আধটা সহজ দৃষ্টান্ত লইলে হয়ত কথাটা বুঝিতে পারি—দেশীয় একটি কাপড়ের কলেব মজুরকে ধরা যাউক (সম্প্রতি আমাদেব দশটি কল সবকারী আদেশ অমান্য কবিয়া অতিরিক্ত মুনাফাদাবী কবিতেছিল বলিয়া কর্তৃপক্ষ তাহাব কর্তৃত্বভাব গ্রহণ কবিয়াছে, ইহা স্মবণীয়)। যুদ্ধেব প্রথম দিকে এই সব কল শতকরা এক শত হইতে তিন শত টাকা মুনাফা করিতেছিল। মাল যাইতেছিল যুদ্ধেই ; দেশেব লোক তখনি ভুগিতেছিল বস্ত্র-দুর্ভিক্ষে। কিন্তু মজুবরা মজুবীব উপব শতকবা সাড়ে বার টাকাও মাগ্‌গী ভাতা পায় নাই। যুদ্ধের সেই প্রথম দিকে এরূপ কোনো মজুরের কর্তব্য ছিল কি ?' মাগ্‌গী ভাতা আদায় করা, ধর্মঘট করা ? শ্রেণী-সচেতন

মজুরের পক্ষে তাহাই হয়ত পথ। কিন্তু এই ঔপনিবেশিক দেশের মজুর তো অত সহজে শ্রেণী-সচেতন হইতে পারে না—সে জানে দেশী মালিকের বদান্যতা, জানে গান্ধিজীর ধর্মঘট সংবন্ধে আপত্তি। আবার শ্রেণী-সচেতন বলিয়াই সে জানে জাতীয় বিপ্লবের আসল সৈনিক সে-ই, মজুরই। কিন্তু মালিকেরা জাতীয় ধনিক, কে বলিবে তাহাদের কলে ধর্মঘট কতটা বিপ্লবী মজুরের পক্ষে সমীচীন? একদিকে জাতীয়তাবাদের প্রেরণা অন্য দিকে শ্রেণী-সংগ্রামের প্রেরণা—দুই-এর দ্বন্দ্ব; সহজে কি তাহা সেই মজুর মিটাইতে পারে? না, আমরা শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরাই পারি? ইহার পরে মনে করা যাক, যুদ্ধের বর্তমান স্তরের কথা। প্রত্যেক শ্রেণী-সচেতন মজুরের পক্ষে—সাধারণ গণতান্ত্রিকের পক্ষেও—এই যুদ্ধে প্রধান কাজ হইল উৎপাদন বাড়ানো! বস্ত্র-দুর্ভিক্ষে দেশ আকুল; কাজেই দেশের জন্যও বস্ত্র উৎপাদন বাড়ানো প্রয়োজন। অথচ জিনিসপত্রের দাম তিনগুণ, মাগ্‌গী ভাতাও মজুরেরা পায় না, বরং পায় উল্টা অত্যাচার—তাহা হইলে কি করিবে এ অবস্থায় মজুরেরা? শ্রেণী-সচেতন মজুর তথাপি উৎপাদন বাড়াইবে, ধর্মঘট করিবে না। সে তাহা বাড়াইতেছে—কিন্তু উৎপন্ন বস্ত্র যে জনগণের হাতেও পৌঁছিতেছে না। অন্য দিকে মজুরের নিজেরও অন্ন জুটিতেছে না। ঐরূপ ক্ষেত্রে মজুরের চিত্তে যুদ্ধ সংবন্ধে, উৎপাদন সংবন্ধে, শ্রেণী-স্বার্থ সংবন্ধে, জাতীয় স্বার্থ সংবন্ধে—একই কালে যে কতরূপ বিভিন্ন প্রশ্নের উদয় হয়, কত অন্তর্দ্বন্দ্বের সৃষ্টি হয়, তাহা আমরা নিত্য দেখি। এমন জীবন, এমন মন যে উপন্যাসিকের হাতে এক চমৎকার উপকরণ—যদি ঔপন্যাসিক জানেন সেই জীবন, দেখিয়া থাকেন-তেমন মানুষকে—তাহা বলাই বাহুল্য। যুদ্ধকালে এইরূপ মানবতাবোধ ও জাতীয়তাবোধ, সামাজিক স্বার্থ ও ফ্যাশিবাদ, আদর্শ ও বাস্তবের বহু রকমের দ্বন্দ্ব আমাদের সকলের মনেই আলোড়ন সৃষ্টি করিয়াছে। শুধু আলোড়ন সৃষ্টি করে নাই। আমাদের জীবনকে তাহা আঘাতে আঘাতে জটিলও করিয়া তুলিয়াছে। যে যত বড় শিল্পরসিক হন, বলিতে পারিবেন না এই সংঘাত তাহাকে স্পর্শ করে নাই।

অবশ্য শুধু যুদ্ধেও এতটা আমাদের জীবনের ভাঙা-গড়া শুরু হইত না। বোমার ভয়ে আমরা হয়ত খানিকটা ব্যতিব্যস্ত হইয়া আবার স্থির হইতে পারিতাম। কিন্তু এই ঔপনিবেশিক জীবন-যাত্রার উপর যুদ্ধ আজ কি ভাবে না ভাঙিয়া পড়িয়াছে। বানচাল আমলাতন্ত্র কেমন করিয়া না মন্বন্তরের মুখে আমাদের ফেলিয়া দিয়াছে। ইহার সম্পূর্ণ অর্থ যে কি, আজও তাহা আমরা সম্পূর্ণ বুঝিতে পারি না। মোট দুই-

একটা সত্য দেখিতেছি : পাঁচ বৎসরের যুদ্ধে সমস্ত ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে (ভারতবর্ষ শুদ্ধ) প্রায় সাড়ে ছয় লক্ষ লোক মরিয়াছে। এমেরি সাহেবের হিসাবেই মাত্র ছয় মাসে এক বঙ্গদেশেই মন্বন্তরে মরিলাম আমরা সাড়ে ছয় লক্ষ বাঙালী! আর কত লোক গৃহছাড়া হইয়াছে, কত স্কুল উঠিয়া গিয়াছে, কত মানুষ জীবনীশক্তিহীন হইয়াছে, তাহার কি ঠিকানা আছে? অন্যদিকে দেখি, যাহারা যুদ্ধে মরে তাহারা দিয়া যায় জাতিকে একটা নৈতিক প্রেরণা, আর মন্বন্তর রাখিয়া যায় জাতির মনে একটা হতাশা। যুদ্ধ নাকি জাতির চেতনায় বিপ্লবের সূচনা করে। মন্বন্তরে এমন বিভ্রান্ত মানুষের মনই কি তবে একেবারে নির্দ্বন্দ্ব নিরঙ্কুশ থাকিবে? এতবড় দৃশ্য, মানুষের অকল্পিত দুর্ভাগ্য ও সমাজের এমন ভাঙন কি কোনো লেখক এযুগে বাঁচিয়া বলিতে পারেন তিনি দেখেন নাই?

ইহারই মধ্যে—যুদ্ধ, মুদ্রাস্ফীতি ও মন্বন্তরে মিলিয়া—আর একটি সত্য যাহা পরিষ্কার হইতেছে, তাহাও এইখানেই স্মরণীয়। বাঙালী সমাজে বড়লোকেরা আরও বড় হইয়াছে,—সামান্য কিছু মধ্যবিত্তও ঊর্ধ্বে উঠিয়া গিয়াছে, নিম্নবিত্তগণ বিত্তহীন হইয়াছে, আর গরীবেরা আরও গরীব হইয়াছে। মানে, আর্থিক-বিন্যাসে বড়-ছোটর মধ্যখানে কেহ আজ আর টিকিতে পারিতেছে না, দুই দিকের দূরত্ব সুস্পষ্ট হইয়া উঠিতেছে। ইহার ফলে হয়ত একদিন "প্রমাণ-সই" মজুরের দাবী বাড়িবে, ব্যক্তিকে ছাঁটাই করিবার চেষ্টা হইবে। কিন্তু আজ যাহা হইতেছে তাহা—এই আর্থিক বিপর্যয়ে মানুষের ব্যক্তিত্ব আরও আত্ম-সচেতন হইতেছে—এই দুর্ভাগ্য পরিবেষ্টিত মানুষ, তাহার সংগ্রাম, তাহার জয়—এবং পরাজয়ও—আজ শিল্পীর দৃষ্টিকে আকর্ষণ করিবেই। শিল্পীও তাহা একেবারে না দেখিয়া পারেন না—ট্রামে বাসে সর্বত্রই দেখিতেছেন নূতন বড়মানুষদের এবং চারিদিকেই দেখিতেছেন নূতন নিঃস্বদেরও।

এই যুগের বাঙালী এই সব কারণে স্বভাবতই জটিল ও বিচিত্র হইয়া উঠিতেছে—যে বাঙালীদের শরৎচন্দ্র দেখিয়াছিলেন তাহারা ছিল আধা-সামন্ত যুগের ব্যক্তি। যুদ্ধে, মন্বন্তরে, ধনাগমে ও রিক্ততায় মিলিয়া আজিকার বাঙালীর আরও বেশি বিচিত্র বিবর্তন ঘটিতেছে; আর যুদ্ধে-মন্বন্তরে মিলিয়া আজিকার বাঙালী শিল্পীকেও এই বাস্তব অবস্থা সংবন্ধে, চারিদিককার মানুষের দুর্ভাগ্য সংবন্ধে, এই ভাঙ্গা সমাজের জটিলতা সংবন্ধে, ব্যক্তির সম্ভাবনা ও তাহার বাধা সংবন্ধে অনেক বেশি সচেতন করিয়া তুলিয়াছে। আজিকার শিল্পীরা সমাজ-সচেতন হইতেছে; এবং এই কারণেই উপন্যাস আজ তাহাদের প্রধান স্বাভাবিক সৃষ্টি-পথ।*

গোপাল হালদার

---

*প্রবন্ধটির নামকরণ হইবে—"ঔপনিবেশিক সমাজ ও উপন্যাসের যুগ।" বর্তমান নামকরণে যে অসঙ্গতি রহিয়াছে, পাঠকবর্গ তাহা সংশোধন করিয়া লইবেন। ইতি লেখক।

পুস্তক-পরিচয়

রবীন্দ্র-সাহিত্য

রবীন্দ্র-রচনাবলী—সপ্তদশ ও অষ্টাদশ খণ্ড। মূল্য সাড়ে চার ও পাঁচ টাকা। **জীবনস্মৃতি**। মূল্য সাড়ে তিন টাকা। বিশ্বভারতী।

রবীন্দ্র-রচনাবলীর অন্যান্য খণ্ডের মত, এই দুটি খণ্ডেরও বিশেষ আকর্ষণ, গ্রন্থ-পরিচয়, সংযোজন, পরিশিষ্ট প্রভৃতি বিভাগের অন্তর্ভুক্ত রবীন্দ্রনাথের অপ্রকাশিত বা অবলুপ্ত রচনা, রবীন্দ্রজীবনী বা রচনা সম্বন্ধে নূতন, বা পূর্বতন কিন্তু বিক্ষিপ্ত তথ্যের একত্র সমাবেশ। এই দুই খণ্ডে এরূপ রচনা ও তথ্য যা সংকলিত হয়েছে সংক্ষেপে তার উল্লেখ করা যাচ্ছে।

গৃহপ্রবেশ নাটক সাধারণ রঙ্গমঞ্চে অভিনয়ের সময় রবীন্দ্রনাথ নাটকে দুটি চরিত্র (টুকরি ও বোষ্টমী) যোগ করে দেন; এই উপলক্ষ্যে যে দীর্ঘ সংলাপ রচিত হয় এতদিন তা কোথাও প্রকাশিত হয় নি; সপ্তদশ খণ্ডে তা সম্পূর্ণ মুদ্রিত হয়েছে।

বিচিত্রিতার অনেকগুলি কবিতার পাঠান্তরও এই খণ্ডে প্রকাশিত হয়েছে। বিশেষ করে উল্লেখযোগ্য জীবনস্মৃতি-প্রসঙ্গে এই খণ্ডে আহৃত নূতন উপকরণ।

অষ্টাদশ খণ্ডে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য, শেষ সপ্তকের 'সংযোজন'। এই বিভাগে শেষ সপ্তকের অনেকগুলি কবিতার ছন্দোবদ্ধ রূপ, বা রূপান্তর সংকলিত হয়েছে, সাহিত্য-শিল্পী হিসাবে রবীন্দ্রনাথ যে কিরূপ সচেতন ছিলেন, নিজের লেখা সম্বন্ধে তিনি যে কিছুতেই খুসি হতে পারতেন না, এই সংযোজন থেকে তার পরিচয় পাওয়া যায়। কয়েকটি চিঠি যে শেষ সপ্তকে কিভাবে কাব্যাকার ধারণ করেছে তার নিদর্শনও কৌতূহলোদ্দীপক।

ব্রাহ্মরা হিন্দু কি না, এই আলোচনা একসময়ে ব্রাহ্মসমাজকে আন্দোলিত করেছিল; "আত্মপরিচয়" প্রবন্ধ লিখে ব্রাহ্মরা যে হিন্দু অভিধার অন্তর্গত এই মত রবীন্দ্রনাথ সমর্থন করেছিলেন; ফলে তাঁকে যেরূপ সমালোচনাভাজন হতে হয়েছিল, তিনিও "হিন্দু ব্রাহ্ম" প্রবন্ধ লিখে তার প্রত্যুত্তর দিয়েছিলেন। অষ্টাদশ খণ্ডের প্রকাশিত 'পরিচয়' গ্রন্থের অন্তর্ভুক্ত আত্মপরিচয় প্রবন্ধ-প্রসঙ্গে, তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা থেকে 'হিন্দু ব্রাহ্ম' প্রবন্ধটি পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, ও এই প্রসঙ্গে সাময়িক পত্রে যে বাদানুবাদ চলেছিল তার নির্দেশ ও সূচী দেওয়া হয়েছে।

জীবনস্মৃতিব নূতন স্বতন্ত্র সংস্কবণে বচনাবলীতে প্রকাশিত অধিকাংশ উপকরণই পুনর্মুদ্রিত হয়েছে, নূতন উপকরণও যুক্ত হয়েছে, ববীন্দ্রনাথ বলেছেন এই পুস্তকেব "স্মৃতিচিত্রগুলি ··· সাহিত্যেব সামগ্রী। ইহাকে জীবনবৃত্তান্ত লিখিবাব চেষ্টা হিসাবে গণ্য করিলে ভুল হইবে।" "আমাব জীবন বলে একটা বিশেষ গল্প যাহাতে প্রবল হয়ে না ওঠে তাব জন্য আমাব চেষ্টার ত্রুটি হয়নি।" কিন্তু ববীন্দ্র-জীবনস্মৃতিতে "এমন কিছুই নাই যাহা চিবস্মরণীয কবিয়া বাখিবাব যোগ্য," তাঁর জীবনবৃত্তান্ত লেখা "অনাবশ্যক," একথায পাঠকেব পক্ষে সায় দেওয়া সম্ভবও নয়, স্বাভাবিকও নয়; এবং জীবনস্মৃতি যদিও তাব সাহিত্যরসের জন্যই বাংলা গদ্যের শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হিসাবেই স্মরণীয় হয়ে থাকবে, তবু তাঁব শৈশব-যৌবনের কাহিনী হিসাবেও পাঠক এই গ্রন্থই বাববাব পডবে তাতে সন্দেহ নেই। জীবনস্মৃতিব আদ্যোপান্ত যে একটি প্রসন্ন সাহিত্যবসধারা প্রবাহিত তাবই একপ্রান্ত দিয়ে, যথাসাধ্য সম্পূর্ণভাবে, দূব দূব ক্ষেত্রে বিক্ষিপ্ত উপকবণ সংগ্রহ ক'বে, ববীন্দ্রজীবনকাহিনীর ইতিহাসধাবাও রচনা ক'বে দিয়ে সম্পাদক ববীন্দ্র-সাহিত্য ও ববীন্দ্র-জীবনীব পাঠকদের বিশেষ উপকাব সাধন কবেছেন; অনেকক্ষেত্রেই এ-সকল উপকবণ ববীন্দ্রনাথের বচনা থেকেই সমাহৃত; যেমন জীবনস্মৃতির পূর্বতন দুটি পাণ্ডুলিপি, বহুবিক্ষিপ্ত ও অপবিজ্ঞাত তাঁর অনেক চিঠিপত্র ও প্রবন্ধ। আমাদের একটি শুধু বক্তব্য আছে—পাদটীকাগুলি গ্রন্থশেষে বসানো সম্ভব কিনা বিবেচনা করে দেখা যেতে পারে। যদিও তাতে তথ্যানুসন্ধিৎসুদেব খুবই অসুবিধা হবে, তবে তথাকথিত নিছক সাহিত্যরসপিপাসুদের আব কোন অভিযোগেব কাবণ থাকবে না।

পরিশেষে বিশ্বভাবতীর কর্তৃপক্ষের প্রতি আমাদের একটি নিবেদন আছে। গ্রন্থসম্পাদকেব কৃতি স্বীকৃতিতে তাঁরা এতটা দাক্ষিণ্যবিরহিত হলেন কেন? যদিও পাঠকসাধরণেব উপরেই সম্পাদনাব গুণাগুণ বিচারেব ভাব থাকা উচিত, এবং নিজেদেব কর্মীব প্রশস্তি আত্মঘোষণারই নামান্তব, তবু সম্পাদকের নামোল্লেখে আবেকটু অকৃপণ হলে শোভন হত মনে হয়। রবীন্দ্র-সাহিত্যেব ঐতিহাসিক দিক সম্বন্ধে এখনো বহু করণীয় রয়েছে; অপ্রকাশিত বা বহুবিক্ষিপ্ত রচনা সংগ্রহ, বহু সংস্কৃত পুনর্লিখিত অগণিত বচনার পাঠান্তর সংকলন; ভ্রমজর্জবিত মুদ্রণ থেকে পাঠোদ্ধার—এবং এক্ষেত্রে নির্ভরযোগ্য কর্মীর প্রাচুর্য নেই। এ অবস্থায় যোগ্যতার স্বীকৃতিতে কুণ্ঠা প্রকাশ কবলে এই দুরূহ ব্রত উদ্‌যাপনেব আশা সামান্যই কবা যায়।

হিরণকুমার সান্যাল

ইয়োরোপে জনজাগরণ

The New Fascist Order—by Prof. E. Varga
Yugoslav Partisans—
Spotlight on Yugoslavia } edited by M. Kumaramangalam
Finland Unmasked—by Otto Kuusinen
Polish Conspiracy Exposed—edited by N. K. Krishnan
France Fights for Freedom
A New Germany in Birth } edited by M. Kumaramangalam
} People's Publishing House

সমসাময়িক ঘটনার আলোড়নের মধ্যে দ্বিতীয় মহাযুদ্ধের ঠিক স্বরূপটি সর্ব্বদা আমাদের চোখে পড়ে না, ইউরোপে জনগণের অভ্যুত্থান সম্বন্ধে আমরা তাই সজাগ নই। অথচ ভবিষ্যৎ ইতিহাস-লেখকের কাছে জনসাধারণের এই জাগরণ নিশ্চয়ই বিস্ময়ের বস্তু হয়ে থাকবে। যুদ্ধের প্রথম দিকে যখন দেশের পর দেশ হিট্‌লারের পদানত হ'ল, তখন বিজিত জাতিদের জার্ম্মানির বিরুদ্ধে বিদ্রোহ অসম্ভব মনে হ'ত, নাৎসি সামরিক শক্তি অপরাজেয় বলেই লোকে মেনে নিয়েছিল। তারপর এল সোভিয়েট ইউনিয়ানের অতুলনীয় প্রতিরোধ, তখন ক্রমে ক্রমে সমস্ত অধিকৃত ইউরোপে মুক্তির যে-প্রবল আগ্রহ মাথা তুলতে লাগল ইতিহাসে তার তুলনা পাওয়া সহজ নয়।

অত্যাচারী দুর্দ্ধর্ষ বিদেশী সৈন্যবলের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকের এই অভিযান সম্বন্ধে বহুদিন পর্য্যন্ত আমাদের বিশেষ কিছু জানা ছিল না। সাংবাদিক মহল ও যুদ্ধের সরকারী আলোচকেরা এই ব্যাপারে অস্পষ্ট ও অনেক সময় ভ্রান্ত মত প্রচার করতেন। কিন্তু গত কয়েক মাসের মধ্যে ইউরোপের অনেক খবর ধীরে ধীরে এদেশে ছড়িয়ে পড়েছে, তার ফলে আমরা সেদেশে একটা বিশাল পরিবর্ত্তনের সন্ধান পাচ্ছি, তার একটা সমগ্র ছবি আমাদের মনে এখন রূপ নিচ্ছে। জনজাগরণের সম্পূর্ণ চিত্রটুকু ফুটিয়ে তুলবার কাজে People's Publishing House-এর দান অসামান্য। তথ্যবহুল ও সর্ব্বাঙ্গসুন্দর এই সাতখানি বই যে-কোনও প্রকাশকের গৌরবের উপলক্ষ্য হ'তে পারত। সাম্প্রতিক ইতিহাসের ছাত্র মাত্রেই এর জন্য কৃতজ্ঞ থাকবেন, পাঠকসমাজে পুস্তিকাগুলির বহুল প্রচার আমরা কামনা করি।

হিট্‌লারী প্রভুত্ব ও শোষণের বিরুদ্ধে ইয়োরোপ-ব্যাপী প্রতিরোধ আন্দোলনের মধ্যে কয়েকটি কথা স্পষ্ট হয়ে ওঠে। প্রথমতঃ, নাৎসিরা যে-নববিধান প্রবর্ত্তন

কবেছিল তার মোহ সাধারণ লোককে ভুলিয়ে বাখতে পাবে নি, পাবলে অসংখ্য নবনারী এভাবে শান্তি, আবাম ও প্রাণ পর্য্যন্ত বিসর্জ্জন দিতে উদ্যত হ'ত না। আমাদেব মধ্যে অনেকেই ফাশিজ্‌ম্‌-এব নগ্নরূপটুকু দেখেও দেখি না, শিক্ষিত সমাজে হিট্‌লাবেব স্তাবকেবও অভাব নেই, ফাশিজ্‌ম্‌ যে শুধু জার্মানিব একটা ঘবোয়া ব্যবস্থা নয়, পার্শ্ববর্ত্তী সকলকে পদদলিত না কবে' যে তাব চলতে পাবে না, এই সিদ্ধান্ত আমবা এড়িয়ে চলবাব চেষ্টা কবি। নাৎসি-শাসন সম্বন্ধে ভুল ধাবণা বা উদাসীন ভাব ইয়োবোপেব সাধাবণ লোকেব পক্ষে সম্ভব হয় নি, পুস্তিকাগুলি তাব জ্বলন্ত প্রমাণ।

দ্বিতীয় কথা এই যে ইয়োবোপে প্রতিবোধ ও বিপ্লবের সূচনা নিতান্তই জনসাধারণের নিজস্ব জিনিষ, বাইবেব প্রবোচনার ফল অথবা মুষ্টিমেয় লোকেব দুঃসাহসিক অভিযান নয়। বিশাল সামবিক শক্তিব বিরুদ্ধে এব অস্তিত্ব বজায় বাখা এবং সাফল্য অর্জ্জন করা অন্যথা সম্ভব হ'ত না। নেপোলিয়ানের বিরুদ্ধে বিদ্রোহেব সঙ্গে এব তুলনা ঐতিহাসিকের মনে আসতে পাবে, কিন্তু দুয়েব মধ্যে প্রভেদ বিস্তব। তখনকাব দিনে নেপোলিয়ানের শাসনেব খানিকটা অন্ততঃ প্রগতিশীল রূপ ছিল, নানাদেশে প্রাচীন ফিউডাল ব্যবস্থাব অবসান নেপোলিয়ান আনতে পেবেছিলেন, সেদিনকার বিদ্রোহেব মধ্যে নানাদিকে তাই প্রতিবিপ্লবেব ছায়া দেখতে পাই। কিন্তু হিট্‌লাবী নববিধানেব নূতনত্ব কোনও সামাজিক প্রগতিব মধ্যে নয়, তাব মধ্যে আছে শুধু সঙ্ঘবদ্ধ জার্মান ফিনান্স্‌-ক্যাপিটালেব ইয়োবোপ-শোষণেব আয়োজন। আজকের দিনেব অভ্যুত্থানেব আন্তরিক সাদৃশ্য পাওয়া যায় কয়েক বৎসব আগেকার পপুলাব ফ্রন্ট্‌ আন্দোলনের মধ্যে। তখন ফ্রান্স অথবা স্পেনে নূতন সম্ভাবনাব যে-উন্মাদনা দেখা গিয়েছিল, আদর্শবাদেব সেই স্পন্দন আজ আবাব ইয়োবোপের অন্তবে সাড়া তুলেছে। মাঝে কিছুদিন দেশে দেশে ভেদ সৃষ্টিব ফলে ও তোষণ-নীতিব প্রভাবে উৎসাহ ম্লান হয়ে গিয়েছিল, হতাশ নিস্তেজতা লোককে আচ্ছন্ন কবে' বেখেছিল। হিট্‌লারী শাসনের আগুনে পুড়ে আজ ইয়োবোপের নবজন্ম দেখা দিয়েছে, আলোচ্য পুস্তিকাগুলি তারই বিশদ বিববণ।

তৃতীয়তঃ, প্রতিরোধ-আন্দোলনেব দুইটা দিকই সমানভাবে লক্ষ্য কবা উচিত। অনেকে মনে কবেন যে ইয়োরোপে বিদ্রোহ শুধু সাম্যবাদীদেব কারসাজি, রাশিয়াব স্বার্থসিদ্ধি হ'ল তাব উদ্দেশ্য। ফ্রান্স, যুগোশ্লাভিয়া, পোল্যাণ্ড্‌ প্রভৃতির ভিতবে

আজ যা ঘটছে তাব সকল তথ্য অনুসন্ধান কবলে বোঝা যায যে নাৎসিদেব বিবোধী প্রতিরোধ এত প্রবল ও ব্যাপক যে কোনও দলবিশেষেব বিশিষ্ট অভিসন্ধি দিয়ে তার ব্যাখা চলে না। অপবদিকে অন্যদেব মত এই যে ইয়োরোপে আজকেব অভিযান শুধু জাতীয় বিদ্রোহ মাত্র, এব মধ্যে আসল প্রগতি অথবা সমাজতন্ত্রেব অভিমুখে অগ্রগমনেব চিহ্নমাত্র নেই, আছে শুধু বিদেশী বিজেতাব প্রতি বিদ্বেষ। সবিশেষ আলোচনা কবলে দেখা যায় যে জনসাধারণের অভ্যুত্থান শুধু প্রাকসামবিক অবস্থায় ফিবে যাবাব প্রয়াস নয়, তাব মধ্যে চাষী-মজুরেব উজ্জলতর জীবন গডবাব আকাঙ্ক্ষা অত্যন্ত প্রবল, প্রত্যেকক্ষেত্রেই সাম্যবাদী নেতৃত্ব ও পথপ্রদর্শনেব সাক্ষ্য পাওয়া যায়, প্রগতি ও বিপ্লবের ছোঁযাচ প্রত্যেক জাতিব আন্দোলনের মধ্যে ফুটে বেবিযেছে। বিপবীত উভয় ভুলকে এড়াবার কাজে পুস্তিকাগুলি পাঠকদেব সহায় হবে।

চতুর্থ কথা ইয়োরোপেব ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে। আমাদের দেশে বদ্ধমূল ধারণা এই যে, জার্মানিব পবাজয় হলেও ইয়োবোপ শুধু আগেব অবস্থায ফিবে যেতে বাধ্য, ফাশিষ্ট শাসনেব বদলে থাকবে সাম্রাজ্যবাদী কর্ত্তৃত্ব। হয়ত বা পূর্ব্ব-ইয়োবোপ বাশিয়াব দখলে আসবে, কিন্তু সোভিয়েট শক্তিও নাকি সাম্রাজ্যবাদী হয়ে পডেছে, কোনও কোনও সমাজবাদী পণ্ডিত এদেশে ফাঁকিটুকু ধবে ফেলেছেন বলে' গর্ব্ব অনুভব কবেন। অন্যেরা ভাবেন অ্যাংলো-আমেবিকার শাসকদেব প্রবল প্রতাপ যুদ্ধেব পব আব আটকায় কে। কিন্তু জনসাধাবণের জাগবণ ও সকল বিদ্রোহেব মধ্যে যে-বিবাট সম্ভাবনা রয়েছে, যুদ্ধেব মধ্যে প্রজাশক্তির যে-প্রকাশ সম্ভব হচ্ছে, তাকে অস্বীকাব কবব কোন যুক্তিতে? ফাশিষ্ট-বিবোধী শিবিবেব মধ্যে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়াব দ্বন্দ্ব নিশ্চয় আছে, কিন্তু জনজাগবণেব বিপ্লবী সম্ভাবনা ও সুযোগকে অস্বীকার কবা বিশ্লেষণেব পবিচয় নয, সেই-অস্বীকাব প্রতিক্রিয়াবই বাহন। আজকেব ইতিহাস যে-সম্ভাবনাব দ্বাব খুলেছে, তাকে অগ্রাহ্য কবলে প্রগতিকেই বাধা দেওয়া হবে। এ-কথা মন-ভোলানো তর্ক নয়, চোখেব সামনে আমবা দেখতে পাচ্ছি—দিকে দিকে নূতনেব আবির্ভাব সম্ভব হচ্ছে। যুদ্ধেব সূচনাব আগেই ইযোরোপে নানা দেশে উদাব নীতি ও গণতন্ত্রের অবসান হয়েছিল, আজ প্রতিবোধ আন্দোলনে সর্ব্বত্র দাবী উঠছে সাধারণ লোকেব বাষ্ট্রিক ও আর্থিক অধিকাবেব। পলাতক গভর্ণমেণ্টগুলি পশ্চিমেব মিত্রশক্তি-দেব ছায়ায বসে দাবী কবছিল যুদ্ধান্তে তাদেব সর্ব্বাঙ্গীন অধিকাবেব পুনর্প্রতিষ্ঠা।

কিন্তু নাৎসিদেব বিরুদ্ধে প্রতিবোধ অভিযানের অভিজ্ঞতাব মধ্যে প্রজাসাধাবণ পাচ্ছে নিজেদেব শক্তিতে আস্থা ও দাবী করবাব সাহস। Legitimism আজ তাই দিকে দিকে ভেঙ্গে পড়ছে, তাই পোল্‌বা লণ্ডনস্থিত সবকারকে অবহেলা কবে, মুক্তি-সমিতি গড়েছে, যুগোশ্লাভ বাজা পিটার শেষ পর্য্যন্ত মিহাইলোভিচ্‌কে ত্যাগ কবে' মার্শাল টিটো ও তাব জাতীয় পরিষদেব শরণাপন্ন হচ্ছেন, গ্রীসেব বাজা ও মন্ত্রিবা গেরিলাবাহিনীব নেতাদেব সংযোগ খুঁজছেন, ইতালীব বাজা সিংহাসন ত্যাগ কবতে বাধ্য হলেন এবং বাদোলিও হলেন বিতাড়িত, ফবাসী স্বাধীনতা-সংসদ সকল উপেক্ষাব বাধা কাটিয়ে স্বদেশে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে। সম্ভাবনা ও সাফল্যেব সম্পূর্ণ ছবি আমাদেব দেশের পাঠকেবা পাবেন আলোচ্য পুস্তিকাকয়টিব মধ্যে।

ফাশিষ্টদেব নিজ বাজ্যেব মধ্যেও জনজাগবণ আবম্ভ হয়েছে। অর্থনীতিবিদ অধ্যাপক ভার্গা ফাশিজ্‌ম্‌-এর যে-প্রকৃত রূপ খুলে ধবেছেন, অনেক জার্মান নিজেদের তিক্ত অভিজ্ঞতায তাব যাথার্থ্য অনুভব কবতে পাবছে বলেই জার্মানিতে শাসকদেব বিরুদ্ধে অভিযানের সূত্রপাত হচ্ছে। জার্মানিতে আবাব বিপ্লব আসতে পাবে, এলে পবেই জার্মান জাতিকে ধ্বংস কববাব ভ্যান্‌সিটাট্‌-নীতিব পরাজয় ঘটতে বাধ্য। কুসিনেনেব লেখায় দেখতে পাই, ফিন্‌ল্যাণ্ডেব শাসকদেব আসল রূপেব প্রামাণিক বর্ণনা, তথাকথিত "স্বাধীন" রাষ্ট্র ও "গণতন্ত্রেব" আসল অভিব্যক্তি, আব তাব পিছনে সাধারণ লোকেব সুপ্তি ভঙ্গেব নিদর্শন। সামবিক পরাজয়েব সঙ্গে সঙ্গে ফাশিষ্ট দেশগুলির প্রজাশক্তিব প্রকৃত অভ্যুত্থান ঘটলে ইয়োবোপেব নবযুগ সুপ্রতিষ্ঠিত হতে পারবে ;—সে-আশা যে একেবাবেই অলীক নয, পুস্তিকাগুলিব মধ্যে তাব পবিচয় বয়েছে বলা চলে। ভবিষ্যৎ ঠিক কিভাবে গড়ে উঠবে জোব কবে' সর্ব্বদা সেকথা বলা অনুচিত বটে, কিন্তু ইয়োবোপ আজ মুক্তি ও প্রগতিব পথে এখনও পর্য্যন্ত এগিযে চলেছে—এই কথাটুকু আমাদেব জানাব প্রয়োজন নিশ্চয়ই আছে। বই সাতটিব সার্থকতা এইখানেই, এই জন্যেই প্রকাশকেবা আমাদেব কৃতজ্ঞতাভাজন।

সুশোভন সরকার

বিরহবিলাস

মেঘদূত—শ্রীবাজশেখব বসু সম্পাদিত। বিশ্বভাবতী। মূল্য দেড টাকা।

সংস্কৃত কাব্য সমূহেব মধ্যে, কিংবা একমাত্র ভগবদ্‌গীতা বাদে সমস্ত সংস্কৃত সাহিত্যেব মধ্যেই, কালিদাসেব মেঘদূত সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয়, একথা বললে অত্যুক্তি হয়

না। এই কাব্যখানি ভাবতীয় মনকে এমনভাবে আকর্ষণ করেছিল যে, পরবর্তীকালে বহু কবি কালিদাসেব অনুসবণ কবে পবনদূত, হংসদূত, মনোদূত, পদাঙ্কদূত প্রভৃতি অন্তত পঞ্চাশখানা দূতকাব্য বচনা করেছেন। খৃষ্টীয় অষ্টম শতাব্দীতে জৈন কবি জিনসেন 'পার্শ্বাভ্যুদয়' নামে একখানি কাব্য লেখেন। কাব্যখানি এমনভাবে বচিত যে, এব প্রত্যেকটি শ্লোকে মেঘদূতেব একটি বা দুইটি পদ অবিকলভাবে কিন্তু অন্য অর্থ বোঝায় এমনভাবে গৃহীত হয়েছে। ফলে পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্যটিতে সমগ্র মেঘদূতখানিই অতি চমৎকাবভাবে প্রচ্ছন্ন বয়েছে। প্রসঙ্গক্রমে বলা যায়, পার্শ্বাভ্যুদয়ে ধৃত জিনসেনেব পাঠই মেঘদূতেব সর্বাপেক্ষা প্রাচীন ও নির্ভবযোগ্য পাঠ। যাহোক, কালিদাসেব মৃত্যুব তিন শতাব্দীর মধ্যেই মেঘদূত ভাবতবর্ষে কিরূপ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল পার্শ্বাভ্যুদয় কাব্যখানি তাব একটি উৎকৃষ্ট প্রমাণ। তা-ছাড়া, অন্তত পঞ্চাশ ষাট জন টীকাকাব মেঘদূতেব টীকা ও ব্যাখ্যা লিখেছেন। তাতেও বোঝা যায়, ভাবতবর্ষেব ইতিহাসেব কোনো যুগেই এই কাব্যখানিব পাঠকেব সংখ্যা কম ছিল না। ভাবতবর্ষেব বাইবেও মেঘদূত যথেষ্ট সমাদব লাভ কবেছে। প্রাচীন কালেই দেখি, একদিকে সিংহলী ভাষায় অপরদিকে তিব্বতী ভাষায় মেঘদূতের অনুবাদ হয়েছে। আধুনিককালেও অনেক বৈদেশিক ভাষায় এব অনুবাদ হয়েছে এবং তথাকাব পণ্ডিতবাও এক বাক্যে এই গ্রন্থেব কাব্যোৎকর্ষেব প্রশংসা কবেছেন। ভাবতবর্ষেব প্রাদেশিক ভাষাগুলিতেও মেঘদূতেব বহু অনুবাদ ও ব্যাখ্যাবিশ্লেষণ হয়েছে এবং হচ্ছে। একমাত্র বাংলা ভাষায় মেঘদূতেব যেসব অনুবাদ ও ব্যাখ্যা হয়েছে তাব সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়।

কিন্তু তথাপি বাজশেখর বাবুব বইখানিব একটি বিশেষ সার্থকতা আছে। বাংলা দেশে মেঘদূত প্রকাশেব উদ্দেশ্য প্রধানত দ্বিবিধ। প্রথমত, যাঁবা সংস্কৃত সাহিত্যশিক্ষার্থী তাঁদেব প্রয়োজন সাধন। এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত পুস্তকগুলিতে কাব্যখানিব মূল পাঠের সঙ্গে মল্লিনাথেব টীকা এবং সংস্কৃতেব ব্যাকবণ, অলংকাব, ছন্দ ইত্যাদির বিচাব বিশ্লেষণ প্রভৃতি থাকে। সঙ্গে সঙ্গে গদ্য বঙ্গানুবাদও থাকে। দ্বিতীয়ত, যাঁরা মেঘদূতেব মূল সংস্কৃত অনুসরণ কবতে অক্ষম বা অনিচ্ছুক তাঁদেব প্রয়োজনসাধন। এই উদ্দেশ্যে প্রকাশিত পুস্তকগুলিতে মেঘদূতেব পদ্যানুবাদ থাকে, কখনও কখনও মূল সংস্কৃত এবং কিছু কিছু টীকাও থাকে। এই দুই শ্রেণীর পাঠকেব জন্য কয়েকখানি বেশ ভালো বই বাজাবে প্রচলিত আছে। কিন্তু আবেক শ্রেণীব পাঠক আছেন যাঁবা সংস্কৃত সাহিত্য শিক্ষার্থীব ন্যায় ব্যাকবণ, অলংকাব প্রভৃতি জটিলতাব মধ্যে প্রবেশ কবতে চান

না অথচ কালিদাসেব মূল মেঘদূতেব বস পেতে ইচ্ছুক। আমাদেব স্কুল কলেজে যতুখানি সংস্কৃত শেখানো হয় তাতে অনেক ক্ষেত্রেই স্বাধীন ভাবে সংস্কৃত সাহিত্যচর্চাব যোগ্যতা হয না। তা ছাড়া, এমনও দেখা যায় কালক্রমে সংস্কৃত ভাষার জ্ঞান যখন কমতে থাকে অনেকেব পক্ষে তখনই সংস্কৃত সাহিত্য সম্বন্ধে ঔৎসুক্য এবং আকর্ষণ বাড়ে। এ বকম শিক্ষিত সাহিত্যবসিক অথচ সংস্কৃতভাষায় অপটু পাঠকেব সংখ্যা নিতান্ত কম নয় এবং পাঠকসমাজে তাদেব প্রতিষ্ঠা বা মর্যাদাও যথেষ্টই আছে। অথচ এঁদের প্রয়োজন মেটাবার উপযোগী একখানি বইও বোধ করি বাজারে প্রচলিত নেই। এই উপেক্ষিত পাঠকদেব সহাযতা কবাই মেঘদূত কাব্যেব বর্তমান সংস্কবণেব উদ্দেশ্য। এদিক থেকে বিবেচনা কবলে স্বীকাব কবতেই হবে যে, বাজশেখরবাবু বাঙালি পাঠকসমাজেব একটা মস্ত অভাব দূর কবলেন। শিক্ষিত বাঙালী সমাজেব একটা বৃহৎ অংশেব পক্ষে মূল মেঘদূতেব সঙ্গে প্রত্যক্ষ পবিচয়েব পথ সুগম করে দেওয়াতে সংস্কৃত ও বাংলা সাহিত্যেব মধ্যে সংযোগ-প্রতিষ্ঠাও হলো এবং এই জনপ্রিয় কাব্যখানির পক্ষে অধিকতর জনপ্রিয়তা অর্জনেব ব্যবস্থাও হলো।

এই পুস্তকে প্রথমে সংস্কৃত মূল, মূলানুযায়ী সবল গদ্যানুবাদ, তৎপরে অন্বয় মুখে ব্যাখ্যা এবং সর্বশেষে কিছু টীকা দেওয়া হয়েছে। পুস্তকখানি বাঙালি পাঠকদেব জন্যই লিখিত। সুতবাং সংস্কৃত মূল অংশটিও দেবনাগবীব পবিবর্তে বাংলা লিপিতে মুদ্রণ করা খুবই সমীচীন হয়েছে। মূল সংস্কৃত মেঘদূতেব সঙ্গে পবিচয় ঘটানোই যখন এই পুস্তকেব উদ্দেশ্য তখন অনভ্যস্ত লিপির প্রতিবন্ধকতা না থাকাতে অনেকেব পক্ষে মূলেব অনুসবণ কবা সহজ হবে। মূলেব পাঠভেদ সম্বন্ধে প্রয়োজনীয় মন্তব্যাদিও যথাযথরূপে কবা হয়েছে। জিনসেনেব পার্শ্বাভ্যুদয়ে ধৃত কয়েকটি শ্লোক গৃহীত হওয়াতে পুস্তকখানি পূর্ণতালাভ কবেছে।

পদ্যানুবাদে ছন্দ ও মিল বক্ষাব দায়িত্ব থাকায় এ বকম অনুবাদকে যথোচিতরূপে মূলানুসাবী কবা সম্ভব হয় না। একমাত্র গদ্যেই তা সম্ভব। রাজশেখব বাবুব অনুবাদে মূলেব ভাষা ও ভাব বাংলা গদ্যে যতটা অব্যাহত বাখা যায় তাবই চেষ্টা কবা হয়েছে। কিন্তু অনুবাদ থেকেই মূল সংস্কৃতেব অনুসবণ কবা সম্ভব নয়। তাই তাব পবেই দেওয়া হয়েছে অন্বয় মুখী ব্যাখ্যা। অন্বয়কালে সর্বত্রই সংস্কৃত শব্দেব সন্ধি ভেঙ্গে দেওয়া হয়েছে, তাতে অনেকেব পক্ষেই সুবিধা হবে। সর্বশেষে টীকা অংশে দুরূহ শব্দেব বাংলা প্রতিশব্দ ও অন্যান্য মন্তব্য দেওয়া হয়েছে।

ভূমিকায় গ্রন্থকার যে উদ্দেশ্যের কথা উল্লেখ করেছেন এই গ্রন্থের দ্বারা সে উদ্দেশ্য বহুলাংশে সিদ্ধ হবে, একথা অসংশয়েই বলা যায়। তথাপি কয়েকটি অপূর্ণতার কথা আমাদের মনে হয়েছে। টীকা অংশটি আমাদের কাছে অনেক স্থলেই অসম্পূর্ণ বলে মনে হয়েছে। অনেক অপরিচিত সংস্কৃত শব্দের বাংলা প্রতিশব্দ দেওয়া হয় নি। কবিপ্রসিদ্ধি ও প্রসঙ্গ কথাগুলি সর্বত্র ব্যাখ্যাত হয় নি। যেমন, একত্রিশ সংখ্যক শ্লোকে যে 'উদয়ন কথা'র উল্লেখ আছে সে কথাটি কি তা না দেওয়াতে অনেকের পক্ষেই এই শ্লোকটির মাধুর্য সম্পূর্ণ উপভোগ করা সম্ভব হবে না। 'উদয়ন কথা'র সঙ্গে অবন্তীর সম্বন্ধ কি তা বুঝিয়ে দিলে ভালো হতো। ভৌগোলিক নামগুলির পরিচয়ও সর্বত্র দেওয়া হয় নি। যেমন, উক্ত অবন্তী দেশটির বর্তমান নাম কি তা দেওয়া থাকলেই অনেকের পক্ষে সুবিধা হতো। বস্তুত মেঘদূতের যে কোনো সংস্করণে একটি মানচিত্র থাকা বাঞ্ছনীয়। ওই মানচিত্রে যদি প্রাচীন নামগুলির সঙ্গে সঙ্গে আধুনিক নাম দেওয়া থাকে তাহলে মেঘদূত অনুসরণ করা এবং এই কাব্যের একটি বিশেষ রস উপভোগ করা অনেকাংশে সহজসাধ্য হয়। এই সংস্করণের প্রধান উদ্দেশ্য হলো মূল সংস্কৃতের সঙ্গে পাঠকের পরিচয় সাধন। কিন্তু ছন্দ রক্ষা করে মূল শ্লোকগুলি কি ভাবে পড়তে হবে তার নির্দেশ কোথাও নেই। যদি থাকত তাহলে অনেক পাঠকের সহায়তা হতো। গ্রন্থের ভূমিকায় রাজশেখরবাবু মেঘদূত কাব্যের রসবৈশিষ্ট্যের একটু আভাসমাত্র দিয়েই ক্ষান্ত হয়েছেন। তাতে পাঠকের অতৃপ্তি বৃদ্ধিরই সহায়তা হয়েছে। রাজশেখরবাবু যদি রসের বিচারে আরও অগ্রসর হতেন তাহলে শুধু যে গ্রন্থের পূর্ণতা ও পাঠকের সহায়তা হতো তা নয়, তার বিচারে যে বিশিষ্টতা আশা করা যায় তার মূল্যও হয়তো কম হতো না।

যাহোক, বাংলা দেশের বহুসংখ্যক সানুবাদ মেঘদূতের মধ্যে এ গ্রন্থখানিতে যে নূতন পদ্ধতি অবলম্বিত হয়েছে তার জন্যে রাজশেখরবাবু আমাদের শিক্ষিতসমাজের একটি বৃহৎ অংশের কৃতজ্ঞতাভাজন হয়েছেন, এ বিষয়ে সন্দেহ নেই। অপ্রত্যাশিত বিস্ময় সৃষ্টি করা রাজশেখর বাবুর একটি বৈশিষ্ট্য। তার প্রমাণ তার গল্পগ্রন্থ, তার চলন্তিকা অভিধান। মেঘদূতের এই সংস্করণটিতেও তাঁর ওই বৈশিষ্ট্যের ধারা অব্যাহত আছে, একথা সকলেই স্বীকার করবেন।

প্রবোধচন্দ্র সেন

প্রত্রিকা-প্রসঙ্গ

বিশ্বভারতী পত্রিকা ঃ—সম্পাদক বথীন্দ্রনাথ ঠাকুর। বৈশাখ আষাঢ় ১৩৫১। মূল্য প্রতি সংখ্যা এক টাকা।

বিশ্বভারতী পত্রিকাতে বিশ্বেব লেশমাত্র পবিচয় নাই, ভাবতবর্ষেব পবিচয় যা আছে তাও ব্যাপক নয়। ববীন্দ্রনাথেব নিজেব হাতে আঁকা ছবি ও তাঁব প্রতিকৃতি, তাঁব চিঠি, তাঁব পাণ্ডুলিপি থেকে সংগৃহীত টুকবো-টাকবা অপ্রকাশিত বচনা—এগুলি অবশ্যই মূল্যবান। আবো মূল্যবান ববীন্দ্রনাথেব লেখা বা রবীন্দ্রনাথকে লেখা চিঠি। কিন্তু শুধু এই জাতীয উপকবণ কোনো সমসাময়িক পত্রিকাকে প্রথম শ্রেণীব মর্যাদা দিতে পাবে না। এ ছাডা আবো কতকগুলি বচনা এই সংখ্যায় আছে ; শ্রীযুক্ত দেবব্রত বর্মণেব "দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুব ও সাধাবণ জ্ঞানোপার্জিকা সভা", শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমাব গঙ্গোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলেব মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ সংক্রান্ত আলোচনায পাওয়া যায় শুধু বাংলা দেশেব বিগত যুগেব ইতিহাসেব কয়েকটি খণ্ড-তথ্যেব সমাবেশ। শ্রীযুক্ত অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুবেব 'মা গঙ্গা' ও শ্রীযুক্ত কেদাবনাথ বন্দ্যোপাধ্যাযেব 'অপৰূপ কথা' গল্পটিও বিগত যুগেব আবহাওয়ায় বেষ্টিত। শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসুব "শিল্প সৃষ্টিব মূল কথা" মাত্র কয়েকটি সূত্রেব সমাবেশ—প্রবন্ধ নয। প্রবন্ধ আছে তিনটি, কিন্তু দুঃখেব বিষয় তিনটিই ববীন্দ্রনাথ সম্পর্কিত, তাই সুলিখিত হ'লেও এই প্রবন্ধগুলিব সমাবেশে পত্রিকাটিব বৈষযিক সমৃদ্ধিসাধন বিন্দুমাত্র হয় নাই। পাঠক হিসাবে আমাদেব প্রধান বক্তব্য এই যে, এই সংখ্যার কোনো বচনাই একেবাবে উৎকর্ষহীন নয় কিন্তু মোট পত্রিকাটি বৈচিত্র্যহীন, এবং সমসাময়িক বিশ্ব দূরের কথা ভারতবর্ষেরও চিন্তা ও কর্মস্রোত হ'তে একেবাবে বিচ্ছিন্ন। কিন্তু এই বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও পত্রিকাটিব দুটি বৈশিষ্ট্য আছে। একটি বহিবঙ্গেব উল্লেখযোগ্য সৌষ্ঠব, আব একটি সংকীর্ণ বৈষয়িক পবিধিব মধ্যে প্রকাশিত প্রবন্ধগুলিব উৎকর্ষ। ববীন্দ্রনাথেব পাণ্ডুলিপি থেকে আহৃত এতাবৎ অপ্রকাশিত বচনাগুলিব কথা বাদ দিয়ে বলছি—সেগুলি অমূল্য।

বর্তমান সংখ্যায় পত্রিকাটিব সব চাইতে উল্লেখযোগ্য অঙ্গ 'চিঠিপত্র'—ববীন্দ্রনাথকে লিখিত চন্দ্রনাথ বসুব দশটি চিঠি। চন্দ্রনাথবাবুব নাম এখন বিস্মৃতপ্রায়, কিন্তু এক সময়ে বাংলা দেশে তাঁব যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল শুধু সাহিত্যিক হিসাবে নয়,

চিন্তানায়ক হিসাবেও। বয়সে তিনি ছিলেন রবীন্দ্রনাথের অনেক বড—তাঁর জন্ম হয় ইং ১৮৪৪ সালে অর্থাৎ বঙ্কিমের ছয় বৎসর পরে। বিশ্ববিদ্যালয়ের কৃতী ছাত্র চন্দ্রনাথ বি-এ পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করেন ও তার পর এম-এ, বি-এল ডিগ্রি অর্জন করে বাংলাদেশে একাধিক স্থানে ও জয়পুরে অধ্যাপনার পর বেঙ্গল লাইব্রেরীর অধ্যক্ষের পদে অধিষ্ঠিত হন। তখনকার শিক্ষিতদের এই পদটি ছিল বিশেষ কাম্য। বাঙলা সাহিত্য ও সমাজ বিষয়ক অনেকগুলি বই তিনি লেখেন, কিন্তু বিশেষ একটি বইর জন্য ছাত্রমহলে তিনি সুপরিচিত ছিলেন। এই বইটির নাম 'সংযম শিক্ষা'। এখনকার ইস্কুলের ছাত্রেরা বোধ হয় এর নামও শোনে নি কিন্তু আমাদের ছেলেবেলায এই বইটি আমাদের যথেষ্ট কৌতুক উৎপাদন করত সংযম সাধনার দু'একটি আদর্শ প্রণালীর বর্ণনার ফলে। যথা—আহারান্তে ক্ষীর মুখে করে কলতলা পর্যন্ত গিয়ে তা কুলকুচি করে ফেলা (তখন বাংলা দেশে দুধ সুলভ ছিল) বা টেলিগ্রাম এলে তা তখনই না খুলে সংযত মনে ২।৪ ঘণ্টা অপেক্ষা করা। সামাজিক মতবাদেও চন্দ্রনাথবাবু ছিলেন অত্যন্ত প্রাচীনপন্থী ও তাঁর রচনাগুলি ছিল এই মতবাদের উগ্র বাহন। যুবক রবীন্দ্রনাথের উদ্যত লেখনী এই মতবাদকে ছিন্নভিন্ন করেছে যে প্রবন্ধগুলিতে তীক্ষ্ণ যুক্তি ও তীব্র ব্যঙ্গের সংমিশ্রণে, বাংলা প্রবন্ধ সাহিত্যে তা অতুলনীয়।

কিন্তু এই চিঠিগুলির মধ্যে চন্দ্রনাথবাবুর যে পরিচয় পাওয়া যায় তা একেবারে অন্যরূপ। বঙ্কিমের প্রতিভার প্রখর দীপ্তিতে যখন বাংলা দেশের সাহিত্য-জগৎ আচ্ছন্ন তখন তিনি নবীন লেখক রবীন্দ্রনাথকে অভিবাদন করছেন সাহিত্যাকাশের নূতন জ্যোতিষ্ক হিসাবে, সময়ে সময়ে অকপটভাবে বিশ্লেষণ করেছেন রবীন্দ্রনাথের অপরিণত রচনার বহু ত্রুটির ও চিঠির পর চিঠিতে বর্ষণ করেছেন তাঁর অকৃত্রিম অগাধ স্নেহ বয়ঃকনিষ্ঠ রবীন্দ্রনাথের উপর। এই চিঠিগুলির মধ্যে একদিকে নিরপেক্ষ সাহিত্য-বিচার আর একদিকে মহৎ ও গভীর মনুষ্যবৃত্তির যে সংযোগ ঘটেছে তা বিরল ও মর্মস্পর্শী।

এই মনুষ্যত্বের চরম পরিচয় পাওয়া যায় শেষ চিঠিটিতে। এটির তারিখ ২১শে বৈশাখ '১৬; চন্দ্রনাথবাবুর মৃত্যু হয় ১৩১৭ সালের আষাঢ় মাসে। রবীন্দ্রনাথের জীবনে গভীর শোকের আঘাতে অবিচলিত থাকার অনন্যসাধারণ পরিচয় বারংবার পাওয়া যায়। সম্ভবত এই রকম কোনো একটি ঘটনার পর চন্দ্রনাথবাবু লিখছেন :

"কাল তোমার সকল কথা শুনিলাম! কিছু কিছু আগে শুনিয়াছিলাম। বরাবরই তোমাতে অসাধারণত্ব দেখি। কিন্তু এখন যে রূপ অসাধারণত্ব দেখিতেছি এমন আর কখনও দেখি নাই। দীর্ঘজীবী হইয়া থাক। আমিও ঘা খাইয়া একটু শক্ত হইয়াছি। আমার জ্যেষ্ঠপুত্র এবং কনিষ্ঠপুত্র আমাকে ছাড়িয়া চলিয়া গিয়াছেন এবং সম্প্রতি আমার প্রিয়তমা কন্যা, আমার 'তুলুমা' চলিয়া গিয়াছে। আমি জমাট হইয়া গিয়াছি। ভয় ভাবনা আমার আর নাই।
—শ্রীচন্দ্রনাথ বসু।

দীর্ঘজীবী হও রবীন্দ্রনাথ
দীর্ঘজীবী হও পুরুষপ্রধান।"

চতুর্দশ বর্ষ—২য় সংখ্যা।

ভাদ্র, ১৩৫১

পরিচয়

প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য

[ফরাসী সাহিত্যের শক্তিমান লেখক অঁরি ব্যারব্যুস জীবনকে রঙীন-চশমা পরে দেখেন নি। নিজের জন্ম যে সমাজে তার আত্মাশ্রয়ী কূপমণ্ডুকতায় নিজেকে তিনি আটকান নি। তাঁর প্রথম জীবনের নিছক অকপট হৃদয়াবেগ তাই পরে বৈজ্ঞানিক বিশুদ্ধতায় উজ্জ্বল হয়েছে। তিনি কমিউনিজমকে অঙ্গীকার করেছেন এবং পূর্ণ জীবন-দর্শন হিসেবে অবিচ্ছেদ্যভাবে সর্বক্ষেত্রে—আর্টে সাহিত্যে, রাজনীতিতে, সমাজ-বিন্যাসে—তার প্রয়োগ খুঁজেছেন। এ বিষয়ে রোলাঁর সঙ্গে তাঁর খানিকটা তুলনা টানা যায়। অবশ্য বারব্যুস নব সাহিত্য সৃজনে মহৎ কোনো কীর্তি রেখে গেছেন বল্‌লে ভুল হবে। তাঁর সৃজনী প্রতিভার হয় তো ততটা প্রাবল্য ছিল না, তাঁর অতিরিক্ত আবেগ হয় তো বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে অথবা হয়তো সামাজিক পরিবর্তনকাল সার্থকতার আশু সম্ভাব্যতা নিবারণ করেছে। বারব্যুস নীচের প্রবন্ধে সাধারণভাবে এ প্রসঙ্গের আলোচনা ও কারণ নির্ণয় করতে চেয়েছেন। কিন্তু এ ক্ষেত্রে গতিবদল আর প্রথম পদক্ষেপটাই লক্ষ্য করবার। বারব্যুস এ দিক থেকে দামী। আরও দামী তাঁর ভাবনা ও মানসিক উপলব্ধি। তার পরিচয় পাওয়া যাবেই এই প্রবন্ধে (মূল থেকে অনূদিত)। ইয়োরোপীয়, বিশেষত ফরাসী সাহিত্যকে মনে রেখে তিনি এই প্রবন্ধ লিখেছিলেন বছর ১৫ আগে। বাংলা সাহিত্য সম্বন্ধে খুঁটিনাটিতে তাঁর মত খাটাতে যাওয়া ঠিক হবে না। কিন্তু কতকগুলো মূল কথা এবং প্রবণতা তিনি ধরেছেন যা এখন সব সাহিত্য সম্বন্ধেই উল্লেখ করা চলে। তাঁর মতামত সকলে মানুন আর না মানুন তা নিয়ে বিচার ও আলোচনা করবার দায়িত্ব আজ সকলের, বিশেষত তাঁর আলোচিত প্রশ্নের তাগিদ যখন আমাদের দেশেও দুর্নিবার হয়ে উঠেছে।—অনুবাদক]

প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য সম্বন্ধে অনেক কথা বলা হয়েছে। সেটা অসঙ্গত নয়। এ সাহিত্যকে পৃথক করা দরকার, কিন্তু প্রথমে দরকার একে চেনা, এর সীমা নির্দেশ করা, এর স্বরূপ সঠিক নিরূপণ করা। আমরা যে যুগে পৌঁছেছি সে হচ্ছে পরিমাপ করবার, অনুসন্ধান করবার, জঞ্জাল পরিষ্কার করে' পথ ঠিক করবার যুগ।

একেবারে গোড়া থেকেই আরম্ভ করি। প্রোলেটারিয়ান সাহিত্যের একটা সংজ্ঞা নির্ধারণের চেষ্টা করা যাক। এই সংজ্ঞার জন্যে এ যাবৎ অনেকেই হাতড়ে ফিরেছে। প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য নিঃসন্দেহে বৈপ্লবিক-সাহিত্য ; যে নতুন সমাজ সোভিয়েট-যুক্ত-রাষ্ট্রে সক্রিয়ভাবে সংগঠিত হচ্ছে এবং যা ধনিক সমাজের বুকের মধ্যে পুরনো ব্যবস্থার

প্রান্তসীমায় নেপথ্যে জন্ম নিচ্ছে সেই সমাজকে বর্ণনা করবার জন্যে, তাকে আলোকিত ও উদ্দীপিত কববাব জন্যে তাব সঙ্গে যে সাহিত্য নিজেকে খাপ খাইয়ে নেয় এ সেই সাহিত্য। আমবা বল্‌ব, প্রোলেটাবিয়ান সাহিত্য হচ্ছে যাকে বলা হ্য লোক-সাহিত্য তার বর্তমান ও জীবন্ত রূপ, যে রূপ সুনির্দিষ্ট এবং ঐতিহাসিক বিবর্তনেব দ্বাবা প্রতিষ্ঠিত ও শাণিত।

কিন্তু এই ব্যাপক বর্ণনাকে ব্যাখ্যা কবতে গেলেই একটা মুশকিল দেখা দেয়। সাধাবণত কোনো সাহিত্যিক আন্দোলন তাব পবিচয় দেয় পব পব বিভিন্ন গ্রন্থেব একটা চক্রে। এখানে এমন একটা জিনিষ সম্বন্ধে বলা হচ্ছে যা জন্ম নিচ্ছে এবং যাব কীর্তিব চেয়ে ববং পূর্ব-লক্ষণগুলোই আমবা দেখতে পাচ্ছি। যে সব সার্থক বচনাব উপব আমবা দৃষ্টি নিবদ্ধ করব তাবা এখনও সংখ্যায় খুবই অল্প এবং বয়সেও কাঁচা। এ কথা স্পষ্ট যে, যে-নতুন সমাজ থেকে এই শিল্প-আন্দোলনেব উদ্ভব সেই সমাজ অস্থি-মজ্জায় প্রতিষ্ঠিত হওয়াব পব এবং সুদীর্ঘকাল প্রতিষ্ঠিত থাকাব পব তবে এই আন্দোলন তাব স্বাভাবিক বিকাশ ও পূর্ণাঙ্গ পবিণতি লাভ কববে, তাব আগে নয়। কিন্তু তবু তাব সূচনা এবং তাব প্রথম বাস্তব আত্মপ্রকাশ দেখা যাচ্ছে, তাব সৃষ্টি পৃথিবীব বিভিন্ন জায়গায় খণ্ড-খণ্ড প্রয়াসে প্রকাশ পাচ্ছে। সে এখন সংগ্রামেব অধ্যাযে রয়েছে দুনিয়ারই মতো। উঠতি পডতি, থামা এবং আবাব চলা, লাফিযে এগিয়ে যাওয়া আবাব ঝিমিয়ে পড়া— এ নিয়ে সাবা দুনিয়া এক বৈপ্লবিক বিক্ষেপেব অবস্থায় বয়েছে।

সুতরাং যে সৃজনী তৎপবতা বর্তমানেব চেয়ে ভবিষ্যতেবই বস্তু তার সংজ্ঞা নির্ণয় করা কঠিন, বিশেষত আর্টেব ক্ষেত্রে। এই কাবণে যাবা এই বিবাট এবং এখনও পর্যন্ত অর্ধ-শৃঙ্খলিত আন্দোলনেব প্রথম ফল ও গতিকে ধরেছে, যাবা তার অল্পবিস্তর অনিশ্চিত প্রথম প্রকাশগুলো সংগ্রহ করেছে এবং এ পর্যন্ত তার যাত্রার অধ্যায়গুলো লক্ষ্য করেছে তাবা এখনও এই শক্তিব সংজ্ঞা ও শ্রেণী নির্ধাবণ করতে পাবে নি। মানসিক ক্ষেত্রেব হ'লেও এ শক্তি প্রকৃতির বন্ধন-মুক্ত কোনো শক্তির সঙ্গে কম তুলনীয় নয়। আমি স্বীকার কবছি যে, এ সম্বন্ধে যত বিতর্ক সৃষ্টি হয়েছে তার সব আমি জানি না। আমাব দিক থেকে আমি বর্তমানের কিছু চিহ্ন এবং ভবিষ্যতেব নতুন পবিপ্রেক্ষিতেব মধ্যে স্পষ্ট কিছু ভিত্তি খুঁজবাব চেষ্টা করছি।

রুশ বিপ্লব এক নতুন মানুষকে খাড়া করেছে: শ্রমবাজ্যের নাগরিক: কাবখানাব শ্রমিক, কৃষিক্ষেত্রের শ্রমিক, বুদ্ধি জগতেব শ্রমিক। এই মানুষ যোদ্ধাও বটে। এ

যোদ্ধাকে স্রোতের বিরুদ্ধে যেতে হবে, গত যুগের সংস্কারগুলোকে ধ্বংস করতে হবে এবং একটা সামাজিক সৌধ গড়ে' তুলতে হবে, যার পরিকল্পনা ও উপাদান তার হাতে। বিপ্লব তাকে সমস্ত অংশে সৃষ্টি করেছে—তার ঈপ্সায়, তার বুদ্ধিতে, তার অনুভূতিতে, তার নৈতিকতায়। প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য হ'ল এই শ্রমিক যোদ্ধার জিনিষ। এ সাহিত্যকে তার ছাঁচ, ভঙ্গী, উদ্দীপনা, উচ্ছ্বাস ও অন্তর্নিহিত দ্বন্দ্ব, আকাঙ্ক্ষা এবং পরিশেষে তার কাজকে রূপায়িত করতে হবে। কিন্তু ঐ শ্রমিক-যোদ্ধা হচ্ছে একটা সমগ্রের মধ্যের চালন-চক্র; এক জীবন্ত সত্তায় সে রয়েছে প্রাণ-কোষের মতো, এক সমষ্টির অংশের মতো; সে জীবন্ত সত্তা বা সমষ্টি হল আন্তর্জাতিক জনগণ। এই নতুন মানুষের প্রধান বিশেষত্ব হচ্ছে—ব্যক্তিকেন্দ্রিক গণ্ডীর বাইরে তার স্ফুরণ এবং তার সামাজিক ছাঁচ। এর তাৎপর্য ব্যক্তিত্বের বিলোপ ও বিনাশ নয়। পক্ষান্তরে বিপ্লবী দেশে, সমাজতান্ত্রিক দেশে ব্যক্তিত্ব আরও বিকশিত হয়, কারণ যে সব সম্ভাবনা মালিক ও দাসের দেশে শোষিতদের কাছে রুদ্ধ সেই সব সম্ভাবনা প্রত্যেকের সামনে খুলে যায়। মাক্সিম গোর্কি তাঁর বিশুদ্ধ ও ব্যাপক দৃষ্টি দিয়ে দেখে সোভিয়েট ভূমিতে ব্যক্তিত্বের এই বৃদ্ধি লক্ষ্য করেছেন। সাধারণ কর্মে প্রত্যেকের অংশ গ্রহণ, প্রত্যেকের দায়িত্ব এবং প্রত্যেকের প্রয়োজনীয়তার জন্যে এই লক্ষণ বস্তুত স্বাভাবিক। সংগঠনের দ্বারা সংহতি এবং সংহতির দ্বারা সংগঠন সৃষ্টি করে বলে' সমাজতন্ত্র প্রত্যেক লোককে সমাজের মধ্যে বিকশিত হবার সর্বাধিক উপায় করে দেয়।

যে অবস্থা ও প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে প্রোলেটারিয়ান সাহিত্যকে বিবর্তিত হতে হবে তা যদি আমরা এখন আরও ভালোভাবে বিচার করতে চাই তাহলে ছাঁচ, আধার, বহিরঙ্গ সম্বন্ধে প্রথমে বিবেচনা করতে হবে।

এই ছাঁচকে যতদূর সম্ভব নিখুঁত হতে হবে। পুরনো লাঙল ব্যবহার না করে' ট্র্যাক্টর ব্যবহার করবার প্রশ্ন এখানে। অন্য যে কোনো জিনিসের চেয়ে সাহিত্যের পক্ষে টেকনিকের দরকার বেশী। এমন কি যুগের পর যুগ যে বস্তু সঞ্চিত হয়েছে তা পর্যায়-ক্রমে ছাঁটাই করে দিলে চলে না, যেমন ঘটে থাকে ফলিত বিজ্ঞান ও শ্রমশিল্প উন্নয়নের পথে। অতীতের জিনিসকে জানা সব সময়ে দরকার এবং কখনও কখনও ব্যবহার করা অপরিহার্য। এ হচ্ছে আর্টের প্রগতির সার। টেক্‌নিক ও সংস্কৃতি বলতে এই।

ষ্টাইলের প্রশ্নে খুব বেশী গুরুত্ব আরোপ করা এবং সর্বাগ্রে ষ্টাইল সম্বন্ধে বিশেষভাবে বলা দরকার। আমি যদি এখানে "আধার" ও "উপজীব্য" এ দুয়ের মধ্যে বরাবরকার

পার্থক্যকে জায়গা দিই তবে তা এই মার্ক্সীয় অভিমতেবই উপর জোর দেবাব জন্যে যে, শবীব যেমন অঙ্গ-সংস্থানে ও দেহ-যন্ত্রের ক্রিয়ায় প্রাণের সঙ্গে সংযুক্ত তেমনি আধাবকে উপজীব্যেব সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে সংযুক্ত হতে হবে। এবং এই সঙ্গে আমি এ কথাও জানাতে চাই যে, সমসাময়িক বুর্জোয়া সাহিত্যে এ আইন মানা হয় না—মানা হয় না এই অর্থে যে, আমবা অচল নৈতিক ধ্যানধাবণা আব শুষ্ক শূন্যগর্ভ এক মতবাদেব সঙ্গে একটা মৌলিক ও নতুন 'ফর্ম'-এব অদ্ভুত পবস্পববিবোধী জোডাতালি দেখ্‌ছি।

প্রোলেটারিযান লেখকদেব পক্ষে সাহিত্যেব বর্তমান বুর্জোয়া ধ্যানধাবণা থেকে নেবাব কিছু যদি না থাকে, লেখাব টেকনিক সম্বন্ধে কিন্তু তা বলা চলে না।

আমি এব আগে অনেকবাব বলেছি ঃ সাহিত্যিক লিখন তাব বিপ্লব সাধন কবেছে ; এখন একটা নতুন প্রকবণ, প্রকাশ-পদ্ধতি হযেছে যা অসামান্য। ফবাসী সাহিত্যেব মতো অতি-সভ্য সাহিত্যে পনেব বছব আগে যে বকম লেখা হত এবং এখন যে বকম লেখা হয় তাব মধ্যে পার্থক্য এতখানি যে একটা পৃষ্ঠায় চোখ বুলিয়েই লেখাব তাবিখ যবোঝা যায়। বাস্তবিকই একটা আধুনিক ষ্টাইল হয়েছে।

লিখন-পদ্ধতির রূপান্তরটা হয়েছে এই বকম ঃ লেখাভাষা থেকে শিথিলতা, চিবাচবণ, ঘুরিয়ে কথা কওয়া (আমার বলতে লোভ হয় আগেকাব ভাষাব ভব্যতা) বাদ দেওয়া হয়েছে ; পুবনো অলঙ্কাব কাটছাঁট কবা হয়েছে ; চিন্তা বা বিষয়বস্তু সম্বন্ধে শব্দগুলো আবও সোজাসুজি প্রয়োগ কবা হয়েছে ; যে-প্রতিরূপ ষ্টাইলেব সার তাব মধ্যে বৈজ্ঞানিক পবিচ্ছন্নতা, গতিবেগ, সুপরিকল্পিত সংক্ষিপ্ততা প্রবর্তন করা হয়েছে ; ববাবব-কাব ব্যবহৃত বাক্যাংশ ভেঙে ফেলে তাকে হাঁফ ছাডবাব অবকাশ দেওয়া হয়েছে এবং আবও তেজীয়ান কবা হয়েছে। লিখন এখন আব পোষাক নয়, গায়েব চামডা।

এই বিপ্লব ঘটেছে অনেক কিছুব জন্য। সেগুলো এই ঃ জনসাধাবণেব ব্যবহৃত রুক্ষ ও উজ্জ্বল কথ্য ভাষাব প্রভাব (এ বিপ্লবেব শিবায় প্রোলেটারিয়ান বক্ত আছে), মহা-যুদ্ধেব সময়ে ট্রেঞ্চে ব্যবহৃত slang-এব সাংঘাতিক নিবাভবণতাব ধাক্কা, বুদ্ধিজীবী শ্রেণীব আচাব-ব্যবহাব ও মনস্তত্ত্বে একটা বৈজ্ঞানিক ধাঁচেব, একটা বেপবোযা ধবণেব, খানিকটা আমেবিকানিজমেব অনুপ্রবেশ। এই সব প্রবণতা থেকেই মহাযুদ্ধেব আগে কিউবিজ্‌ম্‌ ও ফিউচাবিজম্‌-এব জন্ম হয়েছিল। পক্ষান্তবে তাবা আবার বাডাবাডি শুরু করে এবং হাস্যকব কাণ্ড কবতে থাকে। অর্থহীনভাবে তাদেব বিধিবদ্ধ কবা হয়, লোক-দেখানো কেবদানিব উদ্দেশ্যে এবং খামখেয়ালী কেবামতিব জন্যে তাদেব

কাজে লাগানো হয়। এ ফর্মালিজম্ ও ডেকাডেন্স ছাড়া আর কিছু নয়। কিন্তু তবু এ সব আন্দোলন চিরাচরিত বাক্য-বিধিতে ও নিয়ম-কানুনে এক গভীর ও চূড়ান্ত রকম ভাঙন ঘটায়।

অতএব যে ষ্টাইল আমাদের দরকার তা ইতিমধ্যেই তৈরী হয়েছে। প্রোলেটারিয়ান লেখকরা তা ব্যবহার করলে তাদের জিনিষেরই অনেকখানি আবার গ্রহণ করবে; কারণ আর্ট ও মানসের ক্ষেত্রে সমস্ত লোক-সৃষ্টি যে অনাড়ম্বরতা ও গভীরতার দৃষ্টান্ত দেখিয়েছে তারই সূত্র অনুসারে এ ষ্টাইল পুনর্গঠিত হয়েছে। কিন্তু এ রকম একটা যন্ত্রের প্রয়োগ শিক্ষা করতে হয় (গোর্কি সম্প্রতি লেখক-শ্রমিকের শিক্ষানবিশিকে কামার-শ্রমিকের শিক্ষানবিশির সঙ্গে তুলনা করেছেন; তিনি ঠিকই বলেছেন)। আমরা যেন উৎকৃষ্ট ফর্মের গুরুত্বকে কম করে না দেখি এবং স্বাভাবিকতা, অসংযম ও স্থূলতার মধ্যে যে পার্থক্য আছে তাকে শিশুসুলভ দৃষ্টি নিয়ে গুলিয়ে না ফেলি। এ ছাড়া ইনটেলেকচুয়াল 'মানষিগিরির' যে সব জটিলতা আছে, যে সব ভান আছে এবং যত বিকার আছে তা যেন আমরা পরিহার করি। নতুন ভাষা তার সজীবতা, তার পরিচ্ছন্নতা, তার তেজ, এমন কি তার রূঢ়তা যাতে বজায় রাখে সে বিষয়ে আমরা যেন অবহিত থাকি; কিন্তু এ ভাষা থেকে আর যা কিছু পাওয়া যেতে পারে তাও যেন আমরা পরীক্ষা করে দেখি। আমরা যেন এখন থেকে তাকে সমস্ত ফর্মুলার কড়াকড়ি থেকে মুক্ত রাখি, এমন কি ব্যক্তিগত মৌলিকতার ফর্মুলা থেকেও, যা যে-কোন লেখকের পক্ষে অত্যন্ত লোভনীয়। প্রকাশ-পদ্ধতিকে টেক্‌নিকের দিক দিয়ে, বৈজ্ঞানিক দিক দিয়ে অর্থাৎ বিভিন্ন ভঙ্গীতে, বিষয়বস্তুর সঙ্গে খাপ খাইয়ে নিতে হবে।

এই প্রসঙ্গে বলা যেতে পারে যে, কাব্যের বেলায় অচল ছাঁচ ভেঙে ফেলার ব্যাপারটা বড় বেশী দূর নিয়ে যাওয়া হয়। প্রাচীন ধারা বর্জন করার প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই, কিন্তু ছন্দ ও সঙ্গতিকে হুড়মুড় করে তার সঙ্গে ঠেলে দেওয়া ভুল হয়েছিল। এমন এক অস্ত্রোপচার হ'ল যার ফলে কাব্যের ঘট্‌ল অঙ্গহানি। এ ক্ষেত্রে শীগগিরই হোক আর দেরীতেই হোক খানিকটা পেছনে ফিরে আসার দরকার হবে।

যাকে বলা হয় সাহিত্যিক রচনার শ্রেণী তাতে, বিশেষত উপন্যাসে ও নাটকে প্রোলে-টারিয়ান সাহিত্যের পক্ষে একটা সংশোধন আনা দরকার। আমার মতে এখানে তার খুঁজতে হবে অতীতকে, সদ্য অতীত নয়, ক্লাসিক স্থিতিশীলতা নয়, যা নিঃস্ব ও অবাস্তব হয়ে পড়েছিল; তার খুঁজতে হবে লোক-ঐতিহ্য, লোক-সঙ্গীতের, লোক-রূপকের বিশাল

বিস্তাবময় সমৃদ্ধ ও জীবন্ত রচনাব ঐতিহ্য (যদিও প্রথম বিপুল প্রস্ফুবণে সে বচনাব পদক্ষেপ ছিল টলমল), "মিষ্ট্রি" ও মহাকাব্যেব ঐতিহ্য। প্রোলেটারিয়ান সাহিত্যকে ধবতে হবে এই সব অতিকায় প্রাচীন ফর্মগুলো যাদেব প্রস্ফুরণ ক্লাসিক বিধিবদ্ধতাব কবলে পিষ্ট ও বিধ্বস্ত হয়েছিল।

কিন্তু এই সব বিশাল কাঠামোকে আবার গ্রহণ কবে' প্রোলেটাবিয়ান সাহিত্য তাদেব মধ্যে নতুন নিঃশ্বাস দিয়ে, তাদেব মধ্যে বর্তমান জনগণের, ভবিষ্যতেব শ্রমজীবীব গতি-স্পন্দন, প্রসাবণ ও স্বপ্ন ভবে দেবে।

আগে থেকে ঠিকঠাক করে' কাজে নাম্‌বার কোনো কৃত্রিমতা ঐ প্রবণতায় নেই। একটা স্বাভাবিক শক্তিব সমস্ত বৈশিষ্ট্য ওব মধ্যে আছে। রাজনৈতিক নির্দেশেব কোনো প্রশ্ন আব এতে নেই। বৈপ্লবিক অভিযান হচ্ছে এক জীবন্ময অবধারিত ভাগ্যের সংগঠন। এ প্রবণতা স্বভাবসঙ্গত, কাবণ এ হচ্ছে জনগণেব অন্ধকাব থেকে নিষ্ক্রান্ত হওয়াব ঐতিহাসিক, বৈজ্ঞানিক ও মূলগত পবিণাম।

সাহিত্যকে অধিকাংশ মানুষেব এই সুকল্পিত ঐক্যবদ্ধ সমাবেশের রূপ প্রতিফলিত কবতে হবে ; যে বৈপ্লবিক ইতিহাস আবম্ভ হয়েছে এবং যা এখন থেকে চূড়ান্ত লক্ষ্য পর্যন্ত চল্‌বে সেই ইতিহাসেব টাইপ, চবিত্র, কীর্তি ও ঘটনা প্রদর্শন কবতে হবে, অতীতেব বিরুদ্ধে বর্তমানের ভিতবেব ও বাইরেব প্রতিক্রিয়া দেখাতে হবে।

তাব একটা নেতিমূলক কর্তব্যও দেখা দিয়েছে—ধ্বংসেব কর্তব্য। যে পুবনো ব্যবস্থা চলমান পৃথিবী বদ্‌লাতে চেষ্টা কবছে সেই ব্যবস্থাকে তাব আক্রমণ কবতে হবে : কর্মে, আচাব-ব্যবহাবে, মনোবৃত্তিতে সাধাবণভাবে ও বিশেষভাবে, বৃহৎভাবে ও ক্ষুদ্রভাবে যত ক্ষয়, যত অপব্যবহাব, যত অসামঞ্জস্য ও যত পাশবিকতা আছে সব আক্রমণ করতে হবে। সমস্যা দুই জাতেব নেই : বুর্জোয়া ও প্রোলেটাবিয়ান ; আছে দুটো দৃষ্টিভঙ্গী। মুখোস খসিয়ে দেওয়া দবকাব। এমন দৃশ্য এমন বিকাব ও আচাব-ব্যবহাব বয়েছে যেগুলো বিশ্বব্যাপী দর্শকেব সামনে টেনে এনে ধরতে হবে—যাতে তাবা পবে চোখেব সামনে সেগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় কবতে দেখতে পায় কিংবা যাতে তাবাই সেগুলোকে ঝেঁটিয়ে বিদায় কবে।

নতুন সাহিত্যকে প্রাচীন "ইণ্টেলেক্‌চুয়ালিটি"-ও আক্রমণ কবতে হবে, বিশেষ-ভাবে, বুর্জোয়া সাহিত্যেব সমালোচনাব ভাব নিতে হবে (কর্মী-লেখকদেব' একটা বিশেষ গোষ্ঠি দ্বাবা)। বুর্জোয়া সাহিত্য তাব সমস্ত রূপে ধনতন্ত্রী সমাজকে প্রকাশ

করে। এ রকম পণ্যকে প্রবল আঘাতে ভেঙে ফেলতে হবে। আমি ইতিপূর্বেই মস্কোতে এই কৃত্রিম, উপর-ভাসা ও ক্ষয়িষ্ণু সাহিত্যের কথা বলেছি। এ সাহিত্য তার প্রতিনিধিদের কারো কারো অর্থাৎ সাহিত্যিক শিল্পপতিদের টেকনিক্-কুশলতার দৌলতে এখনও একটা মর্য্যাদা বজায় রেখেছে। এই বইয়ের স্তূপের বৈশিষ্ট্য হ'ল মার্সেল প্রুস্ত্-এর ধরণের বিশৃঙ্খলা, অসংলগ্নতা, শূন্যতা, তুচ্ছতা (এ রচনায় নতুনত্ব সঞ্চার করা হয়েছে উপর থেকে), সবিস্তার খুঁটিনাটির উপর রুচি, উঁচু সমাজের ঝল্‌কানি, আঁদ্রে জিদ্-এর ধরণের দুর্নীতি-অনুশীলন, পল ক্লদেল-এর ধরণের কুসংস্কারণ-অনুশীলন ; তাক লাগাবার জন্যে চেষ্টা, সাধারণ গণ্ডীর বহির্ভূত চরিত্র ও বিষয় খোঁজা (যে সব কৃত্রিম লোককে আমাদের বিপরীত দিকে খাড়া করবার চেষ্টা করা হয় তাদের মধ্যে বিকৃতমস্তিষ্ক ও বিকৃতস্বভাবের সংখ্যা প্রচুর), খোপে-খোপে ভাগ করার প্রাণপণ ঝোঁক, সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম বিশ্লেষণ—সংক্ষেপে সর্বক্ষেত্রে ভাগ-বিভাগ, আত্ম-কেন্দ্রিকতা আর ব্যবচ্ছেদ দ্বারা জীবনের শ্বাসরোধ। এই স্বৈরাচার থেকে শুধু একটি নেতি-বাচক থিওরিই বেরিয়ে আসে : আর্টের জন্যেই আর্ট।

এই যে যাদুঘর এখানে আজকাল আবার "পপিউলিষ্ট" লেখকেরা নিয়ে আস্‌ছে জন-সাধারণের সবারি, শ্রমিক ও কৃষককে সাজাচ্ছে হাল ফ্যাশানে। এরা মনে করছে বিষয়বস্তু বদ্‌লাতে হয় নেক-টাই বদ্‌লাবার মতো। এরা জনসাধারণের সেই রকম বন্ধু যে রকম বন্ধু সরকারী ডেমক্রাটরা। এরা শ্রমজীবীদেরই আঁকুক আর স্নায়ুবিকার-গ্রস্তদেরই আঁকুক, যে জীবন্ত ও রূঢ় মনোবেগ নতুন মানুষকে, সমষ্টি মানুষকে, জনতাকে তুলে ধরে' তাকে তার আপন বলে সাহিত্যে প্রবেশ করাবে (সাহিত্যের কাঠামো যদি তাতে ফাটে ফাটুক), সে বেগ এদের পিছনে ফেলে চলে যেতে দ্বিধা করবে না।

যে কয়েকটি বিবেচ্য বিষয় আমি পর পর বল্‌লাম তা থেকে এই সিদ্ধান্তই হয় যে, প্রোলেটারিয়ান সাহিত্য হচ্ছে প্রকৃতপক্ষে মানস-শক্তিগুলোর অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-চিহ্নিত দিক-পরিবর্তন, নতুন ব্যূহ সংগঠন এবং গতিমুখীনতা। কিন্তু এ থেকে এ সিদ্ধান্তও করতে হয় যে, বর্তমান সময়ে এমন লেখক খুবই কম যাঁরা সর্বাঙ্গীনভাবে প্রোলে-টারিয়ান লেখক। আবশ্যক সমস্ত শর্ত এক সঙ্গে পূরণ করতে পারেন এমন লেখক বিরল। যাঁদের নাম মনে আসে তাঁদের অধিকাংশ সম্বন্ধে বলা যায় যে, তাঁরা মাত্র কোনো একটা দিক দিয়ে প্রোলেটারিয়ান লেখক। আমাদের সংগঠিত

প্রোলেটারিয়ান লেখক-বাহিনীরা (আমরা ফ্রান্সে এই বাহিনী অবিরাম গড়তে থাকব) এখনও পরামর্শ-সঙ্ঘ আর বিশেষ গোষ্ঠী ছাড়া আর কিছু নয়।

আমাদের কর্তব্য হচ্ছে এ সাহিত্যের বিকাশ যাতে তাড়াতাড়ি হয় তার ব্যবস্থা করা। সমাজ-কর্মীদের পরিকল্পনার সঙ্গে সমান্তরালভাবে এই বিরাট কর্মসূচীকে সমস্ত বাধা অপসৃত করে সামনে ধরতে পারলে সে ব্যবস্থা হবে। সেইটাই আমাদের কর্তব্য। আমারা যতখানি সচেতনতা আর পরিষ্কার উপলব্ধি সঞ্চার করতে পারব এই বিকাশে ততখানি সাহায্য করতে পারব। আমাদের অসহিষ্ণুতা সত্বেও আমরা যেন ভুলে না যাই যে, ইন্টেলেকচুয়াল ও আর্টিস্টিক আন্দোলনকে সম্পর্কিত ও একীভূত করতে; বরং বলি, তাদের পক্ষে নিজের থেকে সম্পর্কিত ও একীভূত হতে সময় লাগে। এই ধরণের উপলব্ধি ও তার রূপদানে মানুষের মন কেমন যেন একটু মন্থরভাবে চলে। মানস ক্ষেত্রে দানা বাঁধবার জন্যে যে সময় দরকার তাকে প্রাকৃতিক উপাদানের দানা বাঁধার সময়ের সঙ্গে তুলনা করা যায়। ঘটনাবলীর দ্বারা অপেক্ষাকাল বাড়তে পারে; কিন্তু যে কোন ক্ষেত্রেই তার আসল কারণ হল সমস্ত কাঠামোটা রক্তে মাংসে গড়ে তোলার গভীর কর্ম্ম-প্রয়াস। আমরা এ কর্মের একটা গৃহ নির্মাণ করেছি। সুতরাং সবচেয়ে কার্যকরী যে যোগাযোগ আমাদের দরকার, তা আমরা পাব মহৎ রুশ বিপ্লবের প্রতিনিধিদের কাছ থেকে।

আঁরি বারব্যুস

অনুবাদক —**অরুণ মিত্র**

বাংলা কবিতা ও উপন্যাসের গতি

ভাদ্র সংখ্যার 'পরিচয়ে' 'ঔপনিবেশিক সমাজ ও উপন্যাসের যুগ' নামে চমৎকার প্রবন্ধটিতে শ্রীযুক্ত গোপাল হালদার দেখিয়েছেন যে বাংলা সাহিত্যে সম্প্রতি অনেক-গুলি ভালো ঔপন্যাসিকের উপস্থিতি নেহাৎ আকস্মিক নয়—তার পিছনে আমাদের সমাজ বিবর্তনের স্রোত আছে। আমাদের জীবন আজকাল নানা অন্তর্দ্বন্দ্বে বিভক্ত। সামাজিক ক্ষেত্রে সামন্তযুগের ও ধনিকযুগের সমাজবিন্যাস—এখানে এখনও পাশাপাশি চলছে; তার সঙ্গে আড়াআড়িভাবে যুক্ত হয়েছে সাম্প্রদায়িক বিভাগ। তারও সঙ্গে

আমাদেব জনসংস্কৃতি ও ভদ্রসংস্কৃতিব দ্বন্দ্ব, আমাদের যুদ্ধকালীন নানা প্রশ্ন আমাদেব সমস্যাকে আরও জটিল কবে তুলেছে। "যে বাঙালীদেব শবৎচন্দ্র দেখিয়াছিলেন তাহাবা ছিল আধাসামন্ত যুগেব ব্যক্তি। যুদ্ধে, মন্বন্তবে, ধনাগমে ও বিক্তৃতায় মিলিয়া আজিকাব বাঙালীব আরও বেশি বিচিত্র বিবর্তন ঘটিতেছে। আব, যুদ্ধে-মন্বন্তবে মিলিয়া আজিকাব বাঙালী শিল্পীকেও এই বাস্তব অবস্থা সম্বন্ধে, চাবিদিককার মানুষেব দুর্ভাগ্য সম্বন্ধে, এই ভাঙ্গা সমাজের জটিলতা সম্বন্ধে, ব্যক্তিব সম্ভাবনা ও তাহাব বাধা সম্বন্ধে অনেক বেশি সচেতন কবিয়া তুলিয়াছে। আজিকাব শিল্পীবা সমাজ-সচেতন হইতেছে এবং এই কাবণেই উপন্যাস আজ তাহাদেব প্রধান স্বাভাবিক সৃষ্টিপথ।"

কিন্তু বর্তমান সমাজেব বিবর্তন লক্ষ্য কবলে মনে হয় উপন্যাসই যদি বা বর্তমানেব শিল্পীদেব প্রধান ও স্বাভাবিক সৃষ্টিপথ হয়, তা হলেও সেখানে এমন একটি সংকট আসছে দেখতে পাই যাতে উপন্যাসেব অগ্রগতি রুদ্ধ হবাব সম্ভাবনা। বর্তমান বাংলা কবিতা ও বর্তমান বাংলা উপন্যাসের তুলনা কবলেই কথাটা বোঝা যায়। গত শতকে বৈদেশিক ধনতন্ত্রেব জন্য আমাদেব দেশে ধনিকতন্ত্র জন্মাতে পায নি,—সেই কাবণে একদিকে দেখা দিল সামন্ততন্ত্রেব একটা অদ্ভুত সংস্করণ, অন্যদিকে মধ্য-বিত্ত সমাজেব অভ্যুদয়। এই কাবণেই অন্যান্য দেশেব তুলনায় আমাদেব দেশে, বিশেষ কবে বাংলায়, মধ্যবিত্ত সমাজেব চেহারা এবং সামাজিক ইঙ্গিত অন্যবকম। পশ্চিমে একালেব সমাজ ভাঙাগডার পিছনে আছে ধনিকতন্ত্রের ওঠা-পড়া। আমাদের দেশে এতদিনে দুই একটা ধনিক দেখা দিলেও ধনিকতন্ত্র জন্মায় নি, হযতো সম্পূর্ণাঙ্গ হবাব আগেই আমরা সমাজ বিবর্তনের পববর্তী ধাপে চলে যাবো। সেইজন্য ইংবেজ সভ্যতা এবং ইংবেজী ধনতন্ত্রেব আঘাত এদেশে লাগবাব পব যে-শ্রেণী সমাজেব সামনে এসে দাঁড়ালো সে-শ্রেণী ধনিকশ্রেণী নয়, সে-শ্রেণী মধ্যবিত্তসমাজ। বলা বাহুল্য, এদেব টান সামন্তগোষ্ঠীব প্রতি যথেষ্টই ছিল, কেননা শেষ পর্যন্ত তাঁবাও এই সামন্ত-কাঠামোব অন্তর্ভুক্ত। তার একটি কাবণ আছে। প্রকৃত সামন্তযুগে মানুষ দাসত্ব কবে মানুষের, প্রভুর কাছে দাসের দাসখত কোনও কালে ঘুচবাব নয। ধনিকতন্ত্রেব কাজ হচ্ছে সামন্ত প্রভুর কাছে মানুষেব এই দাসত্ব ঘুচিয়ে ধনিকের কাছে মানুষেব দাসখৎ লিখে নেওয়া। যাব হাতে মূলধন নামক বস্তুটী যত থাকবে জনসমাজে তাব ক্ষমতা ততই বাড়বে। ইংরেজ এদেশে আসাব সঙ্গে সঙ্গে সে প্রাচীন সামন্ততন্ত্রকে ধ্বস্ত বিধ্বস্ত কবেছিল। ১৭৯৩ সালের পর যে নকল সামন্ততন্ত্র গড়ে উঠল তাতে বাইবের ঠাঁঠ যতই বজায়

থাক্ তার আসল প্রাণবস্তুটি ছিল না। বাংলা দেশে গত শতকে ধনিকতন্ত্রের কোনও সন্ধান নেই, সামন্ততন্ত্রও আসলে পঙ্গু—সেইজন্য মধ্যবিত্তসমাজই বাঙালী সমাজের তাপমান হয়ে উঠল। এই মধ্যবিত্তসমাজের সামন্ততন্ত্রের প্রতি টান থাকা স্বাভাবিক, কেন না সামন্ততন্ত্রের পঙ্গুতাই এদের অভ্যুত্থানের কারণ। অথচ এদের মধ্যে সামন্ততন্ত্রের প্রতি টান থাকলেও ব্যক্তির বিকাশ হবার সুযোগ ঘটেছিল, কেননা তখন যুগটা সামন্ততন্ত্র ঘেঁষা হলেও মানুষের কাছে মানুষের অধীনতার কাল অনেকদিন আগেই কেটে গেছে। এই পটভূমিকায় যখন ইংরেজ সাম্রাজ্যের প্রয়োজন হল কেরানীর, দরকার হল উকীল ব্যরিষ্টার অ্যাটর্নীর—সে-সময় মধ্যবিত্ত সমাজে ব্যক্তিক প্রসারের আরও সুযোগ মিলেছিল। এই আবহাওয়াতেই পর পর রামমোহন, বিদ্যাসাগর, মধুসূদন, বঙ্কিমচন্দ্র, দীনবন্ধু, রবীন্দ্রনাথের জন্ম। এঁরা বিভিন্ন যুগের ফল—তাই তাঁদের মধ্যে পার্থক্যও যথেষ্ট—কিন্তু অনুসন্ধান করলে এঁদের মধ্যে একটা বিবর্তনের ধারা খুঁজে পাওয়া যাবে। একই ধারা বিভিন্ন দিকে মোড় খেতে খেতে বিভিন্ন ব্যক্তিত্বের মধ্যে বিভিন্ন ফসল ফলালো—বিচিত্র দিকে তার প্রসার—কিন্তু এদের মধ্যে একটা গোড়ার মিল আছে।

তবু লক্ষ্য করা যায়, প্রসারের ধারা এই যুগে যদিও বিস্তৃত হতে বিস্তৃততর হতে চলেছে তবুও মধ্যে মধ্যে সংকট আসে নি তা নয়। ব্যক্তির প্রকাশ প্রথমে মধুসূদনের দুর্দাম আবেগে মুক্তিলাভ করেছিল। বঙ্কিমচন্দ্র ধারাটিকে আর একটি মোড় দিলেন। মধুসূদনের মত উপপ্লাবী ভাববন্যা তাঁর ছিল না, সেইজন্য তাঁর আঙ্গিক উপন্যাস ও প্রবন্ধ। বলা বাহুল্য ঔপন্যাসিক বঙ্কিমচন্দ্র ও প্রাবন্ধিক বঙ্কিমচন্দ্রের মন এক নয়। এ সম্বন্ধে একটি চমৎকার আলোচনা হতে পারে। কিন্তু মোটের উপর বঙ্কিমচন্দ্রের হাতে মধ্যবিত্তসমাজের মনোবৃত্তি অন্যভঙ্গীতে প্রকাশিত হলো। সমাজের সঙ্গে ব্যক্তির সম্বন্ধ সর্বত্র স্বীকার করেও বলতে পারা যায় আঙ্গিক হিসেবে কবিতা উপন্যাসের চেয়ে ব্যক্তিগত। মধুসূদনের যুগ হচ্ছে সেই যুগ যে সময় ব্যষ্টি বৈপ্লবিক শক্তিতে বাঁধ ভাঙতে চায়। সেইজন্য মধুসূদনের আঙ্গিক হলো কাব্য, কিন্তু মহাকাব্য। অর্থাৎ, ব্যষ্টি তখনও ভবিষ্যতে আস্থাহীন হয় নি, তার মনে তখন নবযৌবনের জোয়ার কল্লোলিত হচ্ছে। উপন্যাসের বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যই হচ্ছে যে তারা চরিত্রের 'টাইপ' নয়, গোপাল হালদারের কথায় তারা 'বর্গ চরিত্র' নয়, কিন্তু তারা সমাজবিচ্ছিন্ন হয়ে গজ-মোতিমিনারে বাসও করে না। বঙ্কিমচন্দ্রের সময় নবযৌবনের উৎসাহ মন্দীভূত ;

সেইজন্য তাঁর রচনাবলীর মধ্যে বুদ্ধিবিচার ও হৃদয়াবেগের কৌতুকাবহ দ্বন্দ্ব দেখতে পাওয়া যায়, কোথায়ও প্রথমটি কোথায়ও বা দ্বিতীয়টি জয়ী। বঙ্কিমচন্দ্রের আঙ্গিক সেইজন্য উপন্যাস ও প্রবন্ধ হওয়াই স্বাভাবিক। তাঁর সমসাময়িক কবিদের মধ্যে প্রেরণার অভাব ঘটেছিল এ কথাও অত্যুক্তি নয়। নবোজ্জীবিত স্বাদেশিকতা রঙ্গলাল হেমচন্দ্রকে একটা নতুন প্রেরণার উৎসের সন্ধান দিয়েছিল বটে, কিন্তু সেগুলির সঙ্গে আমাদের প্রাচীন যে ধারা চলে আসছিল তার ঠিক মিল হয় নি। এই কারণেই আজ রঙ্গলালের কবিতা স্থূল মনে হয়, হেমচন্দ্রের কবিতা মনে হয় মেকি বহু জায়গাতেই। এর একটা কারণ এই যে, মধুসূদনের সময়ের ব্যষ্টি এ-যুগে আর নেই, অথচ সম্পূর্ণ আত্মমুখীন ব্যক্তিক কবিতার যুগও তখন আসে নি। এই কথার অন্যতম প্রমাণ মেলে আর একটি দিকে। সে-সময় এমন কতকগুলি নাটক দীনবন্ধু রচনা করেছিলেন— যার কিছু কিছু ত্রুটি-বিচ্যুতি বাদ দিলে, যা এ পর্যন্ত বাংলা নাট্যসাহিত্যের মধ্যে সবচেয়ে নির্ভেজাল বলে গণ্য করা যেতে পারে। ব্যক্তিকতাই সবচেয়ে প্রবল হয়ে উঠলে নাটক দানা বাঁধে না।

কিন্তু এঁদের যুগ কাটবার সঙ্গে সঙ্গে আবার সঙ্কট দেখা দিয়েছিল, রবীন্দ্রনাথ তা তাঁর অদ্ভুত প্রতিভায় কাটিয়েছেন। কবিতা তাঁর হাতে সম্পূর্ণ নতুন মোড় নিয়েছে, ব্যক্তিক কবিতার শুরু প্রকৃতভাবে তাঁর হাতেই। এর আরম্ভ, বিকাশ, পরিণতি—এবং ক্ষয়িষ্ণুতাও কাব্যের বিভিন্ন যুগ রচনা করেছে। এর নানা বৈচিত্র্য এত সংক্ষেপে বলা সম্ভব নয়, কিন্তু মোটামুটি কথাটা এই। উপন্যাসে, গানে,—প্রত্যেক দিকেই তিনি নতুন ঐতিহ্য রচনা করে গেছেন।

তবু প্রশ্ন করতে হয় এই ঐতিহ্য আমাদের ভবিষ্যতের কতটুকু নিয়ামক হবে। এই প্রশ্নের উত্তর পেতে হলে প্রথমেই মনে রাখতে হবে কবিতায় উপন্যাসে গল্পে গানে ছবিতে রবীন্দ্র ঐতিহ্য এক নয়। সেকালের সমাজসংকট রবীন্দ্রনাথের মনে সচেতনে বা অবচেতনে ধরা পড়তেই তা তাঁর ব্যক্তিত্বের রসে রঞ্জিত হয়ে একেবারে সম্পূর্ণ নতুন ভঙ্গীর কবিতা হয়ে দাঁড়ালো—এ-রকম ব্যক্তিক কবিতা কখনও হয় নি। কিন্তু এই ব্যক্তিকতার স্বরূপ কি? এ-কথা স্বীকার করতে হবে, রবীন্দ্রনাথের মনে আমাদের প্রাচীন সভ্যতার রসের সঙ্গে প্রতীচ্য সভ্যতার রসের এমন অনবদ্য সংমিশ্রণ ঘটেছিল যা সত্যিই আশ্চর্য। সেইজন্য তাঁর কবিতায় যে সুর লাগল তাতে হৃদয় ভুললো, কিন্তু মুস্কিল হলো এই যে সে-সুর রবীন্দ্রনাথ ছাড়া আর কারুর পক্ষে সম্ভব ছিলো না।

বঙ্কিমচন্দ্র যদি স্কটেব অনুকবণ কবেন তাহলে বোঝা যায় এতদূব বঙ্কিমচন্দ্রেব নিজস্ব, কতটা আহবিত। মিশ্রণটা সেখানে তিলতণ্ডুল ন্যায়ে—বেছে আলাদা কবা কষ্টকব হলেও সম্ভব। কিন্তু ববীন্দ্রনাথ যখন 'বর্ষশেষ' লেখেন তখন তাব মধ্যে কতখানি শেলী আব কতখানি ববীন্দ্রনাথ তা বোঝা যায় না। সংমিশ্রণটা ঘটেছে একটি বিবাট প্রতিভাব মধ্যে—সংমিশ্রণেব সময় আমরা জানতে পাবি না—যা দেখি তা রবীন্দ্রনাথেব ব্যক্তিত্বে সম্পূর্ণ বঞ্জিত। এই ধাবা ক্রমবিবর্তিত হতে তাঁব কাব্যের শেষ পর্যায়ে এক নিবলংকাব সমাহিত রূপ নিয়েছে—যা বর্তমান ক্ষয়িষ্ণুতার ছোঁওয়া থেকে আত্মবক্ষা কবতে পেবেছে, যদিও তা পেবেছে এক নতুন ধবণের নৈর্ব্যক্তিকতাতেই, সম্পূর্ণ বহির্মুখীন ও প্রদীপ্ত সামাজিকতায় নয়।

অথচ তাঁব প্রথম যুগের উপন্যাসে ববীন্দ্রনাথেব সম্পূর্ণ আলাদা চেহারা। কবিতায় যে-যুগে তিনি নিজেব মনেব মধ্যে এ-দেশী ঐতিহ্যকে অন্য ঐতিহ্যেব সঙ্গে সংমিশ্রিত কবে একটি আলাদা ঐতিহ্য খাড়া কবে তুলবাব চেষ্টা কবেছিলেন, সে-যুগে তাঁব ছোট গল্পেব মধ্যে এবং উপন্যাসগুলিব মধ্যেও বাংলাব খাঁটি অন্তববসেব পবিবেশন তিনি কবছিলেন—গল্পের ও উপন্যাসেব মুখ ফেবাচ্ছিলেন সম্পূর্ণভাবে আমাদেব দেশেব মাটিব দিকে। ক্রমশ ক্রমশ তাঁব এ-যুগ উপন্যাসেও কেটে গেল—'গোবায়' সম্ভবত তাব প্রথম সূত্রপাত। বিশেষভাবে আলোচনা কবলেই দেখা যায় তাঁর শেষেব যুগেব উপন্যাসগুলিতে প্রথম যুগেব উপন্যাসগুলিব মত প্রসন্ন গম্ভীবতা নেই, নেই প্রসন্নতা, নেই ধীব শান্ত গতি, নেই গভীব করুণা—তাব বদলে আছে তীক্ষ্ণ স্ফুলিঙ্গ, যা আমাদেব চমকায় কিন্তু স্নিগ্ধ কবে না, আছে দম-না-নেওয়া গতিবেগ, আছে জ্বালাময় পবিমণ্ডল। এ যেন বর্ষাব প্রসন্ন শ্যামল শ্রীব মেঘেব বদলে বৈশাখেব পিঙ্গল বিদ্যুৎ আব কালবৈশাখীর ঝড়। কবিতায় তিনি ক্রমবিবর্তনেব ধাবা হাবান নি কিন্তু উপন্যাসে তিনি তা বজায় বাখতে সম্ভবত পাবেন নি। সেইজন্য শেষের উপন্যাসগুলিকে কারুকাজ দিয়ে তিনি ভবিয়ে দিয়েছেন, কিন্তু আসলে অভাব পড়েছে। শবৎচন্দ্র ঔপন্যাসিক হিসেবে সাফল্যলাভ করেছিলেন, কেননা ববীন্দ্রনাথ যেদিকে অগ্রসব হতে হতে থেমে গেলেন শবৎচন্দ্র আমাদেব সমাজকে নিবিডভাবে চিনে তাব অনেক দিক আবও নির্মোহ দৃষ্টিভঙ্গীতে আবও ঘনিষ্ঠ পবিচয়েব সঙ্গে বর্ণনা কবে দিয়েছেন। তারপব আরও যে নতুন নতুন সমস্যা উঠছে, নতুন নতুন শ্রেণী গড়ছে ভাঙছে সেগুলিব সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে বলেই কতকগুলি সার্থক ঔপন্যাসিকেব যুগপৎ উপস্থিতি বর্তমানে সম্ভব হয়েছে।

আমাদের কাব্য ও উপন্যাসের এই ইতিহাস মনে রাখলে দুই একটা কথা পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। প্রথমত, রবীন্দ্রনাথের অনুকরণে কাব্য লেখা সম্ভব হ'ত না, কেন না তাঁর মনে বিভিন্নধারায় যে ভাবসাম্য ঘটেছিল সেই ভাবসাম্য অন্যত্র ঘটবে না। সেইজন্য বাংলার সাহিত্যক্ষেত্রে গত শতক হতে যে ঐতিহ্য গড়ে উঠছিল রবীন্দ্রনাথ তার ব্যতিক্রম। প্রাক্-রবীন্দ্র ঐতিহ্য সেই কারণে আবার অপেক্ষাকৃত গুরুত্বলাভ করবে। অবশ্য হালের কবিরা সে-দিকে না গিয়ে বৈদেশিক প্রভাবই বেশী গলাধঃকরণ করতে চেয়েছেন অনেকক্ষেত্রে, কিন্তু তা করতে গিয়ে সাধারণত তাঁরা অপরিপাকের দায়েই পড়েছেন। সাম্প্রতিক কবিদের লক্ষ্য যে বিদেশের দিকে বেশীমাত্রাতেই পড়ছে, তার একটা কারণ হচ্ছে, আমাদের মধ্যবিত্তসমাজের ভাঙন যতই বাড়ছে, আমাদের কবিরাও ও-দেশের ভগ্ন মধ্যবিত্ত সমাজের কাব্য থেকে কৌশলগুলি আহরণ করে তাঁদের কাব্যকৌশল রচনার পরিশ্রম লাঘব করছেন।

অথচ উপন্যাসে এখনও এই চ্যুতকেন্দ্রিকতার পালা উৎকট হয়ে ওঠে নি, সেখানে এখনও একটা ক্রমোন্নতিশীল বিবর্তন চলেছে। তার কারণ, কবিতায় যে-যুগ পূর্বেই ঘটে গেছে-উপন্যাসে সে-যুগ এখনও অনাগত। এমন কি, রবীন্দ্রনাথও আঙ্গিকভেদে এই মানস-সংস্থাভেদের হাত হতে নিষ্কৃতি পান নি। কিন্তু শেষ পর্যন্ত উপন্যাস আঙ্গিক হিসেবে অপেক্ষাকৃত সামাজিক বলে তাতে চ্যুতকেন্দ্রিকতা ও ব্যক্তিবিলাস উৎকট হতে পারে না, এ-কথা যে সত্য নয় তার প্রমাণ জয়েস প্রভৃতির রচনায় পাওয়া গেছে। বাংলার উপন্যাসে সে-যুগ যে একটু আধটু উঁকি মারে নি তাও নয়। উদাহরণ স্বরূপ একজন বিশেষ ক্ষমতাবান্ উপন্যাসিকের কথা মনে হয়। মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'পুতুলনাচের ইতিকথা', 'মিহি ও মোটা কাহিনী', 'পদ্মানদীর মাঝি', 'চতুষ্কোণ' এবং 'রাঙামাটী'—পর পর এই রচনাগুলি আলোচনা করলে এর মধ্যে একটা দ্রুত বিবর্তনের আভাস পাওয়া যায়। প্রথম বইটিতে একজন শিক্ষিত লোকের মন পাড়াগাঁয়ের অন্ধ সংস্কারের মধ্যে ও অদ্ভুত ঘটনাবলীর সংঘাতে কি ভাবে স্পন্দিত তার ছবি আছে। ডিকাডেণ্ট পরগাছা শহুরে সমাজের তা ছবি নয়, অথচ সজীব জোরালো সমাজের ছবিও নয়। কোথায়ও কোথায়ও বিকৃতির পরিচয় আছে। কিন্তু বোঝা যায় এ বিকৃতি স্বাভাবিক, ঐরকম ধাক্কা খেলে মন ঐভাবে বেঁকে চুরে যাওয়া বিচিত্র নয়। 'মিহি ও মোটা কাহিনীতে' মাণিকবাবু শুধু বিকৃত মনেরই ছবি এঁকেছেন, কিন্তু তবু শিল্পকাজ হিসেবে তা আশ্চর্য। 'পদ্মানদীর মাঝিতে' মাণিকবাবু 'পুতুলনাচের ইতিকথা' হতে

সামাজিক স্তরের আরও একধাপ নীচে নেমেছেন—প্রাণবান ঐতিহ্যের অন্তর্গত অথচ একটা এ পর্যন্ত স্বল্প পরিচিত সমাজের ছবি তার মধ্যে সুন্দরভাবে পাই। কিন্তু 'চতুষ্কোণে' মাণিকবাবুর পদস্খলন ঘটেছে বলে আমার বিশ্বাস—সেখানে বিকৃতিবিলাস শিল্পের সীমানা লঙ্ঘন করেছে। দ্বন্দ্ব দেখাবার চেষ্টা আছে, কিন্তু তা দানা বাঁধে নি। এই ত্রুটী আরও প্রবল হয়ে উঠেছে তাঁর 'রাঙামাটীতে'। 'পূর্ব্বাশায়' এই উপন্যাসটি প্রকাশিত হচ্ছিল। তাতে তিনি 'বৈণ চিন্তামণি' সম্বোধন করে একটি গ্রাম্য মেয়ের মনের কথা চিঠির আকারে বলতে চেয়েছেন। কিন্তু গ্রাম্য মেয়েকে উপলক্ষ্য করে তিনি যা বলেছেন তা কোনও গ্রামের মেয়ের কথা নয়; রুগ্ন পাণ্ডু সমস্যা-জর্জর ভীরু তথাকথিত-মার্জিত মনেরই অসংলগ্ন উক্তি তার মধ্যে ভরা। এর চেয়ে গ্রামের লোকের সহজ বর্ণনা কত সজীব হতে পারে তার প্রমাণ তাঁরই রচিত 'পদ্মানদীর মাঝি'। আসল কথা, এক্ষেত্রে লেখকের মন উপন্যাসকে উপলক্ষ্য করে নির্জ্জর অসংলগ্ন ব্যক্তিক বিলাসে উন্মত্ত হয়ে উঠেছে।

বাংলা আধুনিক কবিতার ক্ষেত্রে এই রকম উন্মত্ত ব্যক্তিবিলাস কিছুকাল চলে; অত্যন্ত সম্প্রতি দেখা যাচ্ছে কবিরা সর্বগ্রাসী নেতিবাদের হাত হতে রক্ষা পাবার চেষ্টা করছেন। এটি প্রথম প্রকাশ পায় সোভিয়েট রুশিয়া জার্মানি কর্তৃক আক্রমিত হবার সঙ্গে সঙ্গে এই যুদ্ধ জনযুদ্ধে পরিণত হয়েছে এই ধারণা জন্মাবার পর। তারপর হতে প্রতিরোধের সংকল্প এবং জনযুদ্ধের ইচ্ছা অনেক শিশুসুলভ উৎসাহোক্তির জন্ম দিয়েছে। একথা অস্বীকার করে লাভ নেই, ফ্যাসিস্ত বিতাড়নের আগ্রহে হাতিয়ারহীন হয়েও তাঁরা যে-ভাবে অগ্রসর হতে চান, এমন কি ইংরেজী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গেও আপাতত হাত মিলোতে ইতস্তত করেন না, তাতে অনেকেই সায় দেবেন না। কারণ ইংরেজী সাম্রাজ্য-বাদও যে এক ধরণের ফ্যাসিজম্ এ-কথা তাঁরা অবিশ্বাস করতে পারেন না, বিশ্বাসও করতে পারেন না যে এই যুদ্ধ অন্তত ভারতবর্ষের পক্ষেও জনযুদ্ধ। কিন্তু সে তর্ক এখানে থাক্। এর একটা শুভলক্ষণ এই হতে পারে যে, আমাদের কবিতায় যে নেতিবাদ প্রবল হয়ে উঠছিল এবং তরুণ সম্প্রদায়ের মনে অবিশ্বাসের মাত্রা যে-রকম বাড়ছিল এই অন্ধবিশ্বাস অবলম্বন করেও সেই নেতিবাদ বন্ধ হয়তো হলো। সেইজন্য কতকগুলি কবিতার সন্ধান ইতিমধ্যেই পাওয়া গিয়েছে যার মধ্যে অবিশ্বাসের তিক্ততা নেই, স্বাভাবিক প্রাণবত্তা ও সুস্থগতি আছে, ভবিষ্যতে বিশ্বাস আছে। অবশ্য এ-ধরণের প্রাণবত্তা বা সুস্থতা সম্পূর্ণ হতে পারে একমাত্র শ্রেণীহীন সমাজে, যেখানে ব্যষ্টির সঙ্গে

সমষ্টির বিরোধ নেই। তবু যেন একটু নতুন সুর দেখা যাচ্ছে। এ হতে বোঝা যায় ব্যক্তিক উৎকটতার চরম বিলাস না হলে এই দিকে মোড় ফেরার সূচনা হয় না।

সুতরাং বাঙালী সাহিত্যিকদের শিল্পিক মাধ্যম এখন স্বভাবতই উপন্যাস হবে একথা যেমন সত্য, সেই সঙ্গে একথাও তেমনি সত্য যে কাব্যে আমরা যে-ধাপটি পেরিয়েছি উপন্যাসে এখনও সে-ধাপটি পার হই নি। সত্যিকারের সুস্থ ঔপন্যাস তখনই হতে পারে যখন উপন্যাসে (অবশ্য তার আঙ্গিকগত অবশ্যম্ভাবী সামাজিকতা বজায় রেখে) ব্যক্তি-বিলাসের যুগ শেষ হয়ে একটি প্রাণবান্ সজীব সমাজ-জীবনের পরিচয় পাওয়া যাবে। তার জন্য সামাজিক বিন্যাস পরিবর্তিত হওয়া দরকার। কিন্তু যাঁরা উপন্যাসকে তাড়াতাড়ি এগিয়ে দিতে চান তাঁরা সমাজ-বিবর্তনের আগে আগেই ব্যাপারটিকে বুদ্ধি দিয়ে বুঝেই দু'চারটে চ্যুতকেন্দ্রিক ব্যক্তিক উৎকটতার উপন্যাস লিখে ফেলুন না কেন ? অবশ্য সামাজিক তাগিদ না থাকলে সে রকম লেখা একটু unreal হবে, কিন্তু এই ধরণের উপন্যাস যে-সামাজিক সংস্থানের ফল সে-সমাজও তো কম unreal নয়। প্রসঙ্গত বলে রাখা যেতে পারে, যাঁরা এ চেষ্টা করবেন তাঁরা যেন বাঙালী জয়েস হতে চেষ্টা না করেন। কেননা ক্ষয়িষ্ণু সমাজের প্রতিভূ হলেও জয়েস খুব বড় প্রতিভূ ও মহাশিল্পী, সে-রকম শিল্পী হওয়া সহজ নয়, আর দ্বিতীয়ত এদেশে কাটতি হতে হলে একটু ওরিয়েন্টাল হওয়া দরকার। 'বৈণ চিন্তামণির' মতো এ-দেশীর গ্রাম্য আধারে কিছু ও-দেশী মনোবিকলন, কিছু এ-দেশী গ্রাম্য মনের সাধারণ বিকৃতি, কিছু বা শহুরে ক্লৈব্য, আর কিছু অসংলগ্ন অবচেতন উক্তি (অখ্যাত ফরাসী উপন্যাসের ইংরেজী অনুবাদ হতে আহরিত হলেও ক্ষতি নেই) ও স্বৈরাচারী ব্যক্তি-বিলাস ভরে দিলে সেটি অক্ষম হলেও, বা অক্ষম বলেই, নতুন জিনিস বলে পরিগণিত হওয়া অন্তত এদেশে এখনও স্বাভাবিক।*

শ্রীবিমলচন্দ্র সিংহ

---

* এই প্রবন্ধটির পিছনে 'পাদটীকা' বা লেজুড় জুড়বার ইচ্ছা ছিল না। জুড়লাম দু'-একটি প্রয়োজনে—প্রথমত, যে প্রবন্ধের উল্লেখ করে লেখক এই প্রবন্ধ আরম্ভ করেছেন, তার লেখক হিসাবে, আর দ্বিতীয়ত, 'পরিচয়'-এর একজন সম্পাদক বলে ও মার্কা-মারা একজন জনযুদ্ধ-ওয়ালা বলে।

প্রথম কথা : আমার লেখাটি আধুনিক বাংলা উপন্যাস সম্বন্ধে একটি বড় আলোচনার ভূমিকামাত্র। হয়ত তা গ্রন্থাকারে বেরুবে—কাগজ পাওয়া গেলে। তবে বর্তমান লেখকের সঙ্গে অনেক কথাতেই আমি একমত। কারণ আমাদের দৃষ্টিভঙ্গী এক না হলেও খুব কাছাকাছি। বিচারে ও মতামতে তবু তফাৎ কিছু আছে। দৃষ্টিভঙ্গী অনেকটা এক হলেও মতবাদ যে এক না হতে পারে এটা তার একটা বাস্তব প্রমাণ। আমিও মানি, উপন্যাস লেখকদের সামনে যে বিপদ নেই,

হাওড়ার ব্রিজ

যান্ত্রিক মহিমায় উন্নত শির !

বিংশ শতাব্দীর—

তুমি মনসিজ্,

হাওড়ার ব্রিজ !

উদ্ধত ইস্পাত্,

ভ্রূক্ষেপ দৃক্‌পাত্—

মর্ত্ত্যের প্রজ্ঞাতে নেই !

মৃত-সাম্রাজ্যের

ব্যবসা-বাণিজ্যের

হারিয়েছি চিন্তার অজ্ঞাতে থেই ।

তা নয় ! তাঁরা চোরাবালিতে আটকা পড়তে পারেন । সে চোরাবালি সামাজিক, মানসিক এমন কি, আঙ্গিক ঘটিতও হতে পারে । কিন্তু মোটের উপর তাঁদের ক্ষেত্র তৈরী হচ্ছে । সে ক্ষেত্র আবার তাঁরাও নিজেদের সৃষ্টির দ্বারা তৈরী করবেন । একেবারে শ্রেণীহীন সমাজ না হলে কিছু সৃষ্টি হবে না এটাও যুক্তিযুক্ত বিচার নয় । আসলে, সে সমাজ-সৃষ্টির পথের যে সৃষ্টি, মানে "বিপ্লবী সৃষ্টি", তাও তো এখনি শুরু হবে । সচেতন শিল্পীরা তাই করবেন—করছেনও যাঁর যেমন শক্তি । 'শ্রেণীহীন সমাজ না হলে সৃষ্টি সম্ভব নয়'—এ কথা 'অতি-বিপ্লবী' কথা । আর 'অতি-বিপ্লবী' অনেক সময়ই কার্যত 'প্রতি-বিপ্লবী' ।

দ্বিতীয় কথা : জনযুদ্ধ ও 'ইংরেজী সাম্রাজ্যবাদের' সঙ্গে জনযুদ্ধবাদীদের 'হাত মিলানোর' তর্ক লেখক তুলতে চাননি । 'পরিচয়ে'ও আমরা তা কিছুতেই তুলব না । কারণ, 'পরিচয়' কোনো রাজনৈতিক তর্কের কাগজ নয়,—মুখ্যত তা সংস্কৃতি-মূলক, বিশেষ করে সাহিত্য-বিষয়ক কাগজ । কিন্তু মুস্কিল হয়েছে এই যে, লেখক তর্কটা তুলে তারপরে বলেছেন, 'থাক্ ।' আমিও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করে বলছি—'ইংরেজী সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে' হাত-মেলানো জনযুদ্ধবাদীদের কাজও নয়, উদ্দেশ্যও নয় । ফ্যাসিজম ও সাম্রাজ্যবাদের অবসানের জন্যই তাঁদের কার্যক্রম, দুনিয়ার জনশক্তির সঙ্গে হাত মিলানোই তাঁদের চেষ্টা । আর 'জনযুদ্ধ', বা Peoples' War মানেই পৃথিবীর সর্বত্র এবং তখন তখনই জনতার মুক্তি বা Peoples' Victory সুসম্পূর্ণ হয়েছে,—তা নয় । 'জনযুদ্ধ'-এর অর্থ বরং এই যে, সেই মুক্তির সুযোগ এসেছে, জনগণ ঠিকমত যুদ্ধ চালালে তবেই মুক্তি সম্ভব হবে । কিন্তু—এখন বলি—এ তর্ক থাক্ !

গোপাল হালদার

হে চির সমুন্নত লৌহ-পাষাণ.
স্তম্ভিত গান,
ভাস্বর চেতনায় রুদ্র-মহান্
অতিকায় প্রাণ !
অবারিত নাগরিক পদসঞ্চার
অয়স্কান্তে দৃঢ় এপার ওপার
কব্জা-কীলক-প্যাঁচে গ্রন্থী অপার !
নানা ঋজু বক্র,
তির্য্যক ও চক্র
স্বর-ঝঙ্কার,
নিরেট কঠিন নব ঋতু-সংহার।

সুতীক্ষ্ণ-কান্তির প্রতিবিম্ব
কবে চিন্‌বো ?
ক্ষিতিজ খনিত্রের
বিপুল বহিত্রের—
প্রগতি-চরিত্রের—
প্রাণ-বিম্ব !
নব নব বিস্ময়ে উজ্জ্বল প্রাণ,
চির উদ্দাম !
স্তম্ভিত কায়া তুমি সেতুবন্ধের
অনাগত অপরূপ প্রাণছন্দের
অভিনন্দিত কর কৃষি-বিজ্ঞান
চির-দুঃসাহসিক অতিকায় প্রাণ।

স্পর্দ্ধিত কী বিশাল বজ্রপাণি
ইস্পাতী ছন্দের দৈববাণী
জীবন্ত সমাজের হে সন্ধানী
স্তব্ধ মুখর !
আসে ঐ দ্রুতগতি গণ-মহাকাল
স্তব্ধ তরঙ্গ হে চির উত্তাল
হাতে তব বিপ্লবী রক্তমশাল
রোমাঞ্চকর !

লৌহ-মুকুটে কাঁপে সৌর-শিখা
বিজয় টীকা !
পদতলে ভাগীরথী জল কল্লোল
পতিতোদ্ধারিণীর চিত উতরোল
গুম্ গুম্ পাখোয়াজ যন্ত্রের বোল্,
উন্নত চেতনায় গুম্‌গুম্ গম্ভীর—
গাঙ্গেয় মৃত্তিকা লিপ্ত,
উদ্ধত মহিমায় বিংশ-শতাব্দীর—
দ্রুতগামী প্রজ্ঞায় দীপ্ত !

বিমলচন্দ্র ঘোষ

খবর

খবর আসে!
দিগ্‌দিগন্ত থেকে বিদ্যুৎবাহিনী খবর ;
যুদ্ধ, বিদ্রোহ, বন্যা, দুর্ভিক্ষ, ঝড়—
—এখানে সাংবাদিকতার নৈশ নৈঃশব্দ্য।
রাত গভীর হয় যন্ত্রের ঝংকৃত ছন্দে—প্রকাশের ব্যগ্রতায় ;
তোমাদের জীবনে যখন নিদ্রাভিভূত মধ্যরাত্রি
চোখে স্বপ্ন আর ঘরে অন্ধকার।
অতল, অদৃশ্য কথার সমুদ্র থেকে নিঃশব্দ শব্দেরা উঠে আসে ;
অভ্যস্ত হাতে খবর সাজাই—
ভাষা থেকে ভাষান্তর করতে কখনো চমকে উঠি,
দেখি যুগ থেকে যুগান্তর।
কখনো হাত কেঁপে ওঠে খবর দিতে,
বাইশে শ্রাবণ, বাইশে জুনে।

তোমাদের ঘুমের অন্ধকার পথ বেয়ে
খবর-পরীরা এখানে আসে তোমাদের আগে,
তাদের পেয়ে কখনো কণ্ঠে নামে ব্যথা, কখনো বা আসে গান ;
সকালে দিনের আলোয় যখন তোমাদের কাছে তারা পৌঁছয়
তখন আমাদের চোখে তাদের ডানা ঝরে গেছে।
তোমরা খবর পাও,
শুধু খবর রাখো না কারো বিনিদ্র চোখ আর উৎকর্ণ কানের!
ঐ কম্পোজিটর কি চমকে ওঠে নিখুঁত যান্ত্রিকতার কোনো ফাঁকে?
পুরোনো ভাঙা চশমায় ঝাপসা মনে হয় পৃথিবী—
৯ই আগষ্টে, কি আসাম সীমান্ত আক্রমণে?

জ্বলে ওঠে কি স্তালিনগ্রাদের প্রতিরোধে, মহাত্মাজীর মুক্তিতে,
প্যারিসের অভ্যুত্থানে ?
দুঃসংবাদকে মনে হয় না কী
কালো অক্ষরের পরিচ্ছদে শোকযাত্রা ?
যে খবর প্রাণের পক্ষপাতিত্বে অভিষিক্ত
আত্মপ্রকাশ করে না কি বড়ো হরফের সম্মানে ?
এ প্রশ্ন অব্যক্ত অনুচ্চারিত থাকে
ভোরবেলাকার কাগজের পরিচ্ছন্ন ভাঁজে ভাঁজে।

শুধু আমারা দৈনন্দিন ইতিহাস লিখি !
তবু ইতিহাস মনে রাখবে না আমাদের—
কে আর মনে রাখে নবান্নের দিনে কাটা ধানের গুচ্ছকে ?
কিন্তু মনে রেখো তোমাদের আগেই আমরা খবর পাই
মধ্যরাত্রির অন্ধকারে
তোমাদের তন্দ্রার অগোচরেও।
তাই তোমাদের আগেই খবর-পরীরা এসেছে আমাদের চেতনার পথ বেয়ে
আমার হৃদ্‌যন্ত্রে ঘা লেগে বেজে উঠেছে কয়েকটি কথায়
'পৃথিবী মুক্ত—জনগণ চূড়ান্ত সংগ্রামে জয়ী'।
তোমাদের ঘরে আজো অন্ধকার, চোখে আজো স্বপ্ন ;
কিন্তু জানি একদিন সে সকালে আসবেই
যেদিন এই খবর পাবে প্রত্যেকের চোখেমুখে
সকালের আলোয়, ঘাসে ঘাসে, পাতায় পাতায়।
আজ তোমরা এখনো ঘুমে ॥

সুকান্ত ভট্টাচার্য

শরৎচন্দ্র ও বাঙালী সমাজ

সাহিত্যে আকস্মিক ব্যাপার অনেক সময় ঘটে। বাঙলা সাহিত্যের সর্বাপেক্ষা বড় আকস্মিক ব্যাপার বোধ হয় শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব। হঠাৎ কোথা হইতে যে তিনি উদিত হইলেন তাহা যেন কেহই ভাবিয়া পাইল না। অবশ্য অনেকে আজ বলিতে চেষ্টা করেন—শরৎচন্দ্রের আবির্ভাব তেমন আকস্মিক নয়। 'কুন্তলীন পুরস্কারের' প্রতিদ্বন্দ্বিতায় তিনি আগেই স্থান করিয়া লইয়াছিলেন, তাঁহার কোনো কোনো গল্প ও উপন্যাসও তিনি আগেই বসিয়া লিখিতেছিলেন। এ সবই হয়ত সত্য কথা। কিন্তু তাহাতে এই সত্যটা অপ্রমাণিত হয় না যে, শরৎচন্দ্র যেদিন বাঙলা সাহিত্যক্ষেত্রে আবির্ভূত হইলেন, সেদিন সাহিত্যিক সমাজে কেহই তাঁহার আবির্ভাবের জন্য প্রস্তুত ছিলেন না। মনে হইয়াছিল, তাঁহার উদয় অপ্রত্যাশিত ও আকস্মিক। সত্য কথা বলিতে গেলে মানিতে হয়, শরৎচন্দ্রকে সাহিত্যিক সমাজ প্রথম সংবর্ধনা জানান নাই, তাঁহাকে প্রথম গ্রহণ করিয়াছিল বাঙালী পাঠক-সমাজ। তখনকার দিনের সাহিত্যিকরা প্রথম দিকটায় ভাবিয়া পান নাই—তাঁহাকে লইয়া কি করা যায়। ততক্ষণে পাঠক-সাধারণ তাঁহাকে সমস্ত প্রাণ দিয়া স্বাগত করিতে অগ্রসর হইয়া গিয়াছে। তাহার পরে সাহিত্যিকদের আর করিবার ছিল কি? শরৎচন্দ্রকে স্বীকার করিয়া লইতে হইয়াছে। তারপরে তাঁহাকে লইয়া গৌরব করিতেও সাহিত্যিক সমাজের দ্বিধা রহিল না। কিন্তু তবু কথাটা সত্য—শরৎচন্দ্রের অবির্ভাব ছিল তাঁহাদের নিকট অপ্রত্যাশিত, এবং সকলের নিকটই আকস্মিক।

শরৎচন্দ্রকে যে বাঙালী পাঠক-সমাজ এত সহজে গ্রহণ করিতে পারিল—আর বাঙালী সাহিত্যিক সমাজ তাঁহাকে লইয়া প্রথমে বিপদে পড়িলেন, ইহার পিছনেও কারণ ছিল। আর তাহা বুঝিবার মত। শরৎচন্দ্র উপস্থিত হইলেন তাঁহার আশ্চর্য সৃষ্টিশক্তির প্রমাণ লইয়া। এই প্রমাণকে অগ্রাহ্য করা অসম্ভব। ইহা একবারেই স্বীকৃতি আদায় করিয়া লয়! পাঠক এক মুহূর্তে মানেন—এইতো মানুষ, আমাদের মত মানুষ, হাসি-কান্না, সবলতা-দুর্বলতা, সত্য-মিথ্যা, সব লইয়া আমাদেরই আত্মীয়, আমাদেরই বন্ধু, 'জায়া পুত্র পরিবার,'—তাহারাই সকলে যেন শরৎচন্দ্রের গ্রন্থের পাতা হইতে কথা কহিয়া উঠিল। এমন জীবন্ত মানুষকে, এমন জীবন্ত চিত্রকে, স্বীকার না করিয়া উপায় আছে?

কিন্তু পাঠক-সাধাবণ যত সহজে শরৎচন্দ্রকে স্বীকাব কবিয়া লইল সাহিত্যিক সমাজ তত সহজে তাঁহাকে স্বীকাব করিতে পাবিলেন না কেন? সৃষ্টিব অমোঘ স্বাক্ষব তাঁহাবাও নিশ্চয় দেখিতে পাইযাছিলেন। কিন্তু বাধা পাইতেছিলেন কোথায়? সেই কথাটিই বুঝিবাব মত।

যে কাবণে তখনকার বাঙালী সাহিত্যিক-সমাজেব পক্ষে শবৎচন্দ্রকে প্রথমেই অকুণ্ঠিত চিত্তে গ্রহণ সম্ভব হয় নাই, সেই কাবণেই আবাব তখনকাব বাঙালী পাঠক-সাধাবণেব পক্ষে শবৎচন্দ্রকে সমস্ত প্রাণ দিয়া গ্রহণ সম্ভব হইয়াছে। এই কথাটা হইতেই পবিষ্কাব—তখনকাব বাঙালী পাঠক-সমাজ ও তখনকাব বাঙালী সাহিত্যিক সমাজেব মধ্যে একটা ছেদ পডিয়া গিযাছিল। সাধাবণ পাঠক বাঙালী মধ্যবিত্ত সমাজেব লোক—তখনো তাহাই ছিলেন, আজও তাহাই আছেন। বলিতে পাবি, সাধারণ পাঠক আসলে বাঙালার নিম্ন-মধ্যবিত্ত সামাজেব লোক। সাহিত্যিকেরাও সাধাবণভাবে মধ্যবিত্ত সমাজেবই লোক। উভয়েই কম বেশি ইংবেজ আমলেব ও ইংবেজি শিক্ষা দীক্ষাব ফল। কিন্তু বাঙালী পাঠক-সাধাবণ পুবাতন সমাজ ও পুবাতন জীবন-যাত্রাকে অনেকটা মোহ ও মায়ার দৃষ্টিতে দেখিতেন। কার্যক্ষেত্রে তাঁহাবাও অবশ্য ইংবেজি আমল ও একালেব ধনতন্ত্রেব আদর্শকে মানিয়াই চলিতেন। কিন্তু পুবাতন সমাজকে নিজেবা ভাঙিয়া গডিবার সুযোগ আমবা স্বাভাবিক ভাবে পাই নাই। আমাদেব প্রাচীন সমাজ ও জীবন-যাত্রাকে প্রবল আঘাতে ভাঙিয়া ফেলিতেছিল বহিরাগত পাশ্চাত্য জীবন-যাত্রা;—উহাই ধনিকতন্ত্র ও সাম্রাজ্যবাদেব প্রকাশ। তাই, আমবা নূতন জীবন-যাত্রাকে মোটেই স্বচ্ছন্দ চিত্তে স্বীকাব কবিতে প্রস্তুত ছিলাম না। ববং এই কাবণে পুবাতন জীর্ণ জীবন-যাত্রাকেই অনেক মিথ্যা মোহ দিয়া বড় কবিয়া দেখিতে চাহিতাম। সাম্রাজ্যবাদেব অস্বাভাবিক আবহাওয়ায় এমনিতব ভুল ঘটাই স্বাভাবিক। অথচ আমবা ইংবেজি শাসন ও ইংবেজি শিক্ষাদীক্ষাব মারফতে ধনিকতন্ত্রের ব্যাপকতব আদর্শ ও গভীবতব সত্যেব সম্বন্ধেও সচেতন হইতেছিলাম। না হইয়া উপায় ছিল না—মিল্ পডিযাছি, বেন্থাম পডিয়াছি, কোঁৎ পডিয়াছি; ফবাসী বিপ্লবেব মুক্তিবাণীও আমাদেব হৃদয়কে স্পর্শ কবিয়াছে। একপ স্থলে 'মানুষেব অধিকাব',—স্বাদেশিকতা, গণতন্ত্র, ব্যক্তি-স্বাধীনতা,—এই সব সত্যেবও মূল্য বুঝিতেছিলাম। কিন্তু তথাপি আমাদেব পুবাতন সমাজেব টান ও কাটাইয়া উঠিতে পাবিতে-ছিলাম না। এমন কি আমাদেব নূতন স্বাদেশিকতা ও জাতীয় মর্যাদাবোধও সেই পুরাতনকেই সময়ে সময়ে মোহেব আববণে ঘিবিয়া মোহন ও বড কবিয়া তুলিতে চাহিতেছিল।

বাঙালা দেশের স্বদেশী আন্দোলনও উহার দৃষ্টান্ত। সে আন্দোলনের একটা দিকে ছিল যেমন স্বদেশী শিল্প গড়া, মানে দেশীয় ধনতন্ত্রের গঠনের চেষ্টা ; আর একটা দিকে ছিল তেমনি পুরাতনের পুনঃ প্রবর্তন, 'হিন্দু জাতীয়তা' গড়া, পুরাতন সামন্ততন্ত্রের জীবনাদর্শকে টিকাইয়া রাখা। সাধারণ পাঠকও এই দোটানার মধ্যে পড়িয়াছিলেন,— তাঁহার মনের একটা অংশে অনেক মায়া, অনেক মোহ-জমিয়া ছিল তাঁহার পুরাতন সমাজের জন্য। কিন্তু তখনকার বাঙালী সাহিত্যিকবৃন্দ এই পুরাতনের মোহ হইতে অনেকটা মুক্ত ছিলেন। তাঁহারা ছিলেন নূতন জীবনযাত্রার পক্ষপাতী—ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রধান উদ্গাতা। সমস্ত লেখকই আসলে এই পক্ষে থাকিবার কথা—ইহাই ছিল 'প্রগতির পথ'। গত শতাব্দীতে এই প্রগতির ধারার নাম ছিল 'সংস্কারের' বা 'রিফর্মের' আন্দোলন। কিন্তু এই 'সংস্কার' চেষ্টাটা সাম্রাজ্যবাদের জন্য স্বাভাবিক ভাবে আমাদের লাভ হইল না ; স্বাভাবিক ভাবে আসিলে উহা আসিত সমাজ-বিপ্লবের চেষ্টা রূপে। এখন আসিয়াছিল সাম্রাজ্যবাদের ছাড়-পত্র লইয়া একটা 'সংস্কার আন্দোলন' বা 'রিফর্ম ম্যুভ্মেণ্ট' রূপে। এই জন্যই উহা শিক্ষিত-সাধারণের নিকটেও অনেক সময়ে ঠেকিয়াছিল 'বিলাতিয়ানা' বলিয়া। তাই, বঙ্কিম এই 'সংস্কার' আন্দোলনকে ব্যঙ্গ করিয়াছেন, বিবেকানন্দও তাহাকে বড় সমর্থন করেন নাই। কিন্তু কথাটা এই—উহার মুখ ছিল জীবন্ত কালের দিকে। রবীন্দ্রনাথের মত বিরাট প্রতিভার সমস্ত সৃষ্টি এই জীবন্ত কালের দিকেই বাঙালী পাঠককে আগাইয়া দিতে চাহিতেছিল। পাঠক-সাধারণ অবশ্য তাহাতে অগ্রসর হইতে বাধ্য হইতেছিল—কারণ, সৃষ্টির তাগিদ সে দিকে, কালের গতি সেদিকে। কিন্তু পুরাতনের মোহও তাহাদের রহিয়া গিয়াছে। বরং রবীন্দ্রনাথের সার্থকতা এবং তখনকার সংস্কারক দলের এই সক্রিয়তা ও প্রাধান্য পাঠকের মনের একটি কোণে এক বিক্ষোভ ও বিরোধিতারই সৃষ্টি করিতেছিল। সেই বিরোধের আবেগটুকুকে প্রকাশ করিবার চেষ্টা অবশ্য রক্ষণশীল কেহ কেহ সাহিত্যক্ষেত্রেও করিতেছিলেন। কিন্তু রক্ষণশীলেরা একে চলিয়াছিলেন মূলত সৃষ্টি-গতির বিপক্ষে ; দ্বিতীয়ত, তাঁহাদের সাহিত্য সৃষ্টিরও তেমন শক্তি ছিল না। কাজেই বাঙালী পাঠক-সাধারণের, মানে বাঙলার নিম্ন-মধ্যবিত্ত ভদ্রলোকদের মনের একটি কোণে যে এক ন্যায্য-অন্যায্য বেদনা ও বিক্ষোভ জমিয়া উঠিতেছিল, তাহা কোথাও রূপ পাইতেছিল না। বরং রবীন্দ্রনাথের অনুগত সাহিত্যিক-সমাজ যতটা পুরাতন সমাজকে 'সংস্কার' করিবার জন্য উদ্যত ততটা সাহিত্য সৃষ্টিতে সক্ষম ছিলেন না ; সে সমাজকে রবীন্দ্রনাথও যতটা আপনার বলিয়া জানিতেন ততটুকু আপনার বলিয়া

মানিতেও তাঁহারা প্রস্তুত ছিলেন না। সে দিনে তাঁহারাই ছিলেন 'হাই-ব্রো।' অর্থাৎ মোটামুটি বলিতে পারি—বাঙালা সাহিত্যক্ষেত্রে তখন সংস্কারবাদীর প্রাধান্য, অথচ সেই সংস্কারবাদীরা ততটা সৃষ্টিতে সার্থক নন ;—আর বাঙালী পাঠক-সমাজে তখনো পুরাতনের সমাজের জন্য মোহ ও মমতা রহিয়া গিয়াছে।

শরৎচন্দ্রের উদয় হইল এমনিতর বাঙালী সমাজে। তাহার প্রথম দান—'বিন্দুর ছেলে', 'রামের সুমতি', 'বিরাজ বউ', 'বড দিদি'র মত সৃষ্টি। এক নিমেষে বাঙালী পাঠক-সমাজ দেখিলেন—এ সৃষ্টিতে মানুষই শুধু জীবন্ত হয় নাই, একেবারে তাঁহাদেরই আপনার মানুষ জীবন্ত হইয়া উঠিয়াছে। পুরাতন সমাজেরও পিছনে তো একটা করুণ মানবীয় সত্য ছিল, সাধারণ বাঙালীরা তাহা হৃদয়ে হৃদয়ে অনুভব করিতেছিলেন, প্রকাশ করিতে পারিতেছিলেন না ;—শরৎচন্দ্র যেন সেই সত্যটিকেই একেবারে সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিলেন। এই তো বিন্দু—তাহার আপন সন্তান নাই। আধুনিক কালের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের হিসাব লইলে তাহার মাতৃত্বের পরিতৃপ্তির পথ কোথায় ? বড জোর কোনো 'অনাথাশ্রমে,' কোনো 'সি-এস্-পি-সি'-এর প্রতিষ্ঠানে। কিন্তু আমাদের অতি-পচা সামন্ত-সমাজের অতি-পচা একান্নবর্তী পরিবারে তো তাহার মাতৃ-হৃদয়ের পরিতৃপ্তির একটা পথ ছিল। আর শুধু কি পরিতৃপ্তির পথ ছিল ? সেখানে সন্তানহীনা বিন্দুরও মা হিসাবে দাবী আছে, দায়িত্ব আছে ; এমন কি মা হিসাবেই অধিকারও পর্যন্ত আছে। ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের অর্থ তো ধনিকতন্ত্রের রাজত্ব ; মানে, ধনিকের ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্য, শতকরা পঁচানব্বুই জনের ব্যক্তিত্বের খর্বতা—এই কথা হয়ত তখনো আমরা বুঝি নাই। কিন্তু তেমনি তখনো বুঝিতেছিলাম পুরাতন সামন্ত-সমাজে, একান্নবর্তী আমাদের নিম্ন-মধ্যবিত্ত পরিবারে, সবই কেবল ভুল আর অন্যায় ছিল না—সেই জীবনের স্বপক্ষেও দুই একটি কথা বলিবার আছে। যে সেই সমাজ সত্যই দেখিয়াছে, সে তাহাও মর্মে মর্মে জানে। যে সেই সমাজেরই একজন—আমাদেরই একজন—সে-ই তাহা প্রকাশও করিতে পারিবে।

শরৎচন্দ্রের উদয় হইল। আমরা নিম্ন-মধ্যবিত্ত বাঙালী,—বাঙালী "পাঠক-সাধারণ", Common Reader,—এক নিমিষে আমরা বুঝিলাম—নূতন স্রষ্টার আবির্ভাব হইয়াছে, আর সেই নূতন স্রষ্টা আমাদেরই আপনার লোক। বাঙালী সাহিত্যিক বৃন্দের হয়ত ললাটে ভ্রূকুটি দেখা দিয়াছিল—নূতন সৃষ্টির এই অভ্রান্ত পরিচয়ে তাঁহাদের প্রাণেও আনন্দ সঞ্চারের কথা। তাহা সঞ্চার হইয়া থাকিলেও সেই

ভ্রূকুটিকে তখন মুছিয়া দেয় নাই, সেই ললাটকে তখন উদ্ভাসিত করিতে পারে নাই।

শরৎচন্দ্রের প্রথম আবির্ভাবে এই জন্যই বাঙালী সাধারণ পাঠক এতটা উল্লসিত হইয়া উঠেন। যে কথাটি বলিবার ছিল, সে কথাটি বলা হইল। শরৎচন্দ্র প্রথম উপস্থিত হইলেন এই কথাটি বলিয়া—না, এ পচধরা বাঙালী সমাজেও মানুষ আছে; সুখ আছে, দুঃখ আছে, ক্ষতি আছে, বেদনা আছে, কিন্তু মানুষও তবু এইখানে ঠাই পায়, ফুটিয়া উঠিতে পারে। 'হালদার গোষ্ঠীর' বনোয়ারী লাল সামন্ত-জীবনের কাঠামো ভাঙিয়া না বাহির হইলে ফুটিতেই পারে না। কিন্তু 'নিষ্কৃতির' মুখুজ্জে পরিবারের মানুষগুলি সকলকে জড়াইয়া থাকিয়াও মানুষ হইয়া উঠে—এ কি কম সত্য ?

কিন্তু ইহাও অর্ধসত্য। আর তাহা আমরাও জানিতাম, শরৎচন্দ্রও জানিতেন। যেই কথাটি আমাদের প্রাচীন সমাজের স্বপক্ষে বলিবার ছিল তাহা বলা শেষ হইতে না হইতেই শরৎচন্দ্রের ঘোষণা-বাণী জ্বলন্ত অক্ষরে বাহির হইয়া আসিল। কিন্তু তখনো 'সংস্কারকের' বাঁধা-বুলিতে প্রাচীন সমাজকে তিনি আঘাত করিলেন না—বিপ্লবীর মতই তিনি দুর্বার শক্তিতে আঘাত করিলেন। 'পল্লী-সমাজ,' 'অরক্ষণীয়া,' 'চরিত্রহীন,' 'দেবদাস,' 'শ্রীকান্ত' হইতে একেবারে 'গৃহদাহ' পর্যন্ত বলিতে পারি শরৎচন্দ্রের এই স্পর্দ্ধিত বিদ্রোহের ধারাই পরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এই সময়ের মধ্যেই রবীন্দ্রনাথও তাঁহার নূতন গল্পে ('গল্প সপ্তক') লেখায়, ও শ্রীযুক্ত প্রমথ চৌধুরী তাঁহার 'সবুজপত্রে' বাঙালী জীবনে ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের স্বপক্ষে চরম প্রচার চালাইতেছিলেন। কিন্তু সে প্রচার আমাদের সাধারণ পাঠকদের যতটুকু স্পর্শ করুক না করুক শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিকে আমরা সম্পূর্ণ অভিনন্দন করিতেছিলাম। তাহার কারণ কি ? প্রধান কারণ, উহা সৃষ্টি, মানুষের স্বীকৃতি উহা আদায় করিবেই—সেই জীবন্ত নব-নারীকে আমরা ঠেকাইয়া রাখিব কি করিয়া ? দ্বিতীয় কারণ, সত্যই আমরা যতই পুরাতন সমাজের প্রতি মমতা পোষণ করি না কেন, আমরাই বেশি করিয়া জানি উহা কত পচধরা, কত ঘুণধরা কত মিথ্যা। আধুনিক কালকে আমরাও কার্যত বা চিন্তায় একেবারে দূরে ঠেকাইয়া রাখিতে চাহি নাই। আমরাও বুঝিতেছিলাম —তাহা অচলায়তন; আমরাও চাহিতেছিলাম 'মানুষের অধিকার', মানুষের মানুষ হিসাবেই মর্যাদা লাভ। মানে, নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজও আসলে বুঝিয়াছিল পুরাতন সমাজের অসামঞ্জস্য—যতই সে বলিতে চাহুক যে সে-পুরাতন সমাজেও মানুষের বিকাশের অবকাশ ছিল। সেই কথাটি বলা হইলেই তাহার আপত্তি চুকিয়া গেল।

তাহার পরেই সেই দাবী করে—কিন্তু এই প্রাচীন সমাজের অসামঞ্জস্যে আমার যে দম বন্ধ হইয়া আসিতেছে, তাহা কি বলিবে না ? ইহাই তো মূল সত্য। শরৎচন্দ্র তাহা বলিতে অগ্রসর হইলে সাধারণ পাঠক যেন আরও নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। পুরাতন সমাজের যেরূপ নীতি আর বিন্যাস তাহাতে মানুষ টিকিবে কি করিয়া ? তাহার ছাঁচে ঢালা সমাজে ছাঁচের মতই গড়িয়া উঠিতে হইবে। বিজলী কোথাকার নর্তকী, সে আবার বদলাইবে কি করিয়া ? চন্দ্রমুখী পতিতা, সে পতিতাই থাকিবে। পিয়ারী সে আবার রাজলক্ষ্মী হইবে কোন অধিকারে ? সাবিত্রী মেসের ঝি, সে-ও আবার ভালোবাসিবার দাবী করে নাকি ? অভয়ার স্বামী বেদমন্ত্রের শক্তিকে অগ্রাহ্য করিল বলিয়াই কি অভয়ার পক্ষেও সেই পবিত্র বিবাহবন্ধন শিথিল হইয়া যাইবে ? পুরুষকে অবশ্য এই সমাজ কার্যত খানিকটা স্বাধীনতা দেয়। কিন্তু তবু তাহার আদর্শে দেবদাস, শ্রীকান্ত, সতীশ, দিবাকর—ইহারা কে উৎরাইতে পারে ?

কিন্তু কথা এই—সেই প্রাচীন জীবনযাত্রা ও জীবনাদর্শের উপর এমন আঘাত 'সংস্কার পন্থীরা'ও করিতে পারেন নাই, তবু নিম্ন-মধ্যবিত্ত সমাজ তাহাদেরও সহ্য করিতে চাহে নাই। শরৎচন্দ্রের এই বিদ্রোহকে সেই সমাজ স্বাগত করিল কি করিয়া ? ইহার দুইটি কারণ পূর্বে বলিয়াছি—এক শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিশক্তি; দুই, মূলত নিম্ন-মধ্যবিত্তেরও এই বিদ্রোহেচ্ছা ব্যক্তি-স্বাতন্ত্র্যের প্রয়োজন বোধ, ব্যক্তির মর্যাদাবোধ। কিন্তু আরও কারণ ছিল—তাহারও ইঙ্গিত পূর্বে করা হইয়াছে—উহা শরৎচন্দ্রের সহিত এই নিম্নমধ্যবিত্ত সমাজের বা সাধারণ পাঠকের সম্বন্ধের কথা ; আর উহাই শরৎচন্দ্রের নিজের দৃষ্টিক্ষেত্রের কথা, তাঁহার দৃষ্টি-বৈশিষ্ট্যের কথা। শরৎচন্দ্রের উপস্থিতিমাত্র আমাদের মনে হইল—আমরা আত্মীয়ের মুখ দেখিলাম, ইনি 'হাই-ব্রো' বা 'সংস্কারক' জাতীয় সাহিত্যিক নন,—যাঁহারা আমাদের সমাজকে নিজের বলিয়া বলিতে লজ্জা পান, ইনি তাঁহাদের কেহ নন। এই সমাজেরই তিনি একজন, তিনি তাহা প্রাণ দিয়া স্বীকার করেন, আর প্রাণ মিশাইয়া আমাদের ভালবাসেন ; আমাদের প্রাণও তাই জয় করিয়া লন। মানুষের হৃদয় জয় করিবার এই অস্ত্র লইয়া শরৎচন্দ্র উদিত হইয়াছিলেন, আর তাই তাহার এই সমাজকে ভাঙিবার অধিকার,—আপন সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহের অধিকার—অস্বীকার করিবে কে ? বরং অস্বীকার যাহারা করিতে চাহিল, আমরা সাধারণ পাঠকেরা তাহাদেরই অস্বীকার করিরা ফেলিলাম। এই সব পতিতা স্ত্রীলোক আর চরিত্রহীন পুরুষ লইয়া সাহিত্যক্ষেত্রে শরৎবাবুর বাড়াবাড়ি যে সুনীতির পরিচায়ক নয়, সুরুচিরও

পরিচায়ক নয়—ইহা বলিবার লোকের অভাব হয় নাই। এ বিষয়ে 'রক্ষণশীল' কর্তৃপক্ষ, আর 'সংস্কারপন্থী' কর্তৃপক্ষ ছিলেন একমত—সকল দলের কর্তৃপক্ষের চক্ষেই বিদ্রোহ একটা অশুভ, তাই অশোভন, ব্যাপার। কিন্তু আমরা তাহাদের কথায় কান দিলাম না। শরৎচন্দ্র বলিতেছিলেন—এই পতিতা, আর চরিত্রহীন, ইহারা সাহিত্যক্ষেত্রে অস্পৃশ্য হইবে কেন? ইহাদের সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার আছে, কারণ ইহারা সমাজের মানুষ, জীবনপ্রবাহে সঞ্চরণশীল 'চরিত্র', জীবন-সংগ্রামে আহত, রক্তাক্ত ক্ষতবিক্ষত মানুষ, ক্রুশবদ্ধ মানুষ, আর সবার উপরে 'মানুষ'—সত্য-মিথ্যা, ভুল-ভ্রান্তি, বেদনা-আনন্দ ভরা মানুষ। 'মানুষ'—তাঁহার হৃদয়ের সমস্ত প্রেম দিয়া তিনি যেন এই কথাটাই স্বীকার করিতে চাহিলেন—ইহারা মানুষ। বলিতে চাহিলেন সেই অতি পুরাতন কথা—

'শুনহ মানুষ ভাই'
সবার উপরে মানুষ সত্য
তাহার উপরে নাই।'

এইটিই শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিক্ষেত্র—এবং তাঁহার এই প্রেমময় দৃষ্টিকেই বলিতে পারি তাঁহার দৃষ্টির বৈশিষ্ট্য। 'মানুষের অধিকার' তিনিও ঘোষণা করিলেন, কিন্তু তাহা পুঁথি পড়িয়া নয়, বুদ্ধি দিয়া বিচার করিয়াও নয়। 'ব্যক্তি-সত্তার' স্বপক্ষে তিনি বিদ্রোহ ঘোষণা করিলেন; কারণ তিনি হৃদয় দিয়া মানুষকে চিনিয়াছিলেন, বুঝিয়াছিলেন তাহার মানুষ হিসাবে মহিমা, বুঝিয়াছিলেন তাহার মানুষ হিসাবে বেদনা। শরৎচন্দ্র যে পুঁথি পড়িয়াও ইহা না জানিতে পারিতেন তাহা নয়,—'নারীর মূল্যের' কথা মনে রাখিলেই বুঝিব সেদিক দিয়াও তাঁহার বিচার সামর্থ্য ছিল। কিন্তু তিনি আপনার স্বাভাবিক প্রেমের বলে, মানবতা-বোধের বিকাশেই মানুষের এই রূপ উপলব্ধি করিয়া বসিয়াছিলেন,—এই কথা বলাই বোধ হয় আরও ঠিক হইবে।

গোপাল হালদার

নুকসান

বাড়ি ফিরিতেই সুরমা বলিল, ছ্যাখো এসে, তোমার বিদেশীয়া তো চলেছে—

চলেছে ? কোথায় ?

কোথায় আবার ? দেশে।

বিদেশীয়া দেশে যাইবে আবাব কোথায় ? অন্য সময় হইলে মনে করিতাম, সুরমা বুঝি পরিহাস করিতেছে। কিন্তু সুবমাব মুখ দেখিয়া বুঝিলাম—সুরমা বিব্রত বোধ কবিতেছে, দুর্ভাবনায় পড়িয়াছে। আর আমি ? আমি বসিকতা কবিব কি ? আমাবই কি ভাবনা কম ? সবে দুই একটি রোগী দেখিয়া বাড়ি ফিরিয়াছি। রোগী দেখিব কি ? দেখিয়াছি কলিকাতাব পথেব যাত্রী। আব বোগীই কি আজ বোগী আছে ? উঠিয়া বসিয়াছে। বলে, ডাক্তাববাবু, কি বলেন, যেতে পাবব না ?—একটু জ্বব আছে, শরীবটা দুর্বল ; তবু চলেই যাই। হাওয়া বদলও তো হবে—এখানে থেকে আব সারব কি ? বোমাতেই মরতে হবে।

এক কথাই সর্বত্র—থাকিলে বোমাতেই মবিতে হইবে। এই বড দিন হইতে "নিউ ইয়ার্স ডে'ব মধ্যেই জাপানীবা কলিকাতা শহবকে ভূমিসাৎ কবিয়া দিবে। দিবে না কেন ? তাহাদেব দোষ কি ? এতবাব আমাদেব সাবধান করিয়াছে—কলিকাতা ছাড়িয়া যাও। আমবা তাহা না শুনিলে তাহাবা কি চুপ করিয়া বসিয়া থাকিবে নাকি ?

সব জানি, সব বুঝি। কিন্তু যাই কি কবিয়া ? কালই বাত্রিতে সুবমাব সঙ্গে ইহা লইয়া কলহ কবিয়াছি। তখন 'অল-ক্লিয়াব' বাজিয়াছে। মুখে একটু একটু কবিয়া কথা ফুটিতেছে। বলিয়াছিলাম, তোমাব সুপ্রভা দি' কিন্তু ঠিকই বলেছিলেন।

সুবমা উত্তর দিল না। তেমনি ছেলে মেয়েদেব ঘুমাইবাব ব্যবস্থা কবিতে লাগিল।

আবাব বলিলাম, দেওঘবে তখন বাড়িটা ওদেব সঙ্গে নিলে হত।

কি হত ?

এখন যাবে কোথায় ?

যাব বলছে কে ?

হিসাব কবিয়াই কথা বলিয়াছিলাম—যুক্তি দেখাইতেছিলাম ; কিন্তু একটু পবেই চবম উত্তর পাইলাম, ঘুমোতে দাও এখন সকলকে।

বুঝিয়াছিলাম কলিকাতা ছাড়া হইবে না। নতুন করিয়া তাহা লইয়া সকাল বেলা আর কথা বাড়াইতে চাহি নাই। যাহা অদৃষ্টে আছে হইবে। শহরে বাহির হইতেই দেখিলাম—সকলেই ছুটিয়াছে। মনটা আবার মুস্‌ড়াইয়া গেল। গেলে ভাল হইত না? সুরমাকে বুঝানো যায় না একবার? বোধ হয় পথের এ দৃশ্য দেখিলে সে বুঝিত—কলকাতায় আর এখন থাকা ঠিক নয়।

তবু শুনিয়া আশ্চর্য হইলাম—বিদেশীয়া যাইতে চায়। বিদেশীয়া আমার পুরাতন চাকর। ইতিপূর্বেই বাঁধুনি বামুন রঘুনাথ কলিকাতা পরিত্যাগ করিয়াছে। বাড়ি তাহার তমলুকে। দূর বটে। কিন্তু কিইবা দূর? রঘুনাথ কালই চলিয়া গেল, শুনিল না। রাগ করিয়া বলিয়াছি—'মরোগে যাও।' জানিতাম সুরমার কষ্ট হইবে। তাহা হইলেও বিদেশীয়া আছে তো।

সেই বিদেশীয়া যাইতে চায়। বড় প্রমাদ গণিলাম—একটু বিস্মিত হইলাম। তাহার যে চাল-চুলা আছে, ঘর বাড়ি আছে, তাহাই কোনো দিন ভাবি নাই। সে আমার বাড়িরই প্রায় একজন।

ডাকিলাম, বিদেশীয়া।

উত্তর পাইলাম না। আর একবার ডাকিতে হইল। দুয়ারের সামনে আসিয়া দাঁড়াইল—পাঞ্জাবী গায়, মাথায় পাগড়ী জড়াইয়াছে—বিদেশীয়া। বিদেশ ভ্রমণে বহির্গত হইবার মত বেশই বটে। নিশ্চয়ই পুঁটলিও বাঁধা হইয়াছে, একটা লাঠিও যোগাড় করিয়া ফেলিয়াছে। পথে যাহাদের দেখিয়াছিলাম—দেখিলাম তাহাদেরই একজন।

বলিলাম। বিদেশীয়া কি ব্যাপার?

উত্তর নাই।

যেতে চাস নাকি?

ছোট্ট একটি কথা, হাঁ।

কেন?

বোমা গিরছে বাবু।

গিরছে; তাতে তোর-আমার কি?

আবার উত্তর নাই। কথাটা উড়াইয়া দেওয়া যায় না? হাসিয়া বলিলাম, যা, যা, কাজ কর গে।

বিদেশীয়া দাঁড়াইয়া রহিল। বলিলাম, কি দাঁড়িয়ে রইলি যে? কথা বলছিস্ না।

হজুব, আমি যাবে।

কোথায় ?

দেশ।

তোব দেশ আছে নাকি ? কোথায় তা ?

গয়া।

গয়া ? —আশ্চর্য মনে হইল, বিদেশীয়াব দেশ আছে। জিজ্ঞাসা কবিলাম, তোব নিজেব ঘব ?

হাঁ। হামাব বহিনেবই লেবকা তারা।

ওঃ ! এই তোব নিজের ঘব।—দুঃখেও হাসি পাইল। কিন্তু বিদেশীযার হাসি পাইল না, সে নড়িলও না। বুঝিলাম ব্যাপাবটা সত্যই জটিল। কহিলাম, যা, এখন কাজ করগে যা। এখানে এ বাড়িতে ভয় কি ? এতো হাওড়াও নয়, খিদিবপুবও নয়—চক্রবেড়ে বোড। এখানে বোমা পড়তেই পাবে না।

তবু বিদেশীয়া নড়িল না।

কহিলাম, আচ্ছা, দেশে গিয়ে তুই খাবি কি ?

এবার কথা ফুটিল।—সে ভগওয়ান দেখবেন—

'ভগওয়ান' দেখেন না যে। দেখলে কি আর ভাবনা ছিল বে। আমবাই কি তা হলে এখানে পড়ে থাকি ?

বিদেশীয়া এবাবও আমার কথার উত্তব দিল না। আবাব বলিলাম—দেশে আছে কি তোব ?

এবাব উত্তব আসিল, জান তো বাঁচবে।

এখানে থাক্‌লেই কি জান যাবে নাকি ? তা'হলে আমরা আছি কেন ?—একবাব সুরমাব দিকেও তাকাইলাম।

আপনাদের দেশ এখানে; থাকবেন। আমি থাকবে কেন ? আমাব নুফা কি ?

একটা পথ দেখিলাম যেন। বলিলাম, নুফা ?—ওঃ, তুই বেশী মাইনে চাস্‌ ! কত চাস্‌। একটা টাকা বাড়িয়ে দিচ্ছি। আট টাকা পাবি এখন থেকে।—বললাম সুরমার দিকে তাকাইয়া—আট টাকা দিয়ো ওকে। তাবপব বিদেশীয়াকে বললাম, নুফা তা হলে খুব চালাক। যা, কাজ করগে এখন।

কিন্তু বিদেশীয়া কাজে গেল না। দাঁড়াইয়া রহিল। আমাকেই বাহির হইতে হইল আবার কাজে। ঘণ্টা তিন পূবে ফিরিয়া দেখিলাম—বিদেশীয়া নাই। সুবমা বলিল—আশ্চর্য মানুষ! মাইনে চাইল, দিই নি তখনো—নিয়ে গেল না। বলেছি, 'রেলের টিকেট পাবি না। যাবি কি করে?' বলে, সবাই হেঁটে যাচ্ছে ওব দেশকা আদমি—ও চলেছে। ওদেব গাঁ গ্র্যাণ্ড ট্রাঙ্ক বোডেব উপরে। এদিকে কাজ সেবে আমি গেছি বান্না ঘরে—দেখি কেউ নেই। খুকী বললে, 'এই সামনে দিয়ে চলে গেল মা।' গেটের ওখানে বল্‌লে, 'খুকী বহিন্ আসি—মাকে বলো।' দেখাও করে গেল না আমাব সঙ্গে।—বলিল সুবমা।

নিজেও একটু বিস্মিত হইলাম। বিদেশীয়া ছেলেমেয়েদের ভালোবাসে, জানিতাম। পুবানো লোক। একটু ঢিলে স্বভাবেব,—হাটিয়া চলিল গয়া! আর সুবমাব সঙ্গেও দেখা করিল না। একবার বলিলাম, চাকব-বাকব নেই, এখানে থাকবে কি কবে—

আমবা পালাব আবার কোথায়? তীক্ষ্ণ উত্তব আসিল।

আমাব ড্রাইভার বাহাদুব বলিল, সাব্, ও মেড়ো বিহারী এমনি স্বভাবেব। সব পালাচ্ছে।—বাহাদুব হাসিতে লাগিল—সব মেড়ো পালাচ্ছে। বিদেশীয়ার ব্যাপাব সে আগেই লক্ষ্য করিয়াছিল—কোনমতে তাহাতে হাসি গোপন কবিতেছিল।

চট কবিয়া আমার মাথায় বুদ্ধি আসিল। বলিলাম একটু হাল্‌কা সুবে, বাহাদুব, তোমবাও পালাবে নাকি?

গুর্খা পালায় না, সাহেব।

বুদ্ধি খবচ করিয়া বলিলাম, বেশ, তাহলে আমার একজন গুর্খা চাই। তুমি আছ, আব একজন যদি থাকে—তোমবাও ভালো থাকতে পাব। মাইনে তুমি ঠিক কবো—আমি ঠকাতে চাই না।

বাহাদুব জুটাইয়া আনিল বিকালেই খড়গ্ সিংকে—পাহাড়ী আদমী, দার্জিলিং জেলাব লোক। নিশ্চিন্ত হইলাম। বুঝিলাম, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট কেন গুর্খাদেব উপর এতটা নির্ভর কবে।

কষ্ট হইল। কিন্তু সুবমাও হাব মানিল না। অবশ্য রাঁধুনি নাই। কিন্তু কয় দিন রাঁধুনি না থাকিলে চালাইতে পাবিবে না, সুবমা এমন নয়।

তারপব রাঁধুনিও মিলিয়া গেল। কয় বাত্রি ধরিয়া জাপানীরা আর কলিকাতা ধূলিসাৎ করিতে আসিতেছে না। নীলমণি হয়ত তাই টিকিয়া যাইবে।

কাজ চলিল। জাপানীরা প্রিং-এর হাতে মার খাইয়াছিল কি না কে জানে? হয়ত আমাদের উপরও তাহাদের মায়া হইয়াছিল। উলু খড়ের বিপদ বাড়াইয়া কি লাভ? তাহারা তখন আসিতেছে না। বরং হাওড়া ব্রিজ না ভাঙিয়া দিবার যাহা ফল তাহাই ফলিতেছে। কলিকাতায় আবার আসিতেছে মেড়ো আর উড়েরা।

চা শেষ না করিতেই সকাল বেলা শুভ সংবাদ আনিয়া দিল ইলা।

বাবা, বাবা, বিদেশীয়া—

বিদেশীয়া? কোথায়?

বাইরে; দুয়ারের সামনে বসে আছে!

সুষমার দিকে তাকাইলাম।—কখন এল?

জানি না তো। রাত্রিতে এসে থাকবে হয় ত।

মনে মনে একটা আত্মপ্রসাদ অনুভব করিলাম—তখনি বলেছিলাম, 'যাস্ নে।' ফিরে এল তো!

সুষমা স্মিতমুখে আর এক পেয়ালা চা লাগিবে কিনা জিজ্ঞাসা করিল। বলিতে লাগিলাম, বোমা যেন ওদের মাথায়ই পড়ত—খুব দামী মাথা কিনা—আমাদের মাথায় আর পড়ত না। মেড়োদের প্রাণের ভয় যে কি—

এইবার সুষমা কথা বলিল, শুধু মেড়োদেরই নাকি?

বুঝিলাম। তাই পাশ কাটাইয়া বলিলাম, না; রঘুনাথকেও দেখেছি, তবে ওরা মেদিনীপুরের লোক, উড়ের সামিল। কলকাতার ঠাকুর-চাকর ছোটলোকগুলো যেন তখন বোমা পড়তেই ক্ষেপে গেল—

সুষমা ছাড়িল না।—শুধু ছোটলোকরাই? বড় লোকরা নয়? দেওঘর, মধুপুর, যশিডিতে তা হলে বাড়ি পাচ্ছে না কেন লোকে আর? আর শুধু ঠাকুর-চাকররাই ক্ষেপে গেছল? ডাক্তাররা নয়? হাকিমেরা নয়?

বলিলাম, হাঁ, তা বলতে পার। কিন্তু ছেলেপুলেদের বিপজ্জনক এলেকায় রাখাটা তো ঠিক নয়।

সুষমা মৃদুহাস্যে বলিল, ওঃ!

বুঝাইতে লাগিলাম, লণ্ডনেও ছেলেপিলেদের রাখা হয় নাই। গোটা ইংলণ্ডের ছেলেপিলেদের কানাডায় পাঠানো হইয়াছে। আমাদের নিজেদের গবর্মেণ্ট নাই বলিয়া, না হইলে ছেলে-মেয়েদের এখানে এই বিপদে তখন রাখিত নাকি?

খুব যুক্তি আর ফ্যাক্ট দেখাইলাম। কিন্তু সুরমার মুখে হাসি লাগিয়া রহিল।

সেই হাসি মনে বিঁধিতেছিল। বাহির হইব, মোটরে উঠিব, এমন সময় কে আসিয়া সামনে দাঁড়াইল।

বিদেশীয়া।

চিনিতে একটু দেরী হইল। মাথা হয়ত দিন দুই আগে কামাইয়াছে। দাড়ি অন্তত সাত দিন কামায় নাই। কাজেই চুল অপেক্ষা দাড়িই এখন প্রধান। আর চোখ-মুখ সব বিষণ্ণ, দেহ অবসন্ন। যেন কত বছরের ঝড় বহিয়া গিয়াছে তাহার দেহের উপর দিয়া। ধুতি আর কুর্তার অবস্থাও তেমনি।

কিরে? কি চাই?

ফিরে এলাম, বাবু।

এলি তো! আগেই বলেছিলাম না।

বিদেশীয়া উত্তর দিলে না। সুরমার হাসিটা তখনো মনে বিঁধিতেছিল। বলিলাম: হাওড়া ব্রিজটা ভেঙে দিলে না কেন? কলকাতার আমরা বাঁচতাম, বাপ, তোদের হাত থেকে।

বিদেশীয়া নীরব।

গাড়ীতে উঠিতে উঠিতে বলিলাম, কোথায় কাজ করছিস্?

একবার কথা ফুটিল অত্যন্ত অস্ফুট স্বরে: কোথায় যাব বাবু। আপনি পুরানা বাবু আমার।

সুরমার হাসিটা মনে বিঁধিয়াছিল। বললাম, বটে! পুরানা বাবুর কথা মনে এতদিনে পড়ল বুঝি।

গাড়ী চলিল। বাহাদুর বলিল; সাহেব, খড়গ সিংহ হামাকে পুছতে ছিল—

কি?

এই বিদেশীয়া এল কিনা।

তাতে কি?

যদি সাহেব না রাখেন ও এখন যেতে পারে—জগুলালবাবুরা গুর্খা চায়—

বুঝিয়াছিলাম কথাটা। স্পষ্ট করিয়াই বলিলাম বাহাদুর, খড়গ সিংকে বলো, আমার বাৎ ঠিক থাকবে—

ঠিক সাহেব। তবে বিদেশীয়া হয়ত কম তলব চাইবে। সাহেব খড়গ সিংকে তো বারো টাকা দিচ্ছেন।

ওঃ! তা ঠিক। তবে আমি এখন এখনি তাব তলব কমাতে চাই না। সবাই কম দিলে তখন কম দেব, বেশি দিলে বেশি দেব। এই তো ঠিক বাৎ, না? কারুর নুকসান নেই।

বাহাদুর জানাইল, হাঁ, সাহেব।

বিদেশীয়াকে লইয়া অবশ্য মুশ্‌কিল হইযাছিল। বাড়ি ফিরিয়া দেখি সে বসিয়া আছে। তারপর আহাব কালে বুঝিলাম, সুরমাকে সে একটু নরম করিয়া ফেলিয়াছে। সুরমা বলিতেছিল, এখান থেকে হেঁটে যেতে শীতে জ্বরে মরতে মরতে বেঁচেছে। পথে নাকি কতলোক মরেও গেছে। ও দিন দশেকে গিযে পৌছয় বোধ হয়, তখন ওর প্রাণ নাকি যায়-যায়। তাবপরেই বা পথ কি? ভাগ্নেরা বলে, তুমি অন্যত্র যাও। তারাও খেতে পায় না—গবীব ক্ষেত-মজুব তারা। বিদেশীয়া গায়েব কাপড বাঁধা দিয়ে রেলের ভাড়া নিয়ে ফিরে এসেছে। থাকতে চায়, পুবানো লোক—

হাসিলাম, বলিলাম, গেছল কেন?

সুবমা বলিল, ওবা কি বোঝে? ভালো ভালো লোকেরাই বোঝে না—তা ওবা।

সুরমাব সকাল বেলাব হাসিটা কি আবাব চোখেব কোণে দেখা যাইতেছে?

বলিলাম, যাদের বিপদের সময় পেয়েছি তাদের তুলে দিতে চাও?

সুবমা বলিল, তাদেব তুলে দোব কেন?

তবে?

সুবমা ইহাব উত্তব জানে না।

বিকালে তবু আর একবাব শুনিতে হইল—তা হলে বিদেশীয়াকে বলি—অন্যখানে চেষ্টা দেখুক।

বলিলাম, তাইতো উচিত। নইলে খাবে কি? এইতো হয়ে এসেছে—দেখ্‌ছ তো চেহারা ওব।

তাই বল্‌ছিলাম—কত লোকেই তো তখন কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছিল, ওর দোষ কি?

না দোষ কি? কোথাও জানা থাকলে যাক্ এখন—বল্‌লাম সুবমাকে হেসে —পবে এবা চলে গেলে নয় দেখব আবাব।—জানিতাম, সুবমা কথাটায় সন্তুষ্ট

হইবে। না হইলে মাঝে মাঝে ওরকম হাসি আরও দেখিতে হইবে, ও রকম আরও শুনিতে হইবে—'কত লোকই তো তখন কলকাতা ছেড়ে যাচ্ছিল।'

চলিয়া গেল কয় মাস। মোটের উপর একটা নিয়ম মাফিক চলিতেছিল সংসার। কতটুকুই বা নিয়মিত তাহা চলিবে? চারিদিকে অনিয়ম। সেদিন সকালে বড় ক্ষুণ্ণ হইয়া আবার বসিয়াছিলাম। খড়গ বাহাদুর আগেই পালাইয়াছে—ফৌজে গিয়াছে। অনেক বেতন পাইবে, বাহাদুরকে দিয়া বলাইয়া লাভ পাই নাই, বাহাদুর বলিয়াছে—ও ফৌজে যাবে! শুনবে না।

মনে মনে চটিয়াছিলাম। উনিশ টাকার জন্য কাঁচা মাথা দিতে পারে, এক মাত্র গুর্খাই। এই যুদ্ধ আমাদের কি সর্বনাশ করিতেছে—চাকর বাকরও আর মিলে না। তবু নতুন লোক জুটাইয়াছিলাম—বাঁকুড়ার বিলাস।

কিন্তু আজ সকালে চলিয়া গেল বাহাদুর। তিনদিন পূর্বে সে বলে, সাহেব, আমার তলব মিটিয়ে দিন। আমি যাব।

আমি তো আকাশ হইতে পড়িলাম।

পরে সবই জানিলাম। মার্কিনদের ফৌজে লরী ড্রাইভারের কাজ, দেড়শ টাকা তলব প্রায় মিলিবে।

ত্রিশ টাকা হইতে বাহাদুরের তলব আমার কাছে পঞ্চাশ টাকায় উঠিয়াছে—আমার ভিজিট সেই আট টাকাই বাড়ে নাই, বরং বিনি পয়সার রোগী বাড়িয়াছে। তবু বাহাদুরের এইরূপ কথা।

চটিয়া গেলাম। ইংরেজেরা গুর্খা জাতটাকে নষ্ট করিয়াছে, এখন আমেরিকানরা টাকা ছড়াইয়া এই জাতের একেবারে দফা রফা করিয়া ছাড়িবে। বাহাদুরকে তাহা বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। বলিলাম, লড়াইতে পাঠাবে তো, বাহাদুর!

হাঁ, ও তো ঠিকই।

তবে? লড়াইতে যাবে।

কেঁও, লড়াইমে কেয়া নুকসান হ্যায়?

নুকসান নয়? বোমা পড়বে, জান যেতে পারে—

ওতো ঠিকই।

না গুর্খার মাথায় ইহা ঢুকিবে না। দেড়শ রূপেয়া তলব' আর ফৌজের উর্দি—তাহার 'নুকসান' কোথায়?

তবু বুঝাইতে গেলাম। শেষে দেখিলাম, বাহাদুরের মেজাজ খারাপ হইয়া উঠিল : সাফ বাৎ সাহেব। কাল হাম যায়েঙ্গে—দশ বাজে হামকো ওধার ডিউটিমে হাজির হোনা চাই। তলব মিটা দিজিয়ে—।

মেজাজ আমারও খারাপ হইতেছিল। সেই বাহাদুর—এত বিশ্বাসী—এরকম কথা বলে? তবু মেজাজ সামলাইলাম। যাক্, মরুক। দেখিবে তো মার্কিনী মজা। কথায়-কথায় জরিমানা, গালমন্দ জবাব, তলব লইয়া আর বাহির হইতে হইবে না। আমার এখানে কিই বা কাজ ছিল? পেট্রোল পাই না প্রায়। যাহা পাই তাহাও আজকাল বাহাদুরের কৃপায় কি করিয়া ফুরায় বুঝি না। সে বলে গাড়ী খারাপ হইয়াছে। ওদিকে টায়ার নাই। পারিতে নিজের গাড়ীতে বাহির হই না—বাহাদুরেরও কাজ তো প্রায় ছিলই না। কাজ অবশ্য সে জুটাইয়া লইয়াছিল,—জানিতাম ও পাড়ার একটা পাহাড়িয়া আয়া জুটিয়াছে। তাহাকে লইয়া বাহাদুর হাওয়া খাইয়া আসে আমারই মোটরে, শুনিয়াছি। কিছু বলি নাই, আজকাল লোকজন নাই, ড্রাইভাররা তো লাট সাহেব সবাই। কিন্তু, না ইহাদের বিশ্বাস করাই ভুল। বাহাদুর বলে, দেড়শ টাকা তলব পাইতেছি।'

খুব ক্ষুব্ধ মনে বসিয়াছিলাম। আজ বিকসায় বাহির হইব—গাড়ীতে আর কাজ নাই। কে আসিয়া হাতে কি বাঁধিতে লাগিল। চমকিয়া দেখিলাম—রাখী! ও, রাখী পূর্ণিমা বুঝি? কে?

আকর্ণবিস্তৃত হাস্য করিয়া লোকটি বলিল : বাবু, আমি।

তবু চিনিতে পারিলাম না—চেনা-চেনা।

বিদেশীয়া।

বিদেশীয়া!—খুব খুশী হইলাম।—কি ব্যাপার, বিদেশীয়া?

এই রাখী লিয়ে এসেছি। আপনি পুরনো মুনিব।

ও! বেশ! বেশ! তা আছিস কোথায় এখন? কোথায় কাজ করছিস্?

ডকে, '৫নং ডকে।'

একেবারে ডকে—কি পাস?

বারো আনা রোজ ছিল প্রথম। এখন হুজুর দুটাকা ভি কামাই হোয়—প্রসন্ন হাস্যে বলিল বিদেশীয়া।

বাঃ ভালো কথা। তা হলে আছিস ভালো ?—চেহারাতেও এবার তাহা বুঝিলাম। দাড়ি কামানো, মাথাও কামানো—গায় ভালো কুর্তা, পায়ে জুতা, চেহারাও ফিরিয়া গিয়াছে,—খাইতে পায় তাহা হইলে। জিজ্ঞাসা করিলাম তাহলে খেতে পাচ্ছিস।

হুজুর, রেশন ভি মিলে।

মনে পড়িল। রেশন উহাদের মিলে আর আমরা চোরা বাজারে পঁয়ত্রিশ টাকায় চাল কিনিয়া মরি—অবশ্য, আমি একটা সুবিধা করিয়া লইয়াছি—হাসপাতালের সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের সঙ্গে। বলিলাম, তাহলে তো তুই এখন রাজা বিদেশীয়া ?

বিদেশীয়া প্রসন্ন হাস্যে বলিল, হুজুর মুনিব।

সে দিন গেছেরে, সেদিন গেছে। বেশ, কি কাজ করিস্ ডকে ?

মাল নামাই।

কি মাল রে ? ডকে জাহাজ আসে আজকাল ?

আসে বৈ কি। লড়াইর মাল আসছে তো বহুৎ।

লড়াইর মাল! কি মাল রে।

সব কিছু। সে আমি অত জানবে কি ? গোলা, বারুদ, বোমা।—

বলিস কি ? বোমা, শেল্—এ সব নামাতে হয় ?

স্বচ্ছন্দভাবে বিদেশীয়া বলিল : হুজুর।

—ধরিস তোরা ? নিজ হাতে ?

—হাঁ, হুজুর।

—ভয় করে না—যদি ফেটে যায় ?

—ফাটে না। তবে ভয় আছে। গড়বড়ি হতে পারে। এই সেদিন কি হল; আঠাবোঠো আদমি নুক্‌সান হয়ে গেল।

আদমি নুক্‌সান হয়ে গেল ?

হাঁ, বাবু।

কি ব্যাপার ?

বিদেশীয়া জানাইল, হামরা কি জানি ? দু নম্বর শেডের কোণে হাঠাৎ একটা ভারী আওয়াজ—কি ফেটে গেল।

কি ফেটে গেল ?

বোমা হোবে—ছোটসা বোমা।

বোমা ?

হাঁ, বোমা—আঠাবোঠো আদমি নুক্সান হয়ে গেল।

'নুক্সান' হল ! তাহলে ওখানে কাজ কবছিস্—আবার নুক্সান হলে ?'

হাঁ, নুক্সান হোয়্। তবে মুফাভি আছে—দেড় টাকা দু'টাকা বোজ।

বিদেশীয়া ভিতরে গেল। খুকী ব'হিনকে দেখিতে চায়, মাইজীব সঙ্গে দেখা কবিবে। ভিতরে তাহাব কথা শুনিতে পাইতেছি, বলিতেছে, 'সেবাব বোমা গিববে দেখে চলে গেলাম ! বড় বেকুফ আমি,—মা।'

বিক্সা আসিতেছে না। আমি ভিতরে তাহাদেব কথা শুনিতেছি।

বোমাব ভয়ে চক্রবেড়ে বোড হইতে পালাইয়াছিল বিদেশীয়া। এখন ডকেই করে কাজ, আব নামায় বোমা, শেল্। আচ্ছা কামাই ডকে ; অবশ্য আদমি নুক্সানও হয়।

ব্যাটাদেব এমনি ধাবণা—আদমিব ওই যেন হিসাব—নুফা, না, নুক্সান।

অশোক বায়

পুস্তক-পরিচয়

আধুনিক ইংরেজি কবিতা

Trident. by John Manifold and others (Fore Publications London, 1/6)

Rhyme and Reason, ed. by David Martin (Fore Publications. 1/-/-).

These are my Comrades, by Alan Rook (Routledge, 5/-)

সম্প্রতি ইংবেজী সাহিত্যে আশাব কিছু খুঁজে পাওয়া দায়। ফোলিওস্ অফ্ নিউ বাইটিং, পেঙ্গুইন্ নিউ রাইটিং বা হরাইজন্ প্রভৃতি সাময়িকীকে যদি মানযন্ত্র বলে' নেওয়া যায়, তা হলে একটা উদারনীতিক এলোমেলো ভাব বা ব্যবসায়ী ছদ্মবেশী ফ্যাশিজমেব সুরই ধরা পড়ে। না হলে হর্বার্ট বীড্-মার্কা একটা স্বপ্নবিলাসী নৈরাজ্যবাদ। এলিঅটেব ঈশ্বর বিলাস অবশ্য এখনও মবে নি, অ্যান্ রিড্লাবেব কবিতার বই পড়তে পড়তে সে কথাও মনে হয়। তবে মোটামুটি ইংরেজি তরুণ সাহিত্যে দেখা যায়, যে, এদিকে বর্ণহামের গমস্তা-বিপ্লব ওদিকে কোএস্লাবের সংস্কৃত আত্মা এই দুই বীজকম্প্র

ক্যাশিজমের ধারাই মধ্যবিত্ত ইংরেজ সাহিত্যের বর্তমান ফাঁকির পথ। জন লেমান্ তাই নাৎসিদের সর্বপ্রথম লেখক ভক্ত ইয়ুঙ্গেরকে উচ্ছ্বসিত প্রশংসা করেন—আহা! কি রচনা কৌশল, নেক্‌ড়েকুকুরগুলো নাৎসি কি কম্যুনিষ্ট বোঝা যায় না; চাল্‌টা প্রায় কাফ্‌কা বা রিল্‌কের সঙ্গে তুলনীয়। অতঃপর লেমান্ আরেক সংখ্যায় স্পেন, জর্মানি ও রাশ্যার মধ্যে একই সমস্যার হৃদয় পর্যবেক্ষণ করেন। তাই যখন কীড্‌রীশ্ রীজের যুদ্ধকবিসংগ্রহে চার্চিলের ওপর ওড্ বা গাথা পড়ি, তখন হাসিটা বিস্ময়প্রসূত হয় না। সাম্রাজ্যের পাপ এমনি গভীর। তবু আশা আছে। টাম্বিমুত্তুর যুদ্ধকালীন কাব্যে বহু নবীন কবির মধ্যে সততার সুর বাজে! তাঁদের হয়তো হাত কাঁচা, বিশ্ব বীক্ষা কম, বক্তব্য নিছক ব্যক্তিগত, তবু আবেগের সত্য আছে, স্ত্রীকে বা প্রেয়সীকে সোজাসুজি আবেদন পত্র। তা ছাড়া হেনড্রির দু একটি কবিতা, নিকলাস মূরের মেক্সিকো থেকে হাওয়া নামে উপাদেয় কবিতা, অ্যালেন রুকের ডানকার্ক্ ইত্যাদিতে জীবন দর্শনের গভীরতাও সাড়া দেয়। পাড্‌নি-র বই দুটিতেও যুদ্ধ জীবনের সাধারণ সুখ দুঃখ কবিকে বিষয় জুগিয়েছে।

ফোর্ পাব্লিকেশন্সের যে তিনটি সস্তা অথচ অতি সুদৃশ্য বই পেয়েছি, তাতে আশাটা বেড়েছে। ডেভিড্ মার্টিন্ আন্দাজ করছি মার্ক্সিষ্ট; তাঁর প্রথম পুস্তিকাটিতে ২২শে জুন প্রভৃতি একাধিক ফ্যাশিষ্ট বিরোধী কবিতায় খুশী হয়েছিলুম। আর মানি-ফোল্‌ড অষ্ট্রেলিয়ার কম্যুনিষ্ট কবি, আপাতত ইওরোপের রণাঙ্গণে। ইংরেজ ধনিক আমেরিকান্ বণিক নয়, প্রথম অষ্ট্রেলিয়ান রিপাব্লিক ছিল তাঁর আগের কবিতার বিষয়।

Trident বা ত্রিশূলের লেখক ম্যানিফোল্‌ড, মার্টিন্ ও নিকল্‌সন্। ম্যানি-ফোল্ডের পোপের স্যাটায়ারে চতুর ব্যবহার উপভোগ্য। আরম্ভে কবি বন্ধু এন্ বলেছেন:

> Verse? Writing verse? Dear man, are you insane?
> To think I used to think you had a brain!

তারপরে সব কবিকীর্তন। তার মধ্যে উদারনীতির টল্‌টলে স্তম্ভ ষ্টীভন স্পেণ্ডরের বিষয়ে লাইন কটি উপভোগ্য:

> Here simple Spender in a place apart
> Bares on his sleeve his haemophilic heart;

Dribble by drip the pinkish flow proceeds—
Oh ! squeeze it Mister Spender ! Thar she bleeds !
Long since, a Sweet Young Thing, he staked his claim,
His vein a gusher proved, he rose to fame,
Postured in public with a nudist's smile,
Outbled a pig, outwept a crocodile ;
First with the mode and duly quick to please
He spread like smut on crops or mites on cheese,
Till half the Press submitted to his reign.
And soft contagion ran through all their train.
Now in degenerate prose, not verse alone,
He rapes (as formerly he bayed) the moon ;
Now, as a critic, shows for all to see
Shelley and Whitman were the same as he.
The passing years brought little change of plan—
The Sweet Young Thing became a Grand Old Man.
But as boloney, slice it where you will,
Remains boloney, pure boloney still,
So he continues and his constant theme
Is this unpleasant moist and sticky stream.

নিকল্‌সনেব কবিতায় জনযুদ্ধ ও এলিঅটকে প্যাবডি পাশাপাশি। এবং মার্টিনেব কবিতাটি ফক্‌স্‌, কর্ণফোর্ড, হ্বাইডমান্‌ প্রভৃতি স্পেনেব আত্মত্যাগীদেব সঙ্গে আজকের দিনেব জনজীবনের জের টানা কাটা কাটা লাইনের গান।

Rhyme and Reason-এ ইয়েটসেব আইবিশ আন্দোলনের বিখ্যাত কবিতা Easter 1916 ছাড়া ষোল জন নবীনতব কবিব বচনা। যেহেতু বাজাবে বই হঠাৎ পাওয়া যায় তাই আশা করি দীর্ঘ উদ্ধৃতিতে পাঠকের ধৈর্যচ্যুতি হবে না। The Anatomy of Spirit ও A Short History of Culture-এব জ্যাক্‌

লিণ্ডসের একটি কবিতায় ঈষৎ বামপন্থী ইংরেজ শিক্ষিত জগতের অবস্থাটা ফুটেছে ভালো—

Having felt for Spain, what further can we feel?
Acted out is the tragedy of our day ......
So I said, but forgot how the earth's daffodil-spear
splits winter's iron mail,......

Red Army march or budpulse en the bough?
unconquerable Spring or the Soviet Star?

ম্যাকডায়ারমিড Third Hymn to Lenin-এ বলেছেন মার্ক্সিষ্টদেরই কাম্য সমগ্রতার কথা ঃ

Our concern is with human wholeness

ম্যাকফ্যাড্‌ন্‌ ও ম্যানিফোল্ডের কবিতাগুলি কবিতা হিসাবেই উপাদেয় এবং বিশেষ খুশি লাগল র‍্যাণ্ডাল স্নইংলরের প্রত্যাবর্তনে—মার্ক্সিষ্ট প্রত্যাবর্তনে ঃ

In your hesitant moments, remember Cornford and Fox
Looking across the valleys and the romantic rocks
Not even moonlight could make remote or magic

Surely they knew as they wrote
That freedom is but wholeness ;

... ...

For who shall be whole except mankind be whole?

এই জীবনবোধই তাঁর নিপুণ Letter I-এ ঘনিয়ে উঠেছে প্রেমের আবেগের মধ্যে ঃ

The midnight streets as I walk back
Are half in white and half in black
White in the light that night repeats
Blackroofed and floored in day's defeat.

And black the shadows of my thought
Stand up against the white retort
Of all the brilliance I have known
Beside you in this stricken town

This war will keep me walking long
To wrestle with the constant wrong
While heart and reason disagree,
Either impatient to be free,

Free of the curse that checks us here;
My fatalism and your fear,
Whose black denial intervenes
Like the angelic sword between.

Such are the knots of guilt and sin
Our history is tangled in
And cannot be untied again
Until our world is whole and sane.

This battle which they wage in me,
Desire aud Necessity,
Can never be resolved before
Mankind has won the greater war.

ইত্যাদি তাই অ্যালেন রুক :—

Now many trees must fall before the woodman,
turn from his axe. And many hearts must know
fear before morning. Not only statesman now
freely must speak. Man's very heart must tell
the urgent necessity for freedom, must relate
the individual promise for perfection.
Soldiers and free men exploring the present sickness
which is our nightmare, fighting to find a new
variant to living, or night's eternal peace.

বিষ্ণু দে

চতুর্দশ বর্ষ—৩য় সংখ্যা।
আশ্বিন, ১৩৫১

পরিচয়

প্যারিস

ছেলেবেলায় কয়েকবার কথকতা শুনেছিলাম। বিশেষ করে একজন কথকেব কথা এখনও পরিষ্কাব মনে আছে। বোধ হয় খানিকটা আধুনিক কায়দা ছিল তাঁর বলবার ধরণে। প্রথমেই তিনি তাই কোন দেবদেবীর শরণ না নিয়ে একটা গান গাইতেন, "অযুত ঋষির পদরজঃপূত, পুরাণ প্রচারে ধন্য," মহাতীর্থ নৈমিষারণ্যকে স্মরণ করে প্রণতি জানাতেন।

রাজপুতানার কোন চারণ কিম্বা মধ্যযুগীয় ইয়োরোপের কোন 'ত্রুবাদুর' যদি আজ বিপ্লবের গাথা শুনিয়ে বেড়াতেন, তো বোধ হয় প্রথমেই গাইতেন প্যারিসের কথা, বহু বিপ্লবের গৌরবকাহিনী যে শহরকে বিশ্বমানবের পীঠস্থানে পরিণত করেছে, তার বীরকুলের মহিমা কীর্তন করতেন।

পশ্চিমী পুরাণে এন্‌সিলেডস্ নামে এক দৈত্যের আখ্যান আছে। এই দৈত্যকে দেবতারা যখন কিছুতেই দাবিয়ে রাখতে পারেন নি, দেবরাজ জুপিটার যখন একেবারে নাস্তানাবুদ, তখন মিনার্ভা নাকি বুদ্ধি খাটিয়ে এট্‌না পাহাড়টা দিয়ে এন্‌সিলেডস্‌কে চেপে ফেলেন, যুদ্ধে দেবতাদেরই জয় হয়। দৈত্য কিন্তু মরেও মরবার পাত্র ছিল না, তাই বুঝি যখনই সে ক্লান্ত হয়ে একটু হাত-পা ছড়াবার চেষ্টা করে, তখনই এট্‌না পাহাড়ের মুখ দিয়ে অগ্ন্যুৎপাত হয় আর সারা সিসিলি দ্বীপটা তোলপাড় করতে থাকে।

উনিশ শতকের প্রথমার্দ্ধে ইয়োরোপে একটা কিম্বদন্তী ছিল যে ফ্রান্স হল ইয়োরোপের এন্‌সিলেডস্। ভগবানের হুকুম-নামা নিয়ে প্রভুত্ব করছি বলে যারা বড়াই করত, সেই বুর্‌বঁ রাজবংশের বিরুদ্ধে ফ্রান্স লড়েছিল। কিন্তু ঘটনার অনেক হেরফেরের পরে দেখা গেল যে সেই বুর্‌বঁ রাজতন্ত্রের জগদ্দল পাথর চাপিয়ে ফ্রান্সকে দাবিয়ে রাখার চেষ্টা হয়েছিল। কিন্তু ফ্রান্স কিছুতেই সে-বন্দোবস্ত মেনে নেয় নি। আর যখনই

ফ্রান্স তার হাত-পা ছাড়াবার চেষ্টা করেছে, তখনই একটা অগ্ন্যুৎপাত হয়েছে, সারা ইয়োরোপে বিপ্লবের ডঙ্কা বেজে উঠেছে।

এই কিম্বদন্তীরই লোকায়ত সংস্করণ একটা ছিল। সাধারণ লোক বলত যে ফ্রান্সের হাঁচি পেলে ইয়োরোপের সব দেশেরই যেন সর্দ্দি ধরে যায়!

১৯১৭ সাল থেকে দুনিয়ার বিপ্লবীদের কাছে লেনিনগ্রাদ, মস্কোর কদর প্যারিসের চেয়ে বেড়ে গেছে। কিন্তু ফরাসীদের বিপ্লব-পরম্পরার মহিমা তাদের কাছে একটুও ম্লান হয় নি। বিপ্লবের ঐতিহ্যগৌরবে প্যারিস পৃথিবীর পুরোধা।

এই বছরের ২৩শে আগষ্ট তারিখটা তাই ইতিহাসে একটা স্মরণীয় ব্যাপার। হিটলারী বুটের চাপে যে ফ্রান্স জীবন্মৃত হয়েছিল, দেশের মধ্যে বিভীষণ-বাহিনীর চক্রান্ত যে ফ্রান্সের স্বাধীন সত্তাকে নিঃশেষ করার ব্যবস্থা সম্পূর্ণ করছিল, সেই ফ্রান্সই সুপ্তোত্থিত সিংহের মত জেগে উঠেছে, কেশর আন্দোলিত করেছে। আর পূর্ব্বের মতই ফ্রান্সের নবজাগরণে প্রথম সতেজ দুন্দুভিনিনাদ করেছিল বিপ্লবস্মৃতিপূত মহানগরী প্যারিস।

দ্বিতীয় ফ্রন্ট খোলার পর থেকে ইঙ্গ-মার্কিন বাহিনী ফ্রান্স থেকে ফ্যাশিষ্ট দুঃশাসন উৎপাটিত করার লড়াইয়ে লেগেছিল। কিন্তু শুধু বিদেশী মিত্রের উদ্যমে ও বিক্রমে স্বাধীনতা ফিরে পাওয়া ফ্রান্সের মনঃপূত ছিল না। তাই দেশের যেটা হল মর্ম্মস্থল, সেই প্যারিসে ঘটল বিপুল জন-অভ্যুত্থান। পূর্ব্বপুরুষেরা রাস্তায় 'ব্যারিকেড্' বানিয়ে স্বাধীনতার জন্য লড়েছিলেন; তাদেরই বংশধরেরা কোথাও 'ব্যারিকেড্' খাড়া করে, আর কোথাও আধুনিক অস্ত্রশস্ত্র চালিয়ে শত্রুনিপাতে লাগ্‌ল। পঞ্চাশহাজার সশস্ত্র আর কয়েক লাখ নিরস্ত্র দেশভক্ত মিলে প্যারিসের পূর্ব্বগৌরব পুনঃস্থাপনের সংগ্রামে নামল।

বার বার ফরাসীদের ইতিহাসে দেশভক্তদের মনের কথা ফুটে উঠেছে আমাদের কবির ভাষায়—

হায় সে কি সুখ, এ গহন ত্যজি'
হাতে লয়ে জয়তূরী,
জনতার মাঝে ছুটিয়া পড়িতে,
রাজ্য ও রাজা ভাঙিতে গড়িতে,
অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া
হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি।

প্যারিসের মুক্তি হল ফ্রান্সের সর্ব্বত্র অপরাজেয় জনজাগরণের সঙ্কেত। হঠাৎ যেন সারা ফ্রান্সে বিপুল দেশপ্রেমের উল্লাস বয়ে গেল, আর তারই স্রোতে তৃণের মত ফ্যাশিষ্ট দুর্দ্দানব ভেসে যেতে লাগল।

জয়তূরী হাতে নিয়ে প্যারিসের জয়যাত্রা একটা আকস্মিক ঘটনা নয়। ফ্রান্সের দেশভক্তেরা নিদারুণ অত্যাচার অগ্রাহ্য করে প্রতিরোধ চালিয়ে আস্‌ছিল, মুহূর্ত্তের জন্যও তাদের পরম দেশপ্রেমিক কর্ত্তব্যে অবহেলা করে নি। বিদেশী মিত্রপক্ষের কাছ থেকেও যখন বেতারে পরামর্শ আস্‌ত যে যথাসময়ে ফরাসীদের খবর দেওয়া হবার আগে ফ্যাশিজম্‌কে আঘাত করবার চেষ্টায় তারা যেন শক্তি ক্ষয় না করে, তখনও তারা চুপচাপ বসে থাকতে রাজী হয় নি, মিত্রপক্ষের পরামর্শ মেনে নেওয়া সঙ্গত মনে করে নি।

ফরাসীদের কানে পৌঁছেছিল আর এক ধরণের পরামর্শ। ফ্রান্সের কম্যুনিষ্ট পার্টির আহ্বানে একদিনের জন্যও প্রতিরোধ ক্ষান্ত হয়ে থাকে নি। ফ্যাশিষ্ট শাসকরা এর প্রতিশোধ নেবার জন্য নিদারুণ অত্যাচার প্রবর্ত্তন করেছিল। তাই ফ্যাশিষ্ট শাসনের প্রথম তিন বৎসরে একা কম্যুনিষ্ট পার্টিরই দশহাজার সভ্য দেশের সেবায় মৃত্যু বরণ করে। ফ্যাশিষ্ট জল্লাদের হাতে গাব্রিয়েল পেরি, পিয়ের সেমার, জ্যঁ কাথ্‌লা প্রভৃতি কত দেশভক্ত প্রাণ হারায় বটে, কিন্তু দেশবাসীর স্মৃতিতে তারা চিরঞ্জীব হয়ে আছে।

প্যারিসের মুক্তিতে ভারতীয় সৈন্যদের অবদানের কথা জেনে আনন্দে, গর্ব্বে আমাদের বুক ফুলে ওঠে। স্বাধীনতার যারা পূজারী, সর্ব্বদেশেই তারা প্যারিসের, ফ্রান্সের ভক্ত। সাম্য, মৈত্রী, স্বাধীনতার জয়গান যে-দেশে প্রথম উঠেছিল, সে-দেশকে ভালোবাসে না কে? সে-দেশের প্রতি আমাদের গভীর মমতা জানাবার জন্যই ভারতের পুরুষশ্রেষ্ঠ রামমোহন রায় ইয়োরোপে যাবার সময় অনেক অসুবিধা ভোগ করেও ফরাসী জাহাজে সমুদ্রযাত্রা করেছিলেন। নাৎসী বন্দীশালা থেকে পলায়ন করে ভারতীয় সৈন্যেরা যে প্যারিসের শৃঙ্খলমুক্তিতে সহায়তা করেছে, এতে আশ্চর্য্যের কিছু নেই।

হয়তো নাৎসীবন্ধন থেকে মুক্তির দিন ফরাসীরা উৎসব করে প্রতিপালন করবে। ১৭৮৯ সালের ১৪ই জুলাই তারিখ যেমন ফরাসীদের জাতীয় দিবস, তেমনই ১৯৪৪ সালের ২৩শে আগষ্টও হয়তো প্রতি বৎসর সারা দেশ আনন্দ করবে, মুক্তিসংগ্রামের সদাস্মরণীয় কর্ত্তব্য মনে জাগরূক রাখবে।

প্যারিসের 'ফোবুর্গ' (যে শহরতলীগুলিতে প্রধানত শ্রমিকেরা বাস করে) আর প্রসিদ্ধ 'প্লাস্' বা পথের কেন্দ্রগুলি প্রতি বৎসর ১৪ই জুলাই তারিখে কী অপূর্ব্ব উল্লাসে যে মুখরিত হয়ে ওঠে, তা যারা দেখেছে তারা কখনও ভুলতে পারে না। জানা-অজানা ছেলেমেয়ের হাতে হাত বেঁধে সারাদিন উৎসবব্যস্ত প্যারিসের পথে পথে ঘুরে বেড়াবার অভিজ্ঞতা যাদের হয়েছে, তারা বোঝে ফ্রান্সের দেশপ্রেম কি বস্তু!

১৯৩৫ সালের ১৪ই জুলাই তারিখের কথা মনে আস্‌ছে। তখন ফ্রান্সে 'ইউনাইটেড ফ্রণ্টের' জয়জয়কার চলেছে। প্যারিসের শ্রমিকদের মনে বিপুল উৎসাহ। বহু লক্ষ লোক মিলে তারা মিছিল নিয়ে যাচ্ছে। মিছিলের মাঝামাঝি একটা গাড়ীর ওপর বিশ্ববিখ্যাত লেখক ও শ্রমিকবন্ধু অঁরি বারব্যুস্। বারব্যুসের পোষাক লাল নিশান দিয়ে ঢাকা, চারদিকে উৎসাহোদ্দীপ্ত জনতা।

মিছিলের সঙ্গে সঙ্গে চলেছেন শ্রমিক-আন্দোলনের শ্রেষ্ঠ নেতার দল—কাশঁ্যা, মার্ত্তি ও আরও অনেকে। মার্ত্তি লিখে গেছেন যে প্রায়ই শ্রমিকেরা এসে তাঁকে বলছিল, 'বারব্যুস্‌কে মাথায় টুপি দিতে বলো, রৌদ্রে বৃদ্ধের স্বাস্থ্যভঙ্গ হবে।' কিন্তু বারব্যুস্‌কে এ-কথা জানালে তিনি রাজী হন্ নি, হেসে জানিয়েছিলেন যে জনতার সাম্‌নে মাথার উপর টুপি বসাতে তিনি রাজী নন্।

১৭৮৯-৯৪ সালের ফরাসী বিপ্লবের-ঐতিহ্য সমগ্র মানবজাতির একটা পরম সম্পদ। কেবল তত্ত্ব নয়, কর্ম্মের ক্ষেত্রেও জনগণের অধিকার সুপ্রতিষ্ঠ করার সংগ্রামে ফ্রান্স বিশ্বের নেতৃত্ব নিয়ে এসেছে। জাতিবর্ণনির্ব্বিশেষে সকলেরই সম্পূর্ণ সমান অধিকারের কথা ফ্রান্সের দেশভক্তেরা প্রচার করেছে, স্বার্থসর্ব্বস্ব সমাজপতিদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ ঘোষণায় কুণ্ঠিত হয় নি।

সাম্যবাদী আন্দোলনে ফ্রান্সের অবদান একেবারে অনবদ্য। সাম্যবাদের নীতি যখন ছিল কল্পনাশ্রয়ী, যখন বাস্তব জীবনে তার প্রয়োগপদ্ধতি ছিল অজ্ঞাত, তখন ফরাসী চিন্তানায়কেরা এ-বিষয়ে যথেষ্ট অনুশীলন করেছিলেন, অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়েছিলেন। প্রথম ফরাসী বিপ্লব যখন স্বার্থান্ধ নেতাদের কবলে পড়ে পথভ্রষ্ট হল, তখন বাব্যফ্ প্যারিসে এক সাম্যবাদী অভ্যুত্থানের আয়োজন করেছিলেন। সাম্যবাদী পদ্ধতি আয়ত্ত করার সুযোগ বাব্যফের হয় নি, অভ্যুত্থান তাই ব্যর্থ হয়ে গেল, কিন্তু বাব্যফের কথা এখনও প্যারিস ভুলতে পারে নি।

১৮৩০ সালে আবার ফ্রান্সে বিপ্লব হয়, প্রজাতন্ত্র স্থাপনের সংকল্পই প্যারিস গ্রহণ করে। কূটরাজনীতিবিশারদের ষড়যন্ত্রে সংস্কৃত রাজতন্ত্রই আবার স্থাপিত হয় বটে, কিন্তু প্যারিস সহজে তাকে মেনে নেয় নি। প্যারিস এবং লিয়ঁ-র মত শিল্পবহুল শহরে শ্রমিকসাধারণের জাগৃতির লক্ষণ দেখা যেতে থাকে। তাই ১৮৪৮ সালের বিপ্লবে শ্রমিকদের অবদান ছিল অনেক বেশী।

১৮৪৮-৫১, এই কয় বৎসরের ইতিহাস আলোচনা করেছেন স্বয়ং কার্ল মার্ক্স্। তিনি দেখিয়েছেন, ফ্রান্সের ভাগ্যনির্দ্দেশের সংগ্রামে দুটো আলাদা ধারা রয়েছে। শ্রমিকেরা যেতে চায় এক দিকে, আর বিপ্লবরহ্নিভীত-শ্রেণীরা যায় অন্যদিকে। শ্রমিকদের শক্তি ও সংহতি তখনও অসম্পূর্ণ, বিপ্লবের অর্থনৈতিক পশ্চাৎপট তখনও অব্যবস্থিত, তাই শ্রমিকশক্তি পরাজিত হল। কিন্তু বিনা যুদ্ধে প্যারিসের শ্রমিক পরাজয় মেনে নেয় নি। প্যারিস আর তার শহরতলীর রাস্তা গরীবের রক্তে রঙীন হয়ে উঠেছিল, বুর্জোয়ারা মর্ম্মে মর্ম্মে বুঝেছিল জনতার শক্তি, জনতার অটল প্রতিজ্ঞা।

প্যারিসের ইতিহাসে সব চেয়ে গৌরবময় অধ্যায় হল ১৮৭১ সালের কথা। শত্রু প্রাশিয়ান্‌দের কাছে হার মেনে ফরাসী বুর্জোয়ারা একটা মিটমাটের চেষ্টায় ছিল, কিন্তু প্যারিসের বীর নরনারী এই দেশদ্রোহী সংকল্পের বিরোধিতা করল। ঘরের শত্রু বিভীষণেরা বিদেশী বৈরীদের সঙ্গে যখন হাত মিলাল, তখন একা প্যারিসের শ্রমিকশ্রেণী দুর্জ্জয় বীর্য্য দেখিয়ে নিজস্ব 'কম্যুন্' প্রতিষ্ঠা করল, স্বাধীনতাসংগ্রামে প্রাণপাতের জন্য প্রস্তুত হল।

অতি নৃশংসভাবে হাজার হাজার নির্দ্দোষ নরনারীকে অসঙ্কোচে হত্যা করে ফরাসী বুর্জোয়ারা বিদেশী প্রাশিয়ানদের সাহায্য নিয়ে আবার দেশে প্রভুত্ব বিস্তার করেছিল বটে, কিন্তু প্যারিস 'কম্যুনের' তিন মাসের অভিজ্ঞতা বিশ্বের জন-আন্দোলনকে যে শিক্ষা দিল, সে শিক্ষা আত্মস্থ করার ফলেই ১৯১৭ সালের সোভিয়েট বিপ্লব সম্ভব হয়েছিল।

প্যারিস 'কম্যুনের' লড়াই হল প্রলেটারিয়েটের প্রথম লড়াই। সোভিয়েট বিপ্লবের ঐ হল মহড়া। সর্ব্বহারাশ্রেণীর একাধিপত্য নিষ্করুণভাবে স্থাপন না করলে যে জনসাধারণের বিজয় সম্ভব নয়, এই হল 'কম্যুনের' শিক্ষা। মার্ক্স্ 'কম্যুনের' কোন কোন কার্য্যকলাপের সমালোচনা করে বললেন যে নানা ত্রুটি সত্ত্বেও 'কম্যুন্' যে অপূর্ব্ব বীরত্ব দেখিয়েছে, আর যে শিক্ষা আমাদের দিয়েছে, শ্রমিক-আন্দোলন কখনও তা ভুলবে না।

১৮৭১ সালের মতই ১৯৪০-৪৪ সালেব ফরাসী দেশভক্তদেব একযোগে লড়তে হয়েছে দেশদ্রোহী ফবাসী আর বিদেশী জার্মান ফ্যাশিষ্টদেব বিরুদ্ধে। ১৮৭১ সালে তাবা সফল হয় নি, ১৯৪৪ সালে ফ্রান্সের দেশপ্রেম জয়মণ্ডিত হয়েছে।

চাব বৎসব আগে ফ্রান্স যখন ফ্যাশিষ্ট আক্রমণে ভেঙে পড়ল, শ্রেষ্ঠ দেশভক্তদের বেঁধে বেখে ছদ্মবেশী ফরাসী ফ্যাশিষ্টবা যখন তাদেব হিটলাবী মালিকদের হাতে সোনাব দেশকে তুলে দিল, তখন শুধু যে একটা নিতান্ত গুরুত্বপূর্ণ সামরিক বা বাজনৈতিক ঘটনা ঘটল, তা নয়, তখন ঘটেছিল ইয়োবোপীয় সভ্যতাব একটা বিবাট যুগের পতন। ইযোরোপেব সংস্কৃতিব যা-কিছু শ্রেষ্ঠ, তাব নিদর্শন খুঁজতে হলে প্রায় গত দুশো' বৎসব ধবে ফ্রান্সেব কাছেই যেতে হয়েছে। প্যারিস ছিল সত্যই মানবসভ্যতাব রাজধানী, সোভিয়েট-বহির্ভূত জগতেব মুকুটমণি। সেই ফ্রান্স যখন তার বিপ্লবী ঐতিহ্যেব গৌববকাহিনী ভুলে গিয়ে, আত্মসর্ব্বস্ব সমাজপতিদেব নির্বীর্য্য স্বার্থান্ধতার ফলে ক্লৈব্যেব শিকল বাঁধতে বাজী হল, তখন ঘটল একটা মন্বন্তর, একটা বিপুল বিপর্য্যয়।

'প্যাবিসেব পতন' বলে এরেনবুর্গ যে উপন্যাস লিখেছিলেন, তার কথা আজ মনে পডছে। সঙ্গে সঙ্গে মনে পডছে তাঁব প্রতিশ্রুতি যে এবাব 'প্যারিসেব মুক্তি' সম্বন্ধে তিনি লিখছেন। তাঁব লেখার প্রধান কথা ছিল এই যে, ফ্রান্সে মন্বন্তর অবশ্য ঘটেছে, কিন্তু এইবার পুবোনো মনু যাবে চলে, আব নতুন সংহিতা ফ্রান্সের জনগণই তৈরী কববে। ১৯৪৪ সালেব আগষ্ট মাসে সে-সংহিতার প্রথম পবিচ্ছেদগুলো লেখা আবম্ভ হযে গেছে।

চাব বৎসব ধবে প্যাবিস আব সাবা ফ্রান্স নরকভোগ কবেছে। প্যারিস শহর ছিল অক্ষত, উদ্ধত ফ্যাশিষ্ট-বাহিনী প্রবেশ করতে চেযেছিল অটুট, সুন্দর প্যাবিসে। চার বৎসর ধবে প্যাবিস ভেবে এসেছে যে তাব সৌধসমারোহই ফবাসী দেশপ্রেমকে বিদ্রূপ করছে, অপমান করছে! প্যাবিসেব দেহ ছিল অক্ষত, কিন্তু তাব মন, তাব আত্মা ছিল দুর্ব্বিষহ বিষাদ ও অবসাদের হিমে সম্পূর্ণ অবসন্ন।

আজ তাই প্যারিসেব নবজন্মে সর্ব্বদেশ এত উল্লসিত, আসন্ন মুক্তিব সম্ভাবনায় সর্ব্বদেশ আজ আশান্বিত। আব প্যাবিসে যাবা থেকেছে, প্যাবিসেব আকাশে বাতাসে যে সহজ প্রফুল্ল আত্মীয়তা ছড়িয়ে আছে তাব পরিচয় যাবা পেয়েছে, তাদেব আনন্দ শুধু নৈর্ব্যক্তিক সমাজবোধে অনুপ্রাণিত নয়, তাদেব আনন্দে আবও আছে যেন স্বজনেবই প্রতি মমত্ব।

হীবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়

লোকের হাটে

(১)

আবার এসেছে আষাঢ় ; জলস্রোতে ঘোলাটে হলুদ রং,
রাশি রাশি আবর্জনা
অন্ধবেগে ঘূর্ণীপাকে সাগর-সঙ্গমে যাত্রী,
বন্য মহিষের আক্রোশে আকাশে জগদ্দল মেঘ ঘন ঘন ডাকে।

(২)

হে শহর, বিষণ্ণ শহর !
সূর্য অস্ত গেলে,
কোনো কোনো পথে
ছায়া পড়ে মন্থর উটের,
মরুভূমির ক্লান্তি গায়ে লাগে,
হে শহর, বিষণ্ণ শহর !

(৩)

গোধূলি প্রান্তরে লেখা কঠিন জিজ্ঞাসা ঃ
শেষদিনে কোনখানে তোমাদের বাসা ?
তরল যৌবন ফিকে হয়ে আসে,
বিগত কৌতুক বিদূষক
কথার ঝলকে সভাভঙ্গ করেনা গভীর রাত্রে।

(৪)

দূরে শুনি ঝড়ের ডাক ; উদ্‌ভ্রান্ত ঘরে ফেরে কাক,
পাখার শঙ্কিত শব্দ ; তারপর পৃথিবী নির্বাক।

স্তব্ধতা পাকে পাকে জমে ; সংহত শক্তির উত্তাপ,
বিস্ফোরক সম্ভাবনা !
ফেলেছে দুবছর ; সীমান্তে শত্রুর ছায়া,
বর্গী আর বুলবুলে খেয়ে গেছে ধান,
ঘোর জ্বরে মন্বন্তরে কেটেছে দুবছর ;
এ দুবছর
পুষ্টিহীন চালের ছলনায় জীর্ণ হিন্দুস্থান
দেখেছে ভূতের নাচ, শুনেছে শকুন গান ।
আজ আবার জোয়ারী আবেগে ভরেছে মনের গাঙ,
সংহত শক্তির বেগ উচ্চকিত স্নায়ুশিরায়,
পুঞ্জীভূত অতিকায় ছায়া আশ্বিনের রৌদ্রে হারায় ।

(৫)

এ কথা বলেছি আগে, আবার বলি ঃ
আমি সাধারণ মধ্যবিত্ত, কূপের মণ্ডুক,
ছাপোষা মানুষ,
দিনের বিস্বাদ মুখে রাত্রে বাড়ী ফিরি ।
এ কথা সর্বদা মনে রাখি,
কেননা আমার একান্ত কামনা
তিলকে তাল করার ভ্রান্তি পার হয়ে
আত্মকরুণার ক্লান্তি পার হয়ে
সহজ জীবনে সহজ বিশ্বাসে ফেরা ।
এ কামনা আছে বলে এখনো বাঁচোয়া,
এ কামনা আছে বলে
এক একদিন যন্ত্র সঙ্গীতের শব্দ স্তব্ধতাকে ছিন্ন করে,
একান্ত সে মুহূর্তে বুঝি :
জীবাণুর আর দুর্ভিক্ষের সঙ্গে লড়ে যারা

বাংলাদেশে, উড়িষ্যায়, মালাবারে, উত্তর বিহারে,
যারা লড়ে ইউগোস্লাভিয়ার বন্ধুর মারাঠি পাহাড়ে,
রাশিয়ার রক্ত মাটিতে, বেদনাহলুদ চীনে, ফ্রান্সের ফিনিক্স্ প্রান্তরে,
আমারি আত্মীয় তারা ;
ওরা যেখানে প্রাণ নেয়, সেখানে প্রাণের স্বাক্ষর,
যেখানে ওরা প্রাণ দেয়, সেখানে জীবন অমর।
ওদেরি বাহুবলে পাশব শত্রুরা পলাতক, ছত্রভঙ্গ,
যুদ্ধের দলিত রক্তাক্ত প্রান্তরে লোহিত পদ্মের গান !
শকুনি-চক্রান্ত শেষ, শঙ্কিত সঞ্জয়
বিবর্ণ প্রাসাদে ফিরে, সঞ্চিত স্বার্থের প্রতীক—
লবেজান ধৃতরাষ্ট্রকে সভয়ে জানায়
পুনরুজ্জীবনের বার্তা সাধারণ লোকের।

(৬)

আশ্বিনের সোনালি রোদ্দুর
সঞ্জীবনী আশীর্বাদ।
বর্ষার শুদ্ধ ক্লান্তি ঝেড়ে
গাছেরা গাঢ় রং ধরে।

রমজানের শেষ দিন আজ ; উৎসবের আগে যেন মনে রাখি :
আমাদের মত সাধারণ লোক
আজ দেশে দেশে
মুষ্টিবদ্ধ প্রতিজ্ঞায়, আত্মদানে, আপনজনের ক্ষয়ে
জীবনের বনিয়াদ গড়ে।
মালাবার হিলে জাগ্রত হৃদয় রেখে যেন মনে রাখি,
চল্লিশ কোটি আমরা, বিরাট এ দেশ, এখানে নোকরশাহীর হবে শেষ
যদি বাজে রাম ও রহিমের কণ্ঠে আসমুদ্র-হিমাচল গান
স্বাধীন হিন্দুস্থানে আজাদ্ পাকিস্তান।

(৭)

মাঠ ভেঙ্গে এসো লোকের হাটে।
কাদার পিচ্ছিল বাধা, সাপের আদিম ভয়,
শূন্যগর্ভ আকাশের নিচে আদিগন্ত মাঠের দুঃস্বপ্ন
স্বপ্ন বলে লাগে লোকের হাটে। এখানে মন্থর ঠাটে,
প্রাণের অখণ্ড প্রতিজ্ঞা উদ্ধত স্তনে,
হাল্‌কা হাতে সব্‌জী কেনে শ্যামল মেয়েরা।
নিকট দিগন্তে দেখি সূর্যাস্তের ধুম্‌
এবার কাজের শেষে নিবিড় রাত্রির ঘুম।

সমর সেন

পরিচিতি

আমাকে দেখেছ তুমি
বহুবার দেখেছ আমায়।
কায়ুর ফাঁসির মঞ্চে
উক্রেনের আতপ্ত হাওয়ায়
বাঁচার ঘনিষ্টতম বোধে
আমাকে দেখেছ তুমি
চীনেব চৈনিক প্রতিরোধে।
শোণিতে শিরায় আর
অস্থি মজ্জা জুড়ে
ইস্পাতী কঠোর দৃঢ় স্বরে
তারা কথা কয়
মরণে অমর যারা জীবনে দুর্জয়।

প্রেরণা-কঠিন পেশী
উঁচু করে তুলেছে নিশান
আমার কণ্ঠের স্বরে
জীবনের শোন তুমি গান।
আমার বুকের রক্তে
জাগরূক চির রাত্রি দিন
সারথী লেনিন।

আমাকে দেখেছ তুমি
কতবার কত শত রূপে।
কখনো বিদ্রোহে
কিংবা পঞ্চাশের ভিখারীর স্তূপে।
আমার মুঠিতে ভরা
পৃথিবীর ভাবী ইতিহাস
আমার বিশ্বাস ॥

সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়

সোভিয়েট রাশিয়ায় বিজ্ঞান

যে সাহস শক্তি ও নিষ্ঠা নিয়ে সোভিয়েট বাশিয়া চাব বছরেরও অধিক প্রবল পরাক্রান্ত শত্রুর সঙ্গে যুদ্ধ করে জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তিস্থাপন করেছে তাতে সে-দেশ সম্বন্ধে আমাদেব ধাবণাব সে অনেক অদল-বদল কবে দিয়েছে। যাঁবা দেশ-বিদেশের সংবাদ বাখেন, কোথায় মানুষ কি ভাবে উন্নতিব পথে অগ্রসব হচ্ছে তাব খবব বাখতে সচেষ্ট, তাঁদেব কাছে সোভিয়েট-যুগে বিজ্ঞান, যন্ত্রশিল্প, আর্ট, দর্শন প্রভৃতিতে বাশিয়া যে উৎকর্ষ লাভ কবেছে 'তা অগোচর নেই। সাধাবণেব কাছে কিন্তু সোভিয়েট রাশিয়া সম্বন্ধে যে ধাবণা এই কিছু দিন আগেও বর্ত্তমান ছিল, মিথ্যা ও প্রমাদেব ওপব তাব ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত

সে ধারণাটা কতকটা এই রকম যে, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা রাশিয়ায় অবলুপ্ত, সাহিত্য ও আর্ট শৃঙ্খলিত, বিজ্ঞান শিল্প প্রভৃতিও কমিউনিষ্টবাদের একপ্রকার সঙ্কীর্ণ ও কাটাখালের ভিতর দিয়ে পরিচালিত। এর একটি কারণ রাশিয়া সম্বন্ধে নির্ভরযোগ্য বই ও সংবাদাদির এতকালের অভাব—যা সম্প্রতি কতক পরিমাণে দূরীভূত হয়েছে। এটা সকলেই অনায়াসে বুঝতে পারবেন যে, জার্মানীর মত এমন শত্রুদমন রাশিয়ার পক্ষে সম্ভব হ'ত না যদি না ও-দেশ বিজ্ঞান, ইঞ্জিনীয়ারিং, চিকিৎসা, মাইনিং, কৃষি প্রভৃতিতে প্রভূত উন্নতি সাধন করত, এবং ব্যবহারিক বিজ্ঞানে ও শিল্পোৎপাদনে ইউরোপের প্রথম শ্রেণীর দেশের সমকক্ষতা অর্জ্জন করত। যুদ্ধক্ষেত্রের প্রমাণই জাজ্জল্যমান্ প্রমাণ যে, রাশিয়ার সে সমকক্ষতালাভ সুসম্ভব হয়েছে।

বিজ্ঞান, ব্যবহারিক-শিল্প, চিকিৎসা প্রভৃতি বিষয়ে রাশিয়া সোভিয়েট যুগ প্রবর্ত্তনের পর থেকে কি ভাবে অগ্রসর হয়েছে তার সম্বন্ধে ইংরেজীতে প্রকাশিত বিবরণ ছিল এতদিন অত্যন্ত দুর্লভ। কিন্তু সৌভাগ্যক্রমে রাশিয়ার সঙ্গে মিত্রপক্ষ জার্মানীর বিরুদ্ধে যোগ দেবার পর থেকে ইংরেজী বৈজ্ঞানিক পত্রিকাদিতে এ-বিষয়ে এখন অনেক চমকপ্রদ প্রবন্ধাদি প্রকাশিত হয়েছে। বিক্ষিপ্তভাবে কিছু কিছু তথ্য আমরা এখন পাই ইংরেজী সাধারণ পত্রিকাদি থেকেও ; কিছু বেশী করে পাই বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক পত্রিকা Nature ও নব-প্রকাশিত Discovery থেকে। রাশিয়ার অ্যাকাডেমির সভ্য Fersman-এর রচিত ও মস্কো থেকে প্রকাশিত Twenty Five Years of Soviet Science এ-বিষয়ে ছোটর মধ্যে অতি প্রামাণ্য বই। এ-ছাড়া সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হয়েছে মস্কোয় প্রকাশিত 'দশমিক ব্যবধানের' বৈজ্ঞানিক পত্রিকা—"Comptes Rendu",—বিলাতপ্রবাসী এক বন্ধুর সৌজন্যে। এ সব থেকে অনেক খাঁটি খবর আমরা পেয়েছি।

প্রাগ-সোভিয়েট যুগে যে সব স্বনামধন্য বৈজ্ঞানিক রাশিয়ায় আবির্ভূত হয়েছিলেন তাঁদের নাম অনেকেই জানেন। মৌলিক পদার্থের রাসায়নিক ব্যবহারের বিধিবদ্ধতার আবিষ্কারক মেণ্ডেলেফ জগতে অতুলনীয় কীর্ত্তি রেখে গেছেন। এই বিধিবদ্ধতার সূত্র থেকে তিনি নিজেই অজ্ঞাত মৌলিক পদার্থের সন্ধান বলে দিয়েছেন। তার পরে অন্যান্য বৈজ্ঞানিকেরা তা আরও বলেন। আধুনিক কালে এই সূত্র গভীরতর গবেষণা ও আবিষ্কারের পথ উন্মোচন করে দিয়েছে ; তার পরিকল্পনে পাওয়া গিয়েছে ইলেকট্রন কেন্দ্রক প্রভৃতির সন্ধান। মেচ্‌নিকফের নামও সাধারণের কাছে অবিদিত নেই। লোবাচিউস্কি

একজন জগৎ প্রসিদ্ধ জ্যামিতিক ও বিপরীত-ইউক্লিডীয় সময়ের এক শাখার উদ্ভাবক। আধুনিক সময়ের পাভ্লভের নাম উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন। পদার্থ-বিজ্ঞানবিদ্ ক্যাপিট্জার নাম অনেকেই শুনে থাকবেন। তিনি ছিলেন কেম্ব্রিজে রাদারফোর্ডের ছাত্র। পরে তাঁর জন্য সোভিয়েট গভর্ণমেণ্ট এক অতি বিশাল গবেষণাগার Institute of Physical Research রচনা করে তাঁকে তা পরিচালনার জন্য আহ্বান করে আনেন। সোভিয়েট-যুগ আরম্ভ হবার পরেও রুশ বৈজ্ঞানিকেরা যে-সব কীর্ত্তিময় কাজ করেছেন তার দু-চারটির খবর সংবাদপত্র মারফৎ আমরা অনেকেই শুনেছি; যথা—মেরুদেশে অভিযান ও সেখানকার বার্ত্তাদি সংগ্রহ, উচ্চাকাশে (stratosphere) আরোহণ ও তত্ত্বনিরূপণ, কৃষিতে অভূতপূর্ব্ব উন্নতি, এরোপ্লেন সাহায্যে বীজবপন, একই ঋতুতে একের অধিকবার ও তাড়াতাড়ি শস্য উৎপাদন, ইত্যাদি। রাসায়নিক শিল্পে রাশিয়ার আর এক কীর্ত্তি—খনির কয়লাকে উত্তোলন না করে সরাসরি ভূগর্ভেই গ্যাস ভাণ্ডারে পরিণত করা।

বিপুল চেষ্টা ও দূরদর্শিতা বিনা সারা জগৎ থেকে বিচ্ছিন্নাবস্থায় বিজ্ঞানে একটা জাতিকে সামান্য বিশ-পঁচিশ বছরে উন্নীত করা যায় না। যে ব্যবস্থা রাশিয়ায় বিজ্ঞান শিক্ষা ও প্রসারের জন্য অবলম্বিত হয়েছে তা এই বিপুল প্রচেষ্টার পরিচায়ক। তুলনা করলে দেখি: প্রাগ-সোভিয়েট যুগে সেখানে রিসার্চ্চ কেন্দ্র ছিল ১৫০টি ও য়ুনিভার্সিটি ছিল ১০টি। এখন রিসার্চ্চ কেন্দ্র ২২৫৬; তাতে যে সব বৈজ্ঞানিক বিজ্ঞানচর্চ্চায় নিযুক্ত তার সংখ্যা ৪০,০০০। উচ্চশ্রেণীর প্রতিষ্ঠান যেখানে ছিল ৯৫, অধুনা তা ৭৫০; ছাত্র-সংখ্যা ৬০,০০০। চিকিৎসা শাস্ত্রে বাৎসরিক M. D. পাশ করে ২৫,০০০, তার মধ্যে অর্দ্ধেক মহিলা ও প্রত্যেককে স্বাধীন গবেষণা শেষ করতে হয়। সারা রাশিয়ায় পুস্তক-সংখ্যা—সাড়ে চার কোটি, জগতের বাকি অংশে এক কোটির এক-তৃতীয়াংশ। এ সকলের পাশে আমাদের দেশের কথা ভাবতেই লজ্জা হয়।

বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগে যে সকল গবেষণা উল্লেখযোগ্য, তার বিবরণে (Nature) প্রকাশ, পদার্থবিজ্ঞান বিভাগে কেন্দ্রকের গবেষণায় (Nuclear Physics), সংখ্যক-শক্তি গণিতে (Quantum Mechanics), সমষ্টি-গণিত ও কেন্দ্রকেরসমষ্টি গণিতে, ইউরেনিয়াম অণুর বিভাজ্যতায়, অধ্যাপক ভাবার (Prof. Bhaba) উদ্ভাবিত বিশ্বরশ্মির (Cosmic Rays) বর্ষণ সমস্যায়, আলোক ও রামন রশ্মি বিষয়ে, কূট চুম্বকতত্ত্বে, তারকার গর্ভস্থ টেম্পারেচার, অনু ও ইলেকট্রণ কেন্দ্রক প্রভৃতির গবেষণায়,—নানা বিষয়ে জোফে,

ইভানেঙ্কো, পোডল্স্কি, ফেঙ্কেল, শোকোলভ, খারিটন, মিভ্গাল, পিটাবস্কাক প্রভৃতি সোভিয়েট পণ্ডিতগণ ব্যাপৃত আছেন। আমাদের দেশের পদার্থবিদ ও রুশ পদার্থবিদেব যে সকল ক্ষেত্রে গবেষণাব মিলন ঘটেছে তাব মধ্যে রামন্ ও ভাবাব নাম উপবে উল্লিখিত হয়েছে। এ-ছাডা সম্প্রতি বোস ইনিষ্টিটিউটে শ্যামাদাস চট্টোপাধ্যায পিটাবস্কাক প্রদর্শিত পথে ইউবেনিয়ামেব দ্বিভাজ্যতাব নূতন প্রমাণ লোকগোচব কবেছেন। শুদ্ধ গণিত, বিশেষতঃ Theory of Number-এ রুশ গণিতবিদবা জগতে সর্ব্বাপেক্ষা অগ্রণী। পদার্থবিজ্ঞানেব সূত্রভাগেও এঁবা অন্য দেশেব তুলনায অনেক অগ্রসব হয়েছেন। এ প্রসঙ্গে একটা কৌতূহলোদ্দীপক সংবাদ পাঠকবর্গকে দেওয়া যেতে পাবে যে, দু'জন বাশিয়ান বৈজ্ঞানিক ল্যাণ্ডস্বার্গ ও ম্যাণ্ডেলষ্টাম স্বাধীনভাবে 'বামনবশ্মি' আবিষ্কাব কবেছিলেন। বাসায়নিক বিভাগে সে দেশেব বৈজ্ঞানিকদেব গবেষণা কম গৌববজনক নয়। এ-ক্ষেত্রেও সূত্র বিভাগে গবেষণা ক'বে ও সেই সূত্রেব ব্যবহাব ক'বে পেকোবয বিখ্যাত পটাসিয়াম লবণেব ভাণ্ডাব আবিষ্কাব কবেছেন। কত ব্যাপক ও গভীবভাবে এঁবা বিজ্ঞান-চর্চ্চায় অবতবণ কবেছেন পূর্ব্বেই তাব ইঙ্গিত কবা হযেছে। এই ব্যাপকতা প্রয়োগে এঁবা জ্ঞাত সকল মৌলিক পদার্থ ও তাদেব যৌগিক বাশিযাতেই অনুসন্ধান সহজ লভ্য কবেছেন। পূর্ব্বে, মিলেছিল মাত্র ৩০টি, এখন মিলেছে—যা ব্যবহাবক্ষেত্রে প্রয়োজনীয় তা ৬০টি। বোবোনেব যৌগিক কিছুদিন আগে পর্য্যন্ত পাওযা যায় নি, কিন্তু কাজাকস্থানে ১৯৩৪ অব্দে তাব বিবাট ভাণ্ডাব আবিষ্কৃত হযেছে। বেডিযাম ধাতু অত্যন্ত ফিকা অবস্থায় পাওয়া গিযেছে, এজন্য বিপুল চেষ্টায অভিনব কৌশলে তাকে নিষ্কাষিত কবা হচ্ছে। প্রফেসাব কাপিট্জাব পদার্থবিজ্ঞান প্রতিষ্ঠানে এত হিলিযাম গ্যাস তবল অবস্থায় সংগৃহীত হয়েছে যে, জগতে সমস্ত তবল হিলিয়ামেব চেযে তা অনেক বেশী। প্রত্যেক গবেষণাকাবী ছাত্র নিয়মিতভাবে এই হিলিয়াম সাহায্যে পবীক্ষা ও বীক্ষণেব সুযোগ পায়, আব অন্যত্র সাধারণত ছাত্রেবা শুধু পুস্তক সাহায্যে তার ব্যবহারবিধি অধ্যয়ন কবে। হীবকেব অভাবও দূবীকবণেব ব্যবস্থা করা হয়েছে। কৃষিবিজ্ঞানে সোভিয়েট বাশিয়া অনেক বিষয়ে জগতেব পথপ্রদর্শক। উষ্ণমণ্ডলেব গাছ-গাছড়া শীতেব দেশে হয় না, কিন্তু বাশিয়া এব বাধা দূবীভূত কবেছে। সেখানে ধান, পাট, ববাব ও চায়েব চাষ ব্যাপকভাবে চলেছে। এক ঋতুতে দুবার ফসল আহরণের কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। এ-পথে ভাবতে এ-বছর প্রথম ধানেব vernalisation-এব চেষ্টা সফল বলে অনুমিত হয়েছে; আলুব চোখ পুঁতে তাই থেকে দ্রুত দুবাব ফসল তৈবীব চেষ্টাও সেদিন শোনা গেল।

চিকিৎসায় সে দেশ কতখানি উন্নতি লাভ করেছে তার এক বিবরণ E. Rock Carling বিলাতের Royal Institution-এর বক্তৃতায় প্রকাশ করেছেন। ইনি যুদ্ধে রাশিয়া আহত ও রোগীদের চিকিৎসার কি ব্যবস্থা করেছে তাই দেখে আসবার জন্য Medical Mission-এর সভ্য হিসাবে সে-দেশে আহূত হয়েছিলেন। তাঁর প্রদত্ত বিবরণ রোমাঞ্চকর। ইনি দেখে এসেছেন যে, যুদ্ধের আহতদের মধ্যে শতকরা প্রায় ৮০ জন Fire line-এ প্রত্যাবর্ত্তন করতে পারেন; মিত্র পক্ষের ৬০ জন সক্ষম-অবস্থা প্রাপ্ত হন কিন্তু তারও সকলে Fire line-এ ফিরতে পারেন না। যুদ্ধ-হাসপাতালে মৃত্যুর সংখ্যা শতকরা এক, বড় জোর দুই। সৈনিকদের মধ্যে সবচেয়ে বড় মহামারী ছিল টাইফাস্। এই টাইফাস ও কলেরা একেবারে নিশ্চিহ্ন করা হয়েছে। ব্লাড ব্যাঙ্কে ও রক্তহীনতার চিকিৎসায় রাশিয়া জগতে অগ্রণী। কিন্তু রোগীরা অনেক সময়ে রক্তহীনতায় এমন এক অবস্থায় উপস্থিত হয়, যখন শত রক্তদানেও জীবন রক্ষা করা সম্ভব হয় না। এ অবস্থাকে বলে shock। মহিলা চিকিৎসক লেনা ষ্টার্ন এর নিবারণেরও পন্থা আবিষ্কার করে জগৎকে স্তম্ভিত করেছেন। প্রফেসর বোগোমুলেটজ-এর সিরামে ভাঙা হাড় অতি দ্রুত জোড়া লাগে, তাই চিকিৎসাজগতে তা আজ বহু সমাদৃত। এ-সব ইংরেজ পর্য্যটকের নিজের দেখা সাক্ষ্য; Carling লিখেছেন "Russian military medical officers have maintained their armies in the field without any epidemic disaster, they have enabled their soldiers successfully to use the most powerful and elaborate war machines; they have cared for the wounded so skilfully as to obtain a record recovery and they have sustained the morale of their troops through a period of devastating tribulation to the dawn of a triumphant advance."

খনিজ বিদ্যা, ইঞ্জিনীয়ারিং, ধাতু-শিল্প ও সকল রকম ফলিত-শিল্পে রাশিয়া জগতের শীর্ষস্থানে এসে পৌছেচে বল্লে নিতান্ত অত্যুক্তি হবে না। নীপার ডামের কথা কাহারও অবিদিত নয়; One World-এ উইল্কি লিখেছেন যে, রাশিয়ার Hydro-Electric Station-গুলি দেখে তিনি বিস্মিত হয়েছেন; তার অনেকগুলি পাচ থেকে দশটি বৃহত্তম আমেরিকান Hydro-Electric Station-এর সমকক্ষ। কৃত্রিম পেট্রল ও কৃত্রিম রবার উৎপাদনে রাশিয়া জার্ম্মানী ও আমেরিকার চেয়ে পশ্চাৎপদ নয়। বস্তুত, কৃত্রিম

রবার উৎপাদনে সর্ব্বপ্রথম রাশিয়াই অগ্রসর হয়—যদিও এর পদ্ধতি উদ্ভাবিত হয় ইংলণ্ডে। তখন আমেরিকা, জার্ম্মানী এমন কি ইংলণ্ডও রাশিয়াকে বিদ্রূপ করতে ছাড়ে নি কিন্তু এই বিদ্রুপ ও নিরুদ্যমের প্রকৃত কারণ এতদিন পরে প্রকাশিত হয়ে পড়েছে। আসল ব্যাপার যে শিল্প উৎপাদন ও কোন বাজারে কি পণ্যদ্রব্য আনীত হবে সে বিষয়ে ছিল ধনিক জগতে একটি বিরাট ষড়যন্ত্র। ঔষধপত্র রচনায় রাশিয়া সিদ্ধহস্ত; শুনে আশ্চর্য্য হবার কথা ম্যালেরিয়া নাশক অ্যাটেব্রিন যে সময়ে জার্ম্মানীতে আবিষ্কৃত হয়ে লাভের পেশাই কলে পিষ্ট হয়, সে সময়েই রাশিয়াতে স্বাধীনভাবে অ্যাক্রিচিন নামে একই জিনিস আবিষ্কৃত হয়ে জগতের কল্যাণে নিয়োজিত হয়। সৌভাগ্যক্রমে ভারতের কেমিষ্টদের কাছে এর ফরমুলা এসে পড়েছে, ও ভারতেও এই ওষুধ তৈরী এখন সম্ভব হয়েছে। Gasification of Under-Ground Coal Seams রাশিয়ার যে একটি আধুনিক কীর্ত্তি, তা পূর্ব্বেই উল্লিখিত হয়েছে।

Fersman সোভিয়েট বৈজ্ঞানিকদের বিজ্ঞান সাধনার কয়েকটি লক্ষণ নির্দ্দেশ করেছেন। তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হ'ল—প্রত্যেক ক্ষেত্রে বিজ্ঞানের ব্যাপক ও নিগূঢ় ভাবে সাধনা, বিজ্ঞানের বিভিন্ন বিভাগের মধ্যে একটা একতা স্থাপন ও প্রাক্তন বিজ্ঞানের প্রতি পূর্ণ শ্রদ্ধা বজায় রেখে সর্ব্বদা নূতন দৃষ্টিভঙ্গিতে গবেষণায় বৈজ্ঞানিকের পক্ষে আত্ম-নিয়োগ। Science for Science's sake-এতে অনেকেই বিশ্বস্ত। বিজ্ঞান নিষ্কলঙ্ক আচার্য্যদেবের মত শুদ্ধাসনে বসে জগৎমণ্ডল বিস্মৃত হয়ে আপন ধ্যানে বিভোর—এই হ'ল Science for Science's Sake-এর ধারণা। অপর পক্ষ বলেন—জগৎবাসীর কল্যাণই হ'ল বিজ্ঞানের মূল লক্ষ্য। সে-দিন লণ্ডনেও এই বিষয় নিয়ে বৈজ্ঞানিকদের মধ্যে খুব তর্ক বিতর্ক হয়ে গিয়েছে; Nature-এ Dr Lowery তার রিপোর্ট দিয়েছেন। স্বীকার করতেই হবে, এ বিষয়ে জগতে মতদ্বৈধ আছে। গত বৎসর সোভিয়েট দেশের Academy of Science-এর বাৎসরিক অধিবেশনে প্রফেসর ক্যাপিট্‌জা Academy-র প্রেসিডেণ্ট ও অন্যান্য অনেক সভ্যের সঙ্গে ভিন্নমত হয়ে বলেছেন,—"Great Science"-এর অস্তিত্ব স্বীকার করতেই হয় যা প্রকৃতির নিগূঢ় কার্য্যাবলি ও তার সূত্রের সন্ধানে অবিকল্পভাবে নিযুক্ত থাকবে; এ সাধনায় সকল দেশের সকল বৈজ্ঞানিক একত্রিত। দেশ-ভেদে বা রাষ্ট্র-ভেদে বিজ্ঞানের ভেদ আছে বা গণকল্যাণে নিয়োজিত হওয়াই বিজ্ঞানের শ্রেষ্ঠ কাম্য প্রভৃতি যাঁরা মনে করেন—তাঁরা হয়ত বিষয়টিকে একটু ঘোলাটে করে ফেলেন। শেষ পর্য্যন্ত বিজ্ঞান, আর্ট, জ্ঞানচর্চ্চা নিশ্চয়ই মানবের পক্ষে সর্ব্বদাই কল্যাণকর।

তারকার অন্তরীক্ষে কোথায় কি অবস্থান্তর সম্পাদিত হচ্ছে, বিশ্ব expanding কিনা, সূর্য্যদেব একদিন নির্ব্বাপিত হবেন কিনা—এসবে আপাত কোন কল্যাণই মানবের আয়ত্তাধীন নয় কিন্তু মানবের চিন্তাস্রোত, জ্ঞান ও ধ্যান ধারণাকে পুষ্ট করে বলে সমস্তই পরম মানব কল্যাণের অন্তর্ভুক্ত। দেশে দেশে নিশ্চয়ই জ্ঞানী, বুদ্ধ, ঋষি আবির্ভূত হবেন যাঁরা নিউটন আইনষ্টাইনের মত উজ্জ্বল আলোকপাতে বিজ্ঞানের পথ আলোকিত করবেন। কিন্তু রাশিয়ার মত বিজ্ঞানের পরিবেশন ভারতের ভাগ্যে কবে হবে? দেশে দেশে সকলেই কত না বিজ্ঞান চর্চ্চায় রত, আমরা কোথায়? 'দিন আগত ঐ ভারত তবু কৈ?'

গিরিজাপতি ভট্টাচার্য্য

সম্পাতি

কয়েক ঘর গেরস্ত। আর কিছু হাফ-গেরস্ত। মানে, স্বামীস্ত্রীর গেরস্থালি তারাও পাতে কিন্তু লোকে মানে না। বলে, অমুকের সঙ্গে অমুক বেরিয়ে এসেছে। আর মন যখন ভাঙ্গে তখন তাদের ঘরও ভাঙ্গে। সামাজিকের তালিতে আটকায় না।

দু পাশে খোলার চালা তার মধ্যেখানে শানবাঁধানো সরকারী গলি। অখিলের ঘরের সামনে এক ফালি দাওয়া থেকে সোজা গলিতে নামা যায়। দু পা এগিয়ে গেলে উল্টো দিকে একটা ময়লা-ফেলার টব, প্রায় সব সময় আবর্জ্জনায় ভরা থাকে। দেওয়ালের গায়ে সরকারী নোটিশ সাঁটা আছে—'প্রস্রাব করিও না'। তার ওপরে ঘুলঘুলির মত ছোট্ট জানলাটা থেকে খকখকে কেশো বুড়োর চোখ দুটো প্রায়ই পাহারা দেয়। বুড়ো পেছন ফিরলেই লোকে সেখানে প্রস্রাব করে।

তখনো ভোরের অন্ধকার খুব ঘন। অখিলের রাত্রে ভাল ঘুম হয়নি। একে তাড়ির নেশাটা তেমন জমেনি, তার ওপরে মেজাজও খারাপ। দাওয়ায় শুয়ে শুয়ে গত রাত্রের জাবর কাটছিল :

"সদি ছুঁড়ীর বড় পটপটানি। ধরেছিলুমই না হয় একটু হাতটা চেপে, তা আবার হেঁচকা দে ছাড়িয়ে নিল। সতী সাবিত্তিরি! বলে কিনা বে করবে তো গায়ে হাত দেবে, আর উটকো খেতে আসবে তো খ্যাংরা।

ভারি আমার নিষ্ঠেবতী রে! তোকেও জানি, তোর বাপ-মাকেও জানি। পাশাপাশি ঘরেই তো এদ্দিন বাস করলুম। কোন্ পুরুতে তোর বাপ-মার বে

দিয়েছিল শুনি? আর তুই—তুই যে দু বছব আগে ঐ কামাব ছোঁড়াব সঙ্গে চলে গেলি সে কি গাঁটছড়া বেঁধে?

কামাব ছোঁড়া মল, পেটেব বাচ্চাটাকেও দু মাসেব মধ্যে খেলি। এখন বাপেব ঘরে উঠতে ঝাঁটা বসতে ঝাঁটা এই তো তোব চব্বিশ প'ব। তবু অত ঠ্যাকাব কিসেব?

বে কবব না আবও কিছু। ডবকা ছুঁড়ী, দেখি কদ্দিন পটপটানি থাকে। তদ্দিন ক্ষ্যান্ত আছে, দুগ্‌গা আছে—নগদ কাববাবেই বেশ চলবে।"

তবু অখিলেব মনে একটু খচখচ কবছে তাই ঘুম আব আসছে না। ভোবেব আলো বাড়ছে, চোখে এসে লাগছে। তার ওপবে এক পেট তাড়িব প্রস্রাবেব চাপ।

অখিল উঠল। প্রস্রাব কববাব জন্যে ময়লা ফেলা টবটাব দিকে এগুল।

গলিব ও মুড়োয একটা কুকুবেব ঘুম ভেঙ্গেছিল। সকালেব জল খাবাবেব আশায় হাই তুলতে তুলতে আর মাঝে মাঝে মাটি শুঁকতে শুঁকতে অতি গজগমনে সেও ময়লা টবেব দিকে যাত্রা কবল।

শাদা মত কি একটা জিনিসেব পাশে দুটো কাক। একবার কবে এগিয়ে যাচ্ছে আবাব পেছিযে এসে ঘাড় বেঁকিযে কি যেন পবামর্শ কবছে। অখিলকে কাছে আসতে দেখে উড়ে গিয়ে টবটাব কাণাব ওপব থেকে কা-কা কবতে লাগল। অখিল সেইখানেই প্রস্রাবে বসল।

অন্ধকাব ফিকে হয়ে এসেছে। কিন্তু গলিটা তখনো ঘুমচ্ছে। কেশো বুড়োটা পর্য্যন্ত ওঠেনি।

তাড়িব প্রস্রাব অল্পে শেষ হয় না। এক সাবি খুদে খুদে লাল পিঁপড়ে আসছে, যাচ্ছে। অখিল আব একটু বাঁ দিকে সবে বসল।

শাদা মত জিনিসটা একটা ন্যাকড়াব পুঁটুলি।

পুঁটুলিটা নড়ে নাকি? নাঃ চোখেবি ভ্রম। সদির বাপ কাল কি পচা মালই খাওয়াল। সাবা বাত একটু মৌজও হল না আব এখন সকাল বেলা শালা চোখে ঝোঁক চাপাচ্ছে!

কুকুবটা এসে আব সব জিনিষেব সঙ্গে পুঁটুলিটাকেও শুঁকল। তাবপব একটু নিবিষ্ট মনে পুঁটুলিব এ মুড়ো থেকে ও মুড়ো পর্য্যন্ত শুঁকল। সামনের পা-টা দিয়ে

দু একবার আঁচড়াল। শেষে পুঁটুলিটাকে দাঁতে চেপে ধরে নিজের মাথাটা ঝটকা দিল।

অখিলের নেশা কি এখনো যায় নি? প্রস্রাব সেরে উঠছিল, শুনলো কুকুরের মুখের পুঁটুলি থেকে কি রকম অদ্ভুত আওয়াজ আসছে। অনেক রাতে ভাঙ্গা বাড়ীর কোটরের ভেতর থেকে হারিয়ে যাওয়া পেঁচার বাচ্চা যেন চাপাসুরে কাঁদছে।

পুঁটুলির নেকড়া খানিকটা কুকুরের মুখে উঠে এল।

একটা ছোট্ট মাথা, চুলটুল নেই। নাকের একপাশটা। এক দিকের চোখ। ভুরু খুব সামান্য বলে কেমন অদ্ভুত দেখায়।

অখিলের সারা গা কাঁটা দিয়ে উঠল। প্যাঁচা নয় মানুষের বাচ্চা, জ্যান্ত, চিঁচিঁ করে টেনে টেনে কাঁদছে।

অখিল ভাবল, পালাই। এক দৌড়ে দাওয়া, তারপরে মাদুরটা ঝট করে তুলে নিয়ে একেবারে ঘরের ভেতর খিল বন্ধ করে শুই। আমি কিচ্ছু দেখিনি, কিচ্ছু জানি নে.........

কুকুরটাও প্রথমে একটু ঘাবড়ে গিয়েছিল। তারপরে আবার দাঁত বাড়াল।

অখিলের পালানো হল না। মাটিতে পা ঠুকে 'হেট' বলে তাড়া দিতেই কুকুরটা সরে গেল। অখিল আস্তে আস্তে পুঁটুলিটাকে তুলে এনে দাওয়ায় মাটির ওপর শুইয়ে দিল।

হতভম্বের মত চুপ করে বসে। হঠাৎ মনে হল—পুরো একটা গোটা আস্ত ছেলে তো? না খোঁড়া, ভাঙ্গা, আধখানা? উঠে গিয়ে গায়ের ন্যাকড়াগুলো সরিয়ে ভাল করে দেখল। না, আস্তই বটে। একটু একটু হাত পা নাড়ছে, নিঃশ্বাস ফেলছে।

আবার চাপাচুপি দিয়ে রেখে দিল। দূরে ধাঙ্গড়ের গাড়ীগুলো ঝড় ঝড় করে চলে গেল। কেশো বুড়োটার কাশির ধমকে গলি সরগরম হয়ে উঠল।

অখিল আরও খানিকক্ষণ নিঃঝুম বসে থাকল। তারপর উঠে গিয়ে সদির বাপকে ডাক দিল।

* * *

ক্রমশ ক্রমশ ভিড় জমে উঠল।

চার পাঁচ মাস আগে হলে কেউ ফিরেও চাইত না। রাস্তার ধারে, আঁস্তাকুড়ের পাশে মরা বা আধমরা বাচ্চা খোলাখুলি পড়ে থাকবে, রোজ দুবেলা পড়ে থাকবে এই

ছিল তখনকার নিয়ম। দেখে দেখে অরুচি হয়ে গিয়েছিল। কিংবা বলা যায় অরুচি চলে গিয়েছিল। ফুটপাথে মরা বা মরমর লোক পড়ে থাকলেও সামনে চায়ের দোকানে চা খেতে বাধত না।

যা প্রকাশ্য, যা নিত্যকার তাতে মানুষের কৌতূহল ছিলনা। আজ চার পাঁচ মাস পরে অখিলের কুড়িয়ে পাওয়া ছেলের মধ্যে দিয়ে সেই প্রাচীন কৌতূহলে আবার সুড়সুড়ি লাগল। যেহেতু এখন আর রাস্তার ধারে লোক মরে পড়ে থাকেনা সেহেতু ময়লার টবে জ্যান্ত ছেলের পেছনে নিশ্চয়ই কোন কাহিনী আছে। দৈনিক দুঃখের ফেন-ভাতের ভেতর হয়তো কিছু মুখরোচক চাটনি পাওয়া যাবে। তাই ভিড় জমল।

হাঁটুর ওপর গামছা তুলে ডিং মেরে মেরে ময়লার ছোঁয়াচ বাঁচিয়ে এলো মুদী গিন্নি। নাকে কাপড় দিয়ে পিচ পিচ করে থুতু ফেলতে ফেলতে বল্ল, "ওমা নদ্দমা ঘেঁটে ঘেঁটে আঁতুড়ে ছেলেটাকে তুলে নে এলি, একটু ঘেন্নাপিত্তিও নেই!"

ঘোমটার আড়াল থেকে শাঁখারিদের বৌ বল্ল, "আহা কোন্ আবাগীর বাছা গা! একেবারে বিইয়েই ফেলে দেচে।"

ক্ষ্যান্ত বল্ল, "না বিইয়েই ফেলেনি। ওই তো নাড়ীটাড়ী কেটেচে, ধুয়ে দেচে বলেও তো মনে হচ্ছে।"

মুদী গিন্নি আবার অখিলের দিকে চেয়ে ফোঁস করে উঠল, "কার ছেলে জানিসনি তো ঘাড়ে করে তুলে নে এলি এত গরজ কেন্ রে তোর মুখপোড়া? পাড়ার সোমত্ত ছুঁড়ীগুলোর পেছনে পেছনে ঘুরিস আর তুই জানিসনি! কাল রাত্তিরে কোতা ছিলি বল্।"

বয়সে অনেক ছোট হলেও অখিল তার এক কলসীর ইয়ার; তাড়ির খরচাটাও প্রায়ই দেয়। সদির বাপ অখিলের পক্ষ নিয়ে সাফাই দিল, "কি যে আপনি বল ঠাকরুণ! ওকিল আমাদের তেমন ছেলেই নয়। কত রাত্তির পয্যন্ত তো আমার সঙ্গেই বসে। আমরা এই একটু তোমার গে—আমোদ কচ্ছিলুম। তারপর উটে গে দাওয়ায় শুয়ে ঘুমুল, সেই তো আমি মুততে উটে দেকনু।"

"তবে এ কার ঘরের ছেলে? এ পাড়ারই হবে নিশ্চয়—ভিন্ পাড়া থেকে তো আর কেউ একেনে ফেলতে এসবেনা!" মুদী গিন্নি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে উপস্থিত সবার মুখের দিকে দেখতে লাগল, যেন ওখান থেকেই আসামী ধরে দেবে।

ক্ষ্যান্ত ছেলেটার পাশে বসে দেখছিল। বল্ল, "না না, এ ভদ্দর নোকের ছেলে। দেকোনা, পুঁটলির ওপর শাদা কাপড কিন্তু ভেতরে শালের টুকরো দে জড়ানো রয়েচে। এমন দামী শাল এ পাড়ার কেউ ককনো চোক্কেও দেকেনি"

শাঁখারি বৌ সায় দিল; "হ্যাঁ বাপু এ ভদ্দুর ঘরেরই কেলেঙ্কারি। দেকচ, কেমন খাসা টানা টানা চোক, চ্যাওড়া কপাল। দিনকাল যা পড়েচে, ভদ্দর ঘরের আর ভাস্যি নেই।"

পবণের ছোট গামছাটা গায়ে জড়াবার বৃথা চেষ্টা করতে করতে শাঁখারি বৌয়ের কথাটা লুফে নিয়ে মুদী গিন্নি বল্ল, "ঠিক বলেচ বাছা, ঠাককুণদের বেলায় নাকি দোষ নেই, যত দোষ এই আমরা নন্দ ঘোষ! ঐ যে ঐ চারতলা কোটার ছুঁড়ীগুলো—ধাড়ী ধাড়ী আইবুড়ো মাগী সব, খট খট করে রাস্তা মাড্যে মাড্যে নাকি আপিস যায়। এক পাল ছোঁড়া তো ফেউ নেগেই আচে, আর তাদের সঙ্গে কি হাসাহাসি, কি গলাগলি। চাকরি করিস করিস—এই আমাদের কত মেয়েও তো ধানকলে কাজে যায়—তা ছোঁড়াদের সঙ্গে অত ঢলাঢলি কেন?"

বিঁধবার বস্তু খুজে পেরে আলোচনা এবার রসাল হয়ে জমে উঠল। ঐ চারতলা বাড়ীর মেয়েদেরই এই কাণ্ড কিনা, ওঁদের মধ্যে কোন্‌টাকে কিছুদিন দেখা যায়নি, কোন্‌টার চেহারা দেখে এদের কারু কারু নাকি আগেই সন্দেহ হয়েছিল—সে সব নিয়ে মেয়ে ছেলে সবাই তর্ক আরম্ভ করল।

কেউ কেউ আবার মন্তব্য করল যে ভদ্দর ঘরের ঘোমটার ভেতরও আজকাল যথেষ্ট খেমটা নাচ চলে, অর্থাৎ অভাব নাকি পর্দানশীন ঘরেরও স্বভাব নষ্ট করছে। এদের অনেকেই সেই সব বাড়ীতে ঝি-গিরি করে। তারা বসিয়ে বসিয়ে কাহিনী বলে বা বানিয়ে চল্ল। আড়াল থেকে শোনা কোনো ঘরের দু এক টুকরো কথা, কোথাও মন ভাঙ্গাভাঙ্গির উত্তেজনার খানিকটা ঝাঁঝ, কোথাও বা অসাবধান মুহূর্ত্তের একটুখানি ছেঁড়া দৃশ্য—আর সে সবেরই ওপর কল্পনার কয়েক পোঁচ রং।

কুড়িয়ে পাওয়া ছেলেটার কথা একেবারে চাপা পড়ে গিয়েছিল। কিন্তু অখিলের ভুলবার উপায় ছিলনা। ওকে নিয়ে কি করা হবে তা তো কেউ বলেনা! ওরে বাপরে শেষকালে আমার ঘাড়েই চাপবে নাকি? সে ব্যস্ত হয়ে খেঁকিয়ে উঠল, "ন্যাও একন পরচচ্চার খ্যান্ত দেও, বাচ্চাটাকে নিয়ে কি করা হবে তাই বল।"

কেউ বল্ল পুলিশে দাও, কেউ বল্ল অনাথ আশ্রমে দিয়ে এস। আড়কাটির কাছে বিক্রী করে ফেলবার পরামর্শও কেউ কেউ দিল। কিন্তু এই সব কথা ওঠার সঙ্গে সঙ্গে

দেখা গেল জটলাব উৎসাহও নিভে গেছে, যে-যাব পবামর্শ দিযে বা না দিয়ে গুটি গুটি ঘরের দিকে পা বাড়াচ্ছে।

অখিল দস্তরমত ভয় পেয়ে গেল। কয়েকজন পুরুষ মানুষকে চেপে ধবে বল্ল, "বাঃ সব্বাই সরে পড়চ যে, বাচ্চাটাব ব্যবস্থা ঠিক কবলেনা।"

আবাব খানিকটা তর্কাতর্কি হল। পুলিশের কাছে নিয়ে গেলেই ব্যবস্থা হবে সে বিষয়ে কাবও ভবসা দেখা গেল না। থানা-পুলিশ আর বাঘ যে একই ধরণেব জিনিস, একবার ছুঁলে আঠাব কেন উনপঞ্চাশ বকমের ঘা হতে পারে—অখিলেব সে মতে সবাই সায় দিল। কিন্তু যাবাব তো আর কোন জায়গা নেই। সদিব বাপ যখন নজির দেখাল, কটা চোরই বা পুলিশ ধরতে পাবে, কিন্তু চুবি হলেই সবাই পুলিশেব কাছেই ছোটে না কি ?—তখন শেষ পর্য্যন্ত স্থির হল বাচ্চাটাকে নিয়ে থানায়ই যাওয়া যাক।

ববিবার, কাজে যাবাব ওজব তোলা যায়না। আব দুজনকেও অখিলের সঙ্গে যেতে হল। ছেলেটাকে ঘাড়ে কবে অখিল আব তাবা থানায় চল্ল।

* * *

থানায় ঘণ্টার পর ঘণ্টা বসে। দাবোগা বাবু কোথায় তদন্তে বেবিয়েছেন, তিনি না এলে তো আব এ বকম শক্ত ব্যাপাবেব কিনাবা হতে পাবে না।

ছেলেটা মাঝে মাঝে ঘুমচ্ছে, মাঝে মাঝে চিঁ চিঁ কবে কাঁদছে। সঙ্গেব লোক দুটো যাবাব জন্যে অনববত উসখুস করছে—তাদেব কাজেব কত ক্ষতি হচ্ছে, পথ থেকে শখ কবে এ আপদ কুড়োনো কেন বাপু, পথেব ছেলে আবাব পথে বেখে দিলেই তো চুকে যায় ইত্যাদি মন্তব্য শোনাচ্ছে।

অখিলেব কোলে ছেলে, মাঝে মাঝে সেদিকে চায়। একদিন বা দুদিনেব বাচ্চা। কি রকম অদ্ভুত নিরাশ্রয়, অপদার্থ। পাশ ফিবতে পাবে না, ঘাড়টা পর্য্যন্ত তুলতে পাবে না, ঘাড়েব তলে হাত দিয়ে ঠেকো লাগিয়ে রাখতে হয়। অজান্তেই অখিল নিজেব ঘাড়ে হাত দিল। শক্ত, শক্তিমান, সোজা। যখন মাসেলের কসবৎ কবে তখন কত ছুঁড়ী অবাক হয়ে চেয়ে দেখে। ··· বেঁচে থাকলে এই ছেলেটাই হয়তো একদিন ছুঁড়ীদেব পেছনে ছুটবে। আজ ঘাড় নড়ে না, দাঁত নেই, জোব কবে কাঁদতে পর্য্যন্ত পাবে না। একেবাবে দুর্ব্বল, অসমর্থ ···

শেষ পর্য্যন্ত সঙ্গীদেব একজন বল্ল, "না বাপু, আমাব আবাব বৈকেলে বদলি-ডিউটি আছে। খেয়ে দেয়ে তৈবী হতে হবে। আমি আব থাকতে পাববনি, চল্লুম।"

দ্বিতীয় জনও কিছু না বলেই আস্তে আস্তে তার পেছনে পেছনে চলে গেল।
অখিল গুম হয়ে বসে রইল।

দুপুর রোদে গলদঘর্ম হয়ে দারোগা বাবু ফিরলেন। তখন কি আর কোনো কাজের কথা ভাল লাগে? কোনো রকমে তাড়াতে পারলে বাঁচেন।

ছোট দারোগাদের কাছে ব্যাপারটা শুনে নিয়ে অখিলকে ডেকে চোখ পাকিয়ে বল্লেন, "ছেলে কুড়িয়ে পেয়েছিস? বটে! কে দেখেছে? বল্ ব্যাটা নাম বল্— যদি সাক্ষী না দেওয়াতে পারিস তো পিঠের চামড়া তুলে দেব।"

সত্যিই তো কুড়োবার সময় কেউ দেখেনি। আর যদি দেখেও থাকত দারোগা বাবুর ধমকের সামনে চুপ মেরে যেত।

অখিল বল্ল, "অত ভোর বেলায় কে দেখবে? কিন্তু হুজুর আমি গরীব মানুষ, ছাপাখানায় কাজ করে খাই—কেউ দেখেনি বলে কি এই বোঝা আমার ঘাড়ে চাপবে?"

বলে দারোগা বাবুর পা জড়িয়ে ধরতে গেল—"হুজুর আমি ওকে কি ক'রে পুষব?
কোথায় রাখব, কি খাওয়াব? দোহাই হুজুর একটা ব্যবস্থা করে দিন!"

দারোগাদের স্বভাবই সন্দিগ্ধ। অখিলের কাতরানি দেখে দারোগা বাবুর এবার সত্যিই সন্দেহ হল লোকটা বোধ হয় ভাঁড়াচ্ছে। বল্লেন, "ওঃ খুব তো ভিজে বেড়াল দেখছি। এখন ছেলে নিয়ে ঘরে যাও বাছাধন, আমরা তদন্ত করে সব বার করে নেব খন, দাঁড়াওনা। ভাল চাস তো বলে ফেল্—এ কোন্ বাড়ীর কেলেঙ্কারি, কদ্দিন ধরে কুটনির ব্যবসা চালাচ্ছিস?"

একে দুপুর পর্য্যন্ত না খেয়ে না দেয়ে বসে থাকার বিরক্তি; তার ওপর দারোগা বাবুর এই অন্যায় আক্রমণ। পুলিশের বিরুদ্ধে বহু দিনের যত নালিশ মনে ছিল তাও অখিলকে উস্কানি দিল। যথা সম্ভব সাবধান হলেও একটু তেড়েই বলে ফেল্ল, "হ্যাঁ করুন না তদন্ত, তাহলেই তো জানতে পাবেন। পাড়ায় এত চুরি তার একটারও কিনারা হয় না, আর তদন্ত যত ভাল মানুষকে ফাঁসাবার জন্যে।"

আর যায় কোথায়! দারোগা বাবু ফেটে পড়লেন, "বড় আস্পদ্ধা হয়েছে ছোটলোক কোথাকার! তোর নাম না অখিল সাঁই? দু দুবার তোর নামে রিপোর্ট এসেছে, এবার তোকে হাজতে ভরে ছাড়ব। এই 'দরওয়াজা', বেটাকে ঘাড় ধরে বের করে দে। আর জমাদারকে বলিস ওর চলাফেরা যেন রিপোর্ট করে।"

অখিল একেবারে কেঁচো হয়ে গেল। ওবকম অবিশ্যি সবাই করে, ছাপাখানায় কাজ করলে এই মাগগির বাজরে এক আধ সেব সীসে তো অমন কত কম্পজিটবই সরায়। কিন্তু মালিক বেটা অখিলেব নামেই বিপোর্ট করেছে। প্রমাণ অবিশ্যি নেই তবুও পুলিশেব কথা বলা যায় না, কিসে কি লাগিয়ে দেয়।

* * *

ভাবনা, অপমান, ক্ষিদে আব পড়ন্ত দুপুবের রোদে জ্বলতে জ্বলতে অখিল বাসায় ফিবে এল। মাদুরটা তখনো দাওয়াযই পড়েছিল। তাব ওপব ছেলেটাকে দুম কবে শুইয়ে দিযে খানিকক্ষণ গোঁদ হযে বসে রইল, তারপব নাইতে গেল।

খেত হোটেলে। চান সেবে ছেলেটার দিকে না তাকিযেই খেতে চলে গেল।

ববিবাব খাওয়াব পব থিয়েটার রিয়ার্সেলেই যাবার কথা। কিন্তু নেয়ে খেয়ে মনটা তখন সুস্থিব হয়েছে, একটু দয়ামায়াবও ঠাঁই হবেছে। পা দুটো বাসাব পথেই চল্ল।

প্রথম বিকেলের এক ফালি বোদ দাওযায় ছেলেটাব পায়েব ওপব এসে পড়েছে। বোদে পুড়ছে কিন্তু পা সবিয়ে নেয় নি। বোধ হয় সরাতে পাবে না বলেই। একটা বেড়াল বসে বসে গা-টা চাটছিল, অখিলকে দেখে লাফ দিয়ে পালাল।

অখিল ভাবল: একেবাবে অপদার্থ, কোনো মুবোদই নেই! বেড়ালেব বাচ্ছাও তো চোখ বুঁজে হাঁতড়ে হাঁতড়েই মাব মেইটা টেনে টেনে ধবে। আব তুই, তোব মা কোথায, দিলি কেন তাকে এমনি কবে ছাড়তে ?

ছেলেটাব চোখ বন্ধ, মুখটা কি বকম ফ্যাকাশে নীল। অখিল একটু চমকে উঠল। তাড়াতাড়ি বুকের ওপর, নাকের নীচে হাত দিয়ে দেখল—না মবেনি। আহা কেষ্টব জীব, কতক্ষণ কিচ্ছু খায় নি!

ছেলেটাকে যত্ন কবে তুলে ঘবে শুইয়ে দিয়ে অখিল দোকান থেকে দু পযসাব দুধ নিয়ে এল। কিন্তু খাওয়াবে কি কবে? কি কবে খাওয়াতে হয় আঁতুড়ে বাচ্চাকে? দুচ্ছাই, ঘোঁট কববাব সময় পাড়া ভেঙ্গে মাগীরা এসেছিল, এখন কি আব কোনো শালী এদিক মাড়াবে?

সদিব বাপ ঘবে নেই। যেতে হলে ঐ সদি ছুঁড়ীব কাছেই যেতে হয়। কিন্তু কাল রাত্রেব অপমানেব পব ওব মুখও আব দেখতে ইচ্ছে কবে না। ছুঁড়ী না তো মাগী, কেলে ধুমসো মাগী। পয়সা ফেল্লে অমন গণ্ডায় গণ্ডায মিলবে। ওঃ বিয়ে কত্তে হবে, ওনাকে নিয়ে কোটা-বালাখানা দিতে হবে, কি আমাব নূপের দুগগা ঠাকরুণ রে

তবু যেতে হল সেই সদিরই কাছে। ঘরের ভেতর দিয়ে যে দরজাটা খুল্লে সদিদের উঠোনে পড়ে, ঝড়াং করে সে দরজাটা খুলে দুপ দুপ করে অখিল একেবারে ওদের ঘরের সামনে হাজির হল।

সদি বাসন মাজছিল। অখিলের চলার ভঙ্গী দেখে নাক কপালে তুলে বল্ল, "ও বাবা এযে এক্কেবারে মানোয়ারি গোরা! ঘর দোর সব ভাঙ্গবে নাকি? তবু যদি মাস মাস ভাড়া দেবার মুরোদ থাকত।"

"হ্যাঁ যত মুরোদ তোদেরি। সকালে ঘোঁট করার সময় তো সব গলা বাড়িয়ে বাড়িয়ে শকুনের মত এগিয়ে এলি, আর এখন ছেলেটাকে আমার ঘাড়ে চাপ্যে দে যে যার পিট্টান দেচে। এ মুরোদের আর বড়াই করিসনি।"

ভুরু বেঁকিয়ে মুখটা ছুঁচলো করে সদি বল্ল, "রাস্তা থেকে একটা ছানা কুড়িয়ে এনেচে, কোন্ অজাত কুজাত ঠিক নেই, তা নে আবার কত ঢং!"

"আর তুই বড় ভচ্চাযি্যর গিন্নি"—বলে সদির ভূতপূর্ব্ব "নোক" সেই কামার ছোঁড়ার বাপ-মা সম্বন্ধে অখিল খুব খারাপ একটা মন্তব্য করল।

এইখানটায়ই সদির ব্যথা। সে গোঁজ হয়ে ঘর ঘর করে বাসন মেজে চল্ল।

একটুখানি থেমে এদিক ওদিক্ চেয়ে অখিল বল্ল, "মানুষের উপকার তো তোদের কত্তে নেই। তা একখান ঝিনুক টিনুক কিছু দিতে পারিস?"

"কি হবে?"

"ন্যাকা, কিছু বুঝতেও পারে না। ঐ বাচ্চাটাকে দুধ খাওয়াতে হবে।"

এবার সদি হি হি করে হেসে উঠল—"একেই বলে না বিইয়ে কানাইয়ের মা! ঐ একদিনের বাচ্চা ঝিনুকে দুধ খেতে পারে? তুমি কি নিজেই পলতে করে দুধ খাও—জাননা ছোট বাচ্চাকে পলতেয় দুধ খাওয়াতে হয়।" বলে সদি আবার হাসতে লাগল।

হাসির ধমকে তার উঠন্ত-পড়ন্ত বুকটার দিকে অখিল একবার লোভীর মত তাকাল। তারপর "হ্যাঃ যত সব—" বলে দুপ দুপ করে আবার ঘরে ফিরে এল।

..........পলতে এনেছে, এক্কদিক দুধে ভিজিয়ে ছেলেটার মুখেও ধরেছে, কিন্তু ছেলে তেমন দুধ টানতে পারছেনা, খালি কাঁদছে।

সদি দরজা দিয়ে গলা বাড়িয়ে দেখে বল্ল, "ওমা এযে হেরিকেনের পলতে, ছেলের মুকে একনই আগুন দেচ্চ নাকি? মোটে দু ফোঁটা দুধ, পলতেই তো সব খেয়ে ফেল্ল।

ন্যাকড়ার পলতে বানাতে হয় তাও জান না।" বলে আবার খিল খিল করে হেসে উঠল।

"যা যা তোকে আর সাউখুড়ী করতে হবে না" বলে অখিল তার মুখের ওপর দরজাটা ঝনাৎ করে বন্ধ করে দিল।

তারপর উঠে গিয়ে কাপড় ছিঁড়ে পলতে বানিয়ে ছেলেটাকে দুধ খাওয়াতে লাগল।

* * * *

ছেলেটাকে নিয়ে ভাল আপদেই পড়েছে। ছাড়াও যায় না ছাড়ানোও যায় না।

একটা অনাথ আশ্রমে গছিয়ে দেবার চেষ্টাও করেছিল। আশ্রমের কর্তা বল্লেন, "সুপারিশ আছে, কোন বড় লোকের? অবিশ্যি এম্‌নিও ব্যবস্থা করে দিতে পারি। একশো টাকা লাগবে।"

অখিল অবাক হয়ে গেল। একশো টাকাই যদি আনতে পারবে তবে অনাথ কিসের?

কর্তা বাবু মুরুব্বি চালে বল্লেন, "তুমি তো ভদ্রলোক নও, তুমি বুঝতে পারবে না। গরীবদের অনাথ ছেলেমেয়েদের জন্যে এ অনাথ আশ্রম নয়।"

অখিল আরও বুঝতে পারল না। অনাথ তো অনাথই, যার কেউ নেই, কিচ্ছু নেই। তার আবার ধনী-গরীব কি?

এ রকম বোকা লোককে বল্লে কোন দোষ নেই ভেবে কর্তা বাবু তাকে বোঝালেন:- "এ অনাথ আশ্রম করেছে কারা? যাদের আশ্রম করবার টাকা আছে। তারা টাকা খরচ করছে কেন? নিজেদের সমাজের কেলেঙ্কারির নমুনা যাতে বাজারে ছড়িয়ে পড়তে না পারে। যারা কেলেঙ্কারির আসামী, হয় তারা নিজেই টাকা খরচ করে আর নয়তো বন্ধুবান্ধবের কাছ থেকে সুপারিশ নিয়ে আসে।"

আরও খোলসা করে বল্লেন, "যাদের পা আজও পেছলায়নি তারাও আশ্রম থেকে ভরসা পায়—ভবিষ্যতে কখনো পেছলালেও ইজ্জতের ঠাট বজায় রাখার ব্যবস্থা হাতে রইল। তোমাদের মত লোকের দায়ও যদি আশ্রমকে সামলাতে হয় তবে আশ্রমের মুরুব্বিদের দায় সামলাবে কে?"

এবার অখিল বুঝল। এবং বুঝবামাত্র ছেলেটাকে নিয়ে ঘরের দিকে রওনা হল।

......একি জ্বালারে বাপু! একরত্তি অবোলা শিশু। একেবারে নিঃসহায়, নিরর্থক। চোখ পিটপিট করে, কথায় কথায় কাঁদে। হাসি শিখতে এখনো অনেক দেরী। কোনো দিন শিখবে কিনা কে জানে?

দুনিয়ার ঝঞ্ঝাট।······কেষ্টনগরের পুতুল বুড়োর মত নড়নড়ে, হলহলে ঘাড়। আর নরম চামড়ার মাথা। মাটিতেও রাখা যায় না, অখিলের উঁচু বালিশে দিলে হয়তো ঘাড়টাই ভেঙ্গে যাবে। শ্যামবাজারে অখিলের দূর সম্পর্কের দিদি থাকে, অনেক কাচ্চাবাচ্চা। তার কাছ থেকেই একটা ছোট্ট বালিশ চেয়ে আনতে হল।

আর পারা যায় না বাবা। তিন চার দিনেই হাড় মাস ভাজা ভাজা করল। খেটে-খুটে ছাপাখানা থেকে ফিরেছিল অখিল। তা সারা বিছানাময় ছেলেটা হেগে ভরিয়ে রেখেছে। বিচ্ছিরি সবুজ রং আর কি টক টক দুর্গন্ধ।

মাত্র আধ খাওয়া বিড়িটাই ছুড়ে ফেলে দিয়ে অশ্রাব্য বাপান্ত করে গাল দিল ছেলেটাকে, যেন কোন জোয়ান মরদকে গাল দিচ্ছে। তারপরে দুই নড়া ধরে ছেলেটাকে প্রায় আছড়ে ফেলে দিল ঠাণ্ডা মেঝের ওপর। ছেলেটা ককিয়ে কেঁদে উঠল। সেদিকে কানও না দিয়ে বিছানার চাদর টাদর টান দিয়ে উঠিয়ে কলতলায় চলে গেল। তখনো ছেলেটার মা-বাপ চোদ্দপুরুষকে প্রাণপণে গাল দিচ্ছে।

সদি কলতলায় কাপড় কাচছিল। একটু ভয়ে ভয়ে বল্লে, "তা অত চেঁচাচ্ছ কেন? আঁতুড়ে ছেলে অমন তো করবেই। চাদর টাদর গুলো দাও না আমাকে, আমিই কেচে দিচ্চি।"

অখিল মুখ ভেংচে বল্ল, "হয়েছে আর পীরিতের ঢং করতে হবে না।"

রাগটা গিয়ে সদির ওপরই পড়ল। আরও খিঁথিয়ে বল্ল, "নিজের ছেলেটাকে তো বিইয়েই খেইচিস। একন আবার দরদ উথলে উঠল।"

সদি এতটুকু হয়ে গেল। অখিলও রাগের চোটে আছড়ে আছড়ে চাদর কেচে চল্ল। সদির গায়ে ল্যাপটানো ভিজে কাপড়ের ভাঁজে ভাঁজে যে যৌবন স্পষ্ট হয়ে উঠল এবং যা অন্যদিন হলে অখিল কখনই আড়চোখে দেখে নিতে ছাড়ত না, সেদিকে পর্য্যন্ত আজ তাকিয়ে দেখল না।

*　　*　　*

শেষ পর্য্যন্ত অনেক বলে কয়ে শ্যামবাজারে দিদির কাছেই ছেলেটাকে কদিন রেখে দিয়েছিল।

তা মন্দ লাগত না। কাজ কর্ম্মের পরে দিদির বাড়ী গিয়ে ছেলেটাকে দেখলে খুশীই হত। এখন ওর জানে একটু প্রাণও এসেছে। তত বেশী কাঁদে না। মাঝে মাঝে হাত-পা ছুঁড়ে বেশ খেলা করে।

ঠোঁটেব ওপর হঠাৎ দেখলে মনে হয় অল্প অল্প গোঁফ উঠছে। কিন্তু আসলে সেটা নতুন, কটা কটা লোম।

পায়েব তলে শুড়শুড়ি দিলে কাঁদেনা। ছোট্ট ছোট্ট নবম পা-দুটো টানে আব ছাড়ে, যেন দম-লাগানো স্প্রিং, ওব ওপবে ওব নিজেব কোন ক্ষমতা নেই। হাতেব তালু দিয়ে আলগোছে ওর লাথি ঠেকাতে অখিলেব ভারি ভাল লাগে।

কিন্তু দিদিও নোটিস দিয়েছে। ভগ্নীপতি নাকি কিছুতেই বাখতে বাজি নয়। কাব ছেলে, কি বৃত্তান্ত ঠিক নেই, ঐ সব বেজম্মা সে ঘাড়ে বইবে না। আব শেষকালে থানা-পুলিশও তো হতে পাবে। দিদি বলেছে ছেলেটাকে আজই নিয়ে যেতে হবে।

খবরের কাগজেব জন্যে কয়েকটা খবব কম্পোজ কবতে করতে অখিল এই সব কথাই ভাবছিল। আজই ছেলেটাকে নিযে আসতে হবে। কোথায় বাখবে? কাব কাছে থাকবে? কে দেখবে?

হঠাৎ একটা খবব পড়ে প্রায় লাফিয়ে উঠল। আব একবাব খববটা ভাল কবে পড়ে নিয়ে মনে মনে বল্ল—হ্যাঁ হয়েছে। আজই নিয়ে যাব টিফিনেব পর। না হয় এক বেলা কামাই হবে। তা হোক। আপদ বিদেয় হবে তো।

কর্পোবেশন অফিসেব ঠিকানাটা জেনে নিল বাবুব কাছে। শ্যামবাজাব থেকে ছেলেটাকে তুলে নিযে কর্পোবেশন অফিসে চল্ল। সঙ্গে সেই খববেব টুকবোটাও নিয়েছিল।

কর্পোরেশনের অফিস শুদ্ধ লোক তার কথা শুনে হেসে একেবাবে ফেটে পড়ল। লোকটা কি বোকা? না পাগল?

অখিল তবুও বুঝতে চায়না। কাগজেব টুকবোটা তুলে বলে, "এই তো স্পষ্ট কাগজে বেবিযেছে। ময়লা টব থেকে খানকযেক ছেঁড়া কাগজ কে কুড়িয়ে নিযেছিল, তাও আপনাবা মামলা কবে আদায় কবেছেন। তবে ছেলেটাকে নেবেন না কেন?"

লোকদেব হাসি থামিয়ে অফিসাব একটু শান্তভাবেই বল্লেন, "বুঝলেন না, কাগজ—সেটা হ'ল পয়সাব জিনিষ, শহবেব লোকেব সম্পত্তি। তাতো কর্পোবেশনকে বাঁচাতেই হবে।"

"আব ছেলেটা? সেটা সম্পত্তি নয়? তবু এ তো অমনিই পাচ্ছেন, এব জন্যে মামলাও কবতে হচ্ছে না।"

ঘর শুদ্ধ লোকেব হাসি এবার আব ঠেকানো গেল না।

অখিল রেগেমেগে বেরিয়ে গেল।

সারা পথ হাঁটতে হাঁটতে। একটা বাচ্চা ঘাড়ে করে এই ভিড়ে ট্রামে ওঠে কার বাপের সাধ্যি!

উঃ এ বোঝা কি তাকেই বইতে হবে? বহুদিন বইতে হবে? কি শুখুরিই হয়েছিল ওটাকে কুড়িয়ে নিয়ে! দিত কুকুরটা শেষ করে তাহলেই ভাল হত।

সর্ব্বক্ষণের যন্ত্রণা—জ্বালিয়ে পুড়িয়ে খায়। হেগে মুতে বিছানা-বালিশ শেষ করে দিল। রাত্তিরে একটু চোখ বুঁজেছ কি ট্যাঁ ট্যাঁ ট্যাঁ—যেন চিল ডাকছে।

লোকসানই কি কম হল? সাতদিনের মধ্যেই দুবেলা কাজ কামাই। তার ওপরে এটা-ওটা-সেটা, আজ দুধ, কাল চিনি। যত বড় হবে ততই খাঁই বাড়বে। বাসায় পৌঁছে ঘরের ভেতর ঢুকে ছেলেটাকে ধপ করে বিছানার ওপর ফেলে দিল। যন্ত্রণায় বাচ্চাটা চেঁচিয়ে কাঁদতে লাগল গ্রাহ্যও করল না।

ঘরের দিকে পেছন ফিরে দাওয়ায় বসে গুম হয়ে ভাবতে লাগল। ছেলেটার কান্না সেখান পর্য্যন্ত ধাওয়া করেছে। গলায় যত জোর আছে তাই দিয়েই ছেলেটা চীৎকার করছে। একটানা, অনবরত।

নাঃ এ পাপ বিদেয় করতেই হবে। যেমন করে হোক বিদেয় করতে হবে। খুব শক্ত হলেও করতে হবে।

রাত্তিরের অন্ধকারে ট্র্যাম লাইনের ওপর রেখে দিলেই ব্যস। হয় ট্র্যাম নয় মিলিটারি গাড়ীর চাপে একেবারে ছাতু। কুকুরের বাচ্চা কি মানুষের বাচ্চা তাও কেউ বুঝতে পারবে না।

ছেলেটা সমান চীৎকার করছে। তবুও অখিল একটু শিউরে উঠল। না না—আমি কেন পেরানী হত্যে করব? ওর বরাতে থাকে ও বেঁচে যাবে। রাস্তার মধ্যেখানে নয়, একপাশে অ্যাড়পির দ্যালের আড়ালে শুইয়ে দোব।

তাও যদি অন্ধকারে লোকের পায়ে থেঁতলে যায়? কাজ নেই। এ ভদ্দরনোকের বদহজম, তাদের কাছে এগিয়ে দেওয়াই ভাল। ঐ যে ও পাড়ায় সেই মস্ত বড় ফটকওলা বাড়ীটা সেদিন দেখলুম। ভোর রাত্তিরে ওদের পাথরবাঁধানো রকে চুপি চুপি রেকে এসবো। সকালে দেখে কি ফেলতে পারবে?

…বিকেলের এক ফালি রোদটুকু গলির দেওয়ালগুলোর ওপর থেকে কখন সরে গেছে। এখন অন্ধকার নামবে। শিরশির করে একটু হাওয়া উঠেছে। ময়লা টবের কাছে সেই কুকুরটা তখনও কি খুঁজে খুঁজে বেড়াচ্ছে।

ছেলেটা তো আর কাঁদছে না। গলা শুকিয়ে দম আটকিয়ে গেল না তো!

অখিল তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকতে গিয়েই থমকে দাঁড়াল। ওদিকের দরজা দিয়ে সদি কখন ঘরে এসে দাঁড়িয়েছে। অখিলের দিকে তার পেছন। ছেলেটাকে কোলে জড়িয়ে ধরে বুকের কাপড় খুলে মাই দিচ্ছে।

ছেলেটার একটা হাত বুকের নীচে চাপা পড়েছে। আর একটা হাতের ছোট্ট মুঠো দিয়ে খামোখা অনবরত মাইয়ের ওপর ঘা দিচ্ছে। কচি ছেলেরা এমনিই করে। সদির মরে-যাওয়া ছেলেটাও করত। তার 'নোক' সেই কামার ছোঁড়া যখন বেঁচে ছিল তখন এই নিয়ে সদির সঙ্গে কি খুনশুটিই না করত!

অখিল থেমে দাঁড়িয়ে একদৃষ্টে তাকিয়ে রইল। মেয়ে মানুষের বুক। …মেয়েমানুষ নয়, ইস্তিরি!

আস্তে আস্তে অখিল আগাল। তারপর একেবারে সদির পেছনে গিয়ে দাঁড়িয়ে বল্ল, "সদি, ও সদু, তোকে আমি বে করব। আর এই ছেলেটা হবে তোর—সম্পত্তি।"

সদি প্রথমে একটু লজ্জা পেল। তারপর মুচকি হেসে অখিলের আর একটু গা ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছেলেটাকে মাই দিতে লাগল।

সোমনাথ লাহিড়ী

শরৎচন্দ্রের দৃষ্টিকোণ

[পরিচয়ের আকার ছোট হওয়াতে বিপদের অন্ত নেই। এ বিপদ লেখকেরও সম্পাদকেরও। কম শব্দে বেশি বলার অভ্যাস আমাদের আয়ত্ত হয় নি। তাই সম্পাদককে প্রবন্ধাদি ছেঁটে নিতে হয়। গত সংখ্যায় 'শরৎচন্দ্র ও বাঙালী সমাজ' প্রবন্ধটিরও সে দশা ঘটেছে—প্রথমাংশ প্রকাশিত হয়েছে, দ্বিতীয়াংশ ভেবেছিলাম একেবারেই বাদ দেওয়া যাবে। বাদই যেত, কিন্তু প্রকাশিত অংশের অসম্পূর্ণতা অধ্যাপক ধূর্জটি প্রসাদ মুখোপাধ্যায়ের চোখ এড়ায় নি। তিনি কথা তুলেছেন,—(১) শরৎচন্দ্রের humanism ও চণ্ডীদাসের humanism এক জিনিস নয়; (২) শরৎচন্দ্র সব সময়ে ব্যক্তিসত্তার স্বপক্ষে বিদ্রোহ করেন নি, আর (৩) বুদ্ধি অপেক্ষা

হৃদয় দিয়ে বোঝাই কি শ্রেয়ঃ? এসব প্রশ্নের কতকটা আলোচনা ছিল সেই প্রবন্ধের দ্বিতীয়াংশে। লেখকের পক্ষে তবু তা প্রকাশের ততটা প্রয়োজন ছিল না,—কারণ একটি সাহিত্য সভায় শরৎচন্দ্রের জন্মবার্ষিকীতে শরৎচন্দ্র সম্বন্ধে লেখক তাঁর সম্পূর্ণ বক্তব্য পূর্বেই বলেছেন, আর একটি ইংরেজি প্রবন্ধে তা আলোচনাও করেছেন। কিন্তু এই দ্বিতীয়ার্ধ প্রকাশের দায় এসে পড়ল এবার সম্পাদকের উপর—নইলে প্রবন্ধটি সত্যই সম্পাদকের গুণে অসম্পূর্ণ থেকে যায়! ইতি—সম্পাদক]

মানবতা-বোধ বা humanism এই যুগের সাহিত্যের একটা বড় সত্য। বর্তমান কালের সাহিত্য এক হিসাবে তাই মানুষের 'মানবীয়তা'র ঘোষণাপত্র হইয়া উঠিয়াছে। এ কালের সাহিত্য যেন বলিতে চাহে 'Ecce Homo', সে ঈশ্বর-পুত্র নয়, মানব-পুত্রই আর make his way straight কারণ, যুগে যুগে সে চলিয়াছে—চলিয়াছে, কেবলই চলিয়াছে। এক-একটা বাধা ভাঙিয়া পড়িতেছে আর তাহার মানবীয়তা,—তাহার স্বরূপ,—আরও উজ্জ্বল, আরও পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছে। কিন্তু কথা এই—এই সত্যটাও আবার নূতন রূপে এই যুগই আবিষ্কার করিয়াছে আর আবিষ্কার করিয়াছে অত্যন্ত বাস্তব কারণে, সভ্যতার বাস্তব বিকাশে। যে ধনিকতন্ত্র সামন্ততন্ত্রের ছাঁচকে ভাঙিয়া ফেলিয়া বলিল, 'তুমি শুধু দাস নও, প্রভু নও, স্ত্রী নও, স্বামী নও, তুমি মানুষ—মানুষই;'—ব্যক্তির স্বাধীনতা স্বীকার করিল,—তাহাতেই মানুষ নূতন করিয়া বুঝিল 'man's man for a' that.' অবশ্য সেই ধনিকতন্ত্রই এই সত্যকে আজ চাপা দিতেও চেষ্টা করিতেছে। সে 'প্রমাণ-সই' মানুষ চায়, 'মজুর' চায়, 'কেরাণী' চায়, regimented robot চায়, মানুষ সহ্য করিতে চায় না। কিন্তু কথা এই যে, মানুষের এই মানবীয়তাকে এই ধনিকতন্ত্রই নূতন করিয়া আবিষ্কার করিয়াছে। তাহা আর নাকচ করিতেও সে পারিবে না।

প্রসঙ্গক্রমে কথাটা বুঝিয়া লইতে পারি যে, এই 'মানবীয়তাবাদ' বা 'মানবতা-বোধ' কি অর্থে 'নূতন'। মানুষ যখন হইতে নিজেকে মানুষ বলিয়া চিনিয়াছে, তখন হইতেই এক অর্থে মানবতা-বোধ তাহার মধ্যে জন্মিয়াছে। কিন্তু সে অত্যন্ত অস্ফুট বোধ—সেখানে মানুষ তো প্রকৃতির হাতের অসহায় খেলার পুতুল! তাই সেইদিনকার মানবতা-বোধ অর্থ মানুষের মর্যাদা বোধ নয়, মানুষের অসহায়তা-বোধ, মানে, দেবতার মহিমা-বোধ,—সে দেবতা মঙ্গলকাব্যের দেবদেবীও হইতে পারেন, আবার গ্রীক্-স্বর্গের জিউস্ বা নিয়তিও হইতে পারেন। সভ্যতার সেই প্রথম স্তরে মানবীয়তা-বোধ ইহার

বেশি যায় নাই। ভারতবর্ষে আমরা মানুষের এই মর্যাদাকে চরম অভিনন্দন জানাইলাম এই বলিয়া—'তত্ত্বমসি'। উহার আসল মর্মটা এই—ব্রহ্ম সত্য, জগৎ মিথ্যা,—তুমি ব্রহ্ম হইতে পার, কিন্তু হাসি-কান্নাভরা মানুষ হিসাবে মিথ্যা। মানে, মানুষের এই মর্যাদা আসলে মানুষকে একেবারে চূড়ান্তভাবে 'নস্যাৎ' করিয়া দিল। গ্রীক্‌রা মানুষকে এইভাবে মর্যাদা না দিয়া দিল বাস্তব জীব হিসাবেই মর্যাদা। সমস্ত গ্রীক্ সাহিত্য আজও তাই মনে হয় এত আশ্চর্যরকমের 'আধুনিক'। সেখানে মানুষের মানবীয়তা স্বীকৃত হইল—অবশ্য সে মানুষকেও নিয়তিই ভাঙে-গড়ে। আর, এক হিসাবে তাই সে মানুষকে মনে হয় এত মহৎ ও এত ট্রাজিক। কিন্তু কথাটি এই, গ্রীক্‌দের চোখে মানুষ বলিতে শুধু গ্রীক্‌ই মানুষ—বর্বর জাতির মানুষেরা মানুষ নয়, আর গ্রীক্‌দের হেলটরাও নয় বা দাসরাও নয়। প্রাচীন সমাজে এইরূপই হইবার কথা—সেখানে স্ব-শ্রেণীর মানুষেরাই মানুষ, অন্যেরা শূদ্র বা পশুস্তরের জীব,—মানবতা-বোধ তখন পর্যন্ত এইরূপ সীমাবদ্ধ ছিল। তবু ইউরোপের রিনেইসেন্সের যুগে এই গ্রীক্ মানবতাবোধও মানুষকে মাতাল করিয়া দিল। 'মানুষ কি আশ্চর্য জীব—' মিরাণ্ডার মত সমস্ত রিনেইসেন্সের সভ্যতা যেন তাহাই আবিষ্কার করিল। ইহার পরে মানুষকে শুধু আর ভূমিদাস, শুধু পাইক, এমন কি, শুধু গৃহিণী বলিয়াও ভাবিলে চলিবে না। তাহাই ঘোষণা করিল ধনিকতন্ত্রের উদ্বোধকরা "মানুষের অধিকার" ঘোষণা করিয়া। তাহারই সত্য বার্নস্ উপলব্ধি করিয়া কহিলেন—"Man's man for a' that." নূতন মানবতা-বোধ পরিষ্কার হইয়া উঠিতে লাগিল—সেই বার্তা আমাদের পুরাতন সমাজ ভাঙিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদেরও কানে পৌঁছিল। এই পৃথিবীর মানুষকেই আমরাও নূতন করিয়া আবিষ্কার করিলাম। আবিষ্কার করিলাম—প্রধানতঃ ইউরোপীয় সাহিত্য ও জীবনযাত্রার রূপ দেখিয়া (গ্রীক সাহিত্য পড়িয়াই রিনেইসেন্সের মানুষও নূতন করিয়া ইহা আবিষ্কার করিয়াছিল)। কিন্তু আবিষ্কার নিশ্চয়ই করিতাম—কারণ, নূতন সভ্যতার উহাই নূতন বাণী। ঠিক এই কারণেই ইহাকে 'তত্ত্বমসি' বা চণ্ডীদাসের 'সহজ-মানুষের' সহিত অভিন্ন করিয়া দেখা ঠিক নয়। চণ্ডীদাসের বাণী আজ মনে হয় উহারই পরম বাণীরূপ। কিন্তু তাহা মনে হয় আমাদের চক্ষে,—যাহাদের চক্ষে মানব-ধর্ম পরম সত্য হইয়া উঠিয়াছে—এই বিংশ শতাব্দীর প্রথম মহাযুদ্ধের পরবর্তী বাঙালীদের চক্ষে। ইহার পূর্বে চণ্ডীদাসের সেই আশ্চর্য সত্য লইয়া কয়জন বাঙালী আশ্চর্য হইয়াছেন? চণ্ডীদাসও মানুষকে আধুনিক মানবতা-বোধের দৃষ্টিতে মানুষ বলিয়া চিনেন নাই—তিনি তাহাকে দেখিতেছিলেন সহজিয়াতন্ত্রের দিক

হইতে এক সত্য হিসাবে। সেই তন্ত্রে মানুষ একদিকে যেমন সত্য তেমন আবার মিথ্যাও। একদিকে সে সত্য, কারণ তাহার জীবন-লীলা এক পরম স্বাক্ষর; আবার অন্য দিকে সে মিথ্যা—কারণ তাহা স্বাক্ষর, চরম সত্য আরও কিছু। 'সহজ মানুষ'—মোটেই সাধারণ মানুষ নয়। আধুনিক মানবতা-বোধের সঙ্গে উহার তফাৎ এই যে, আধুনিক মানবতা-বোধ সামাজিক মানুষকেই মানুষ বলিয়া মানে, সমাজের ভাঙা-গড়ার ঊর্ধ্বে কোনো 'সহজ মানুষ' কল্পনা করে না, সমাজের ভাঙা-গড়ার মধ্যেই তাহার ক্রম-প্রকাশিত সত্তাকে দেখে, তাহার ক্রম-উদ্ঘাটিত সম্ভাব্যতার সন্ধান পায়। আধুনিক মানবতা-বোধের মূল কথাটা এই 'secular man'—যে 'অধ্যাত্মিক সত্তা' নয়, একটা 'সামাজিক জীব', এক 'সৃষ্টি'—'আত্মাও' নয়, 'দেবতাও' নয়,—মানুষ। মানুষের এই ঠিক রূপতো সভ্যতার অন্য স্তরে দেখা সম্ভব ছিল না—সম্ভব হইয়াছে এই স্তরেই সমাজের আর্থিক বিকাশের একটা উন্নত পৈঁঠায়।

আমাদের সমাজেও আমরা নিশ্চয়ই এই মানবতা-বোধ লাভ করিতাম যখন আমরা আধুনিক জীবন-যাত্রার সম্পর্কে আসিলাম। এই মানবীয়তা আরও তীব্রভাবে অনুভব করিলাম ইউরোপের ধনতান্ত্রিক যুগের শিক্ষাদীক্ষা, সাহিত্য ও দৃষ্টিভঙ্গী আয়ত্ত করিয়া। মানুষকে মানুষ হিসাবে গ্রহণ করিতে আমরা নূতন শিক্ষিত মধ্যবিত্তেরা সকলেই ছিলাম প্রস্তুত; নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের আমরা তো সেই 'মানুষের অধিকার' রাষ্ট্রে, সমাজে, আর্থিকক্ষেত্রে, পাইতেছিলাম আরও কম। তাই, এই মানবতা-বোধ ছিল আমাদের পক্ষে আরও তীক্ষ্ণ, আরও তীব্র—সমস্ত প্রাণমনের একটি বেদনাময় অঙ্গীকার। শরৎচন্দ্রের মধ্যেও আমরা ঠিক তাহাই দেখিলাম—সেই হৃদয় দিয়া হৃদয় চিনা। মানবতা-বোধ শুধু তাহার দৃষ্টিক্ষেত্র নয়; তাহার দৃষ্টিও সেই সপ্রেম দৃষ্টি—তাহার পথ প্রেমের পথ, ভালবাসার পথ। ৮

তিনি যেন আমাদের পাঠক সাধারণের সহিত একাত্ম হইয়াই আছেন।

সত্যই শরৎচন্দ্র যে আমাদের সহিত একাত্ম ছিলেন তাহা বুঝিতে পারি আরও একটু পরেই। আমাদের সহিত পা মিলাইয়া তিনি স্বদেশীর পথে চলিতে গেলেন, 'শিক্ষার বিরোধ' ঘোষণা করিতে গিয়া কবিগুরুর সঙ্গে বিরোধে অগ্রসর হইলেন, আবার আমাদের পরাজয়ে ব্যথিত ও আহত হইলেন, লিখিতে বসিলেন আমাদের অন্ধ দেশপ্রীতি ও অন্ধ বিদ্বেষের স্তোত্র—'পথের দাবী'। উহা আমাদের সেদিনকার রাজনৈতিক নৈরাশ্য ও দৃষ্টিহীনতার একটি অগ্নিময় পরিচয়—নিম্ন মধ্যবিত্তের বেদনা ও বিষ তাহাতে আছে,

কিন্তু তাহাতে নাই কোনো পথের নির্দেশ। আমরা নিম্ন মধ্যবিত্তেরা তাহা জানিতাম না, আমাদের আপনার মানুষ শরৎচন্দ্রই বা তাহা জানিবেন কিরূপে ? আমরা রাজনীতিক পরাজয়ে ভাবিতেছিলাম—জন-জাগরণের কথা। কিন্তু কোনো স্পষ্ট ধারণা বা সঙ্কল্প আমাদের সে সম্পর্কে ছিল না। সব্যসাচীর বা তলোয়ারকারের জন-বিদ্রোহের বক্তৃতা এ জন্যই এমন উদ্দেশহীন, আর অবলম্বনহীন। বুদ্ধিকে হৃদয়বৃত্তির নিকট খাটো করিলে এই বিপদই ঘটে। জীবনে বুদ্ধির স্থান প্রথমে, যদিও হৃদয়বৃত্তির স্থান চরমে। কিন্তু সাধারণত আমরা ইহার ওলট-পালট করি,—চিন্তায় ও কর্মে ও তাই গলদ থাকিয়া যায়। তাই তখন আমরা বুঝি নাই—শরৎচন্দ্রও দেখেন নাই—জনশক্তিই এ কালের সৃষ্টির অধিকারী, আর তাই সে বিপ্লবী শক্তি।

শরৎচন্দ্র আমাদের এত আপনার ছিলেন বলিয়াই আমাদেরকে ছাড়াইয়া চলিতে পারেন নাই। এমন কি, যে 'বিদ্রোহের' কথা আমরা আলোচনা করিয়াছি সেখানেও তিনি আমাদের সহযাত্রীই ছিলেন—অগ্রদূত হইতে যান নাই। যে পরিমাণে আমরা নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজ—সাধারণ পাঠক—অগ্রবর্তী হইতে পারিয়াছি তিনিও সেই পরিমাণেই আমাদের হাত ধরিয়া লইয়া চলিয়াছেন। আমাদের এই যাত্রার প্রত্যেকটি মোড় যেন তাহার সৃষ্টিতে সুচিহ্নিত হইয়া আছে। তিনি বিদ্রোহের ধ্বজা তুলিয়া চলিলেন, তবু আমাদেরই ভরসা দিতে আবার নানা ছলনারও আশ্রয় লইলেন—তাহা না হইলে তখন আমরা তাঁহার সঙ্গে চলিতেই স্বীকৃত হইতাম না। 'সাবিত্রীকে' আত্মত্যাগ করাইতেই হইবে। 'কিরণময়ীকে' উন্মাদিনী করা স্বাভাবিক, কিন্তু তাহা না করিলে তাঁহার গত্যন্তর ছিল ? এমনি করিয়া পার্বতী বৃদ্ধ ভুবন মোহনের মাথায় হাত বুলাইয়া দেয়, মৃণাল বৃদ্ধ স্বামীটির সেবায় অন্তত বাহ্যত বিশুদ্ধ থাকে। শেষে কমলকে পর্যন্ত শুদ্ধাচারিণী করিয়া তিনি থামিলেন—আর সতীশ হইতে জীবানন্দ পর্যন্ত বহু পুরুষকেই 'শুদ্ধি' না করিয়া তিনি ছাড়িয়া দিলেন। তাহা না হইলে আমরাই কি তাঁহাকে ছাড়িয়া দিতাম ?

এই আমাদেরই মানসিক দৈন্য ও অস্পষ্টতা শরৎচন্দ্রের সৃষ্টিতেও প্রত্যেক স্তরে মিলিবে। যেমন যতটুকু আমরা অগ্রসর হইয়াছি তেমন ততটুকু তিনি পরিষ্কার করিয়া তুলিয়াছেন। 'গৃহদাহের' অচলাই বোধ হয় আমাদের তখনকার চিন্তার সীমা নির্দেশ করে। ইহার পরে 'শেষ প্রশ্নের' আমরা প্রশ্নের উত্তর জানি না ; শরৎচন্দ্রও উত্তর দেন না। অথচ, মানুষকে তিনি এতটুকু ভালো বাসেন, ভালবাসার রহস্য তিনি এতখানি বোঝেন, যে, মানুষের

এই ভালবাসাকে তিনি অস্বীকারও করিতে চাহেন না। কিন্তু প্রশ্ন প্রশ্নই থাকিয়া যায়—মানুষের ইতিহাসে যে নূতন উত্তর ফুটিয়া উঠিতেছিল বাঙলার পাঠক সাধারণ আমরা তাহা পড়িতে পারি নাই। কারণ আমাদের সমাজে চারিদিকে তখন অন্ধকার নামিতেছে, আমরা আর পথ খুঁজিয়া পাই না। সেই প্রায়ান্ধকারের দিনে আমরা আগে চলিব না পিছনে চলিব তাহাও বুঝিতে পারিতেছি না। তেমনি দিনের আমাদের মানসিক অস্পষ্টতা ও পশ্চাদ্‌গামিতার ছাপ ফুটিয়া উঠিল শ্রীকান্ত—চতুর্থ পর্বে, আর বিপ্রদাসে। আর একবার যেন শরৎবাবু বলিতে চাহিলেন—সনাতনের স্বপক্ষে এখনো বলিবার কিছু আছে। শ্রীকান্ত চতুর্থ পর্বের অস্পষ্টতা ও বিপ্রদাসের গতি-বিমুখীনতার কথা ভাবিলে আর দুইটি কথাও মনে করিতে হইবে—শরৎচন্দ্র তখন জীবনের শেষ যামে আসিয়া ঠেকিতেছেন, তাঁহার শক্তি নিস্তেজ হইয়া আসিতেছে। দ্বিতীয়ত, এই নিস্তেজ শক্তি লইয়া তিনি যে জীবনচিত্র আঁকিতে বসিলেন তাহা তাঁহার পূর্বাপর পরিচিত নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজের জীবন চিত্র নয়—এই জীবন ও এই চরিত্র তাঁহার সম্পূর্ণ বশ পূর্বে তিনি করেন নাই, তখন আর উহার সময়ও নাই। বাঙলার নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজও ততক্ষণে আর্থিক-সামাজিক বিপর্যয়ে অগ্রে এবং পশ্চাতে ছুটাছুটিই সার করিয়া তুলিয়াছে।

বলা দরকার নাই বোধ হয় যে, যে-"পাঠক সাধারণ" "Common Reader" শরৎচন্দ্রের লক্ষ্য ও শরৎচন্দ্রের আপনার, তাহাদেরকে বাঙলার জনসাধারণ "Common Man" বলা ঠিক হইবে না। বাঙলার জনসাধারণ নিরক্ষর, নিম্ন মধ্যবিত্ত সমাজই পাঠক সাধারণ। তাহাদের সঙ্গে জন-সাধারণের ধন-বৈষম্যের তফাৎ তখনো প্রকাণ্ড ছিল না,—এখন তাহা আরও কমিয়া আসিয়াছে। কিন্তু তাঁহারা 'ভদ্রলোক', এই হিসাবে জন-সাধারণের সঙ্গে 'পাঠক সাধারণের' জীবনযাত্রার ও দৃষ্টিভঙ্গির তফাৎ ছিল পূর্বে দুস্তর,—এখনো তাহা ক্ষুদ্র নয়। অথচ কোনো লেখকই নিরক্ষরদের উদ্দেশ্যে আপনার লেখা লেখেন না—যাহাদের উদ্দেশ্যে লেখেন তাহাদের ভাবনা-ধারণা জ্ঞাতে-অজ্ঞাতে তাঁহার লেখার রূপকে নিয়মিত করিবেই। তাই বলিয়া যাহা সত্যই সৃষ্টি হইয়া উঠিয়াছে তাহা পড়িতে শিখিলে অন্য স্তরের লোকেরা গ্রহণ করিতে পারিবে না—ইহাও কখনই সত্য নয়। সৃষ্টি তাহার স্বীকৃতি আদায় করিয়া লইবেই। এই কারণেই এই কথা মনে করা হইবে হাস্যকর যে, শরৎচন্দ্র নিম্ন মধ্যবিত্তদের জীবনকে চিত্রিত করিয়াছেন বলিয়াই তিনি সমাদৃত হইয়াছেন। কিংবা, এই মধ্যবিত্ত সমাজ তো আজ

ভাঙিয়া চলিযাছে—উচ্চ মধ্যবিত্তেবা উচ্চ স্তবে উঠিয়া বেন্টিয়াব শ্রেণীতে পরিণত হইতেছেন, নিম্ন মধ্যবিত্তেবা নিম্নতব স্তবে বেতন-দাসে পবিণত হইতেছেন,—অতএব, অদূব ভবিষ্যতে শবৎচন্দ্র তাঁহাব পাঠক সমাজ হাবাইবেন, বাহুগ্রাসে পডিবেন। প্রথম অবধি যে কথা সত্য সে কথা ভুলিলেই এইরূপ হাস্যকর কথা কেহ বলিতে পাবেন। সে কথাটা এই—শরৎচন্দ্র স্রষ্টা, তিনি জীবনকে দেখিয়াছেন, মানুষকে আঁকিয়াছেন, তাঁহাব পাতায় জীবনেব স্বাক্ষব রহিয়াছে, তাঁহাব চিত্রে আছে অপ্রমেয় প্রমাণ।

এই জন্যই শবৎচন্দ্রেব ত্রুটি বা গুণেব হিসাব লওয়া নিষ্প্রয়োজন মনে হয়। আমবা জানি—তিনি নিরাসক্ত চিত্রকর নন, তিনি আমাদেব মত আবেগ-প্রবণ, এমন কি, ভাবে-ভাষায এক-এক সময় তিনিও তাল সামলাইয়া উঠিতে পাবিতেন না। জানি, তিনি সুবৃহৎ পটে জীবনেব মহাচিত্র অঙ্কিত কবিতে পাবেন নাই—শ্রীকান্তেব মত গ্রন্থেও আছে মানুষেব মিছিল, নাই গোবার মত মহাকাব্যেব ব্যাপকতা। আরও জানি তিনি—তাঁহাব মত শক্তিধাবী স্রষ্টাও—একই মুখ একাধিক বাব গডিযা ফেলিতেন, বিচিত্র মানুষকে তিনিও যেন তত অজস্র রূপ দিতে পাবেন নাই। ইহাও জানি, কেহ কেহ তাঁহাব ভাষাব ভুলও ধবিয়া ফেলিয়াছেন। অথচ ইহাই কি শেষ কথা? না, শবৎচন্দ্রেব সম্বন্ধে কিছুমাত্র ইহা উল্লেখযোগ্য কথা? যে বাঙলা ভাষা রবীন্দ্রনাথেব হাত দিয়া গডিয়া উঠিতেছিল, তিনিও তাহাব উত্তবাধিকাব পাইয়াছিলেন। কিন্তু উপন্যাসেব একটি বিশিষ্ট ভাষাবীতি শবৎচন্দ্র প্রতিষ্ঠিত কবিষা দিয়া যান—পববর্তী ঔপন্যাসিকেবাও তাহাব প্রভাব একেবাবে অস্বীকাব কবিতে পাবিবেন না। অবশ্য, নূতনতব বীতিও গডিয়া উঠিতেছে; আর অত্যন্ত সত্য কথা এই যে, ভাব ও ভাষা পার্বতী-পবমেশ্বব, এবং এক একজনেব হাতে আবার তাহাবও বিশিষ্ট রূপ ফোটে।

শবৎচন্দ্র বাঙলা সাহিত্য-সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ করিযা গিযাছেন, শুধু এই কথা বলাই তাই যথেষ্ট। আব এই কথা বলিলেই বলা হইল—শবৎচন্দ্র বাঙালীকে জীবনেব পথে নূতন পাথেয় দান কবিয়া গিযাছেন—চিবদিনেব মত তাহার সহযাত্রী হইযা আছেন। আর একটু বিশিষ্ট অর্থেও এই কথাটা বলা চলে—শরৎচন্দ্র মানুষের মুক্তিব পথ প্রশস্ত কবিয়া গিয়াছেন। বন্দী মানুষের এমন বন্ধু—মানুষ বড বেশি পায় নাই। আমাদেব সমাজে আবাব সর্বাপেক্ষা বড বন্দী—আমাদেব বন্দিনীবা। তাঁহাদেব চিত্র বাঙ্গালী শিল্পীর হাতে ববাবরই ভালো ফুটিয়াছে। কিন্তু শবৎচন্দ্রের মত বাঙলাব নারীকে আব কেহ দেখিয়াছেন কি? স্নেহময়ী, প্রেমময়ী, লীলাময়ী—দীপ্তিময়ী আর বেদনাময়ী—

সেই বাঙালী নারীকে শরৎচন্দ্র যেমন রূপদান করিয়াছেন তেমন আর কেহই পারেন নাই।'

ইহারও কারণ আমরা পূর্বেই বুঝিয়াছি। তিনিতো শুধু দ্রষ্টা ছিলেন না, তিনি ছিলেন বন্দীর বন্ধু, ব্যথার বন্ধু; তাঁহার দৃষ্টি পথ ছিল প্রেমের পথ। যে সব মানুষকে বলা যায় 'suffering humanity'-র দরদী, শরৎচন্দ্র যে তাঁহাদের মধ্যে প্রধান স্থান পাইবেন, তাহাতে সংশয় নাই।

এইখানেই একটা প্রশ্ন উঠিবে—ইহা কি বাস্তব শিল্পের লক্ষণ—এমন হৃদয় দিয়া মানুষকে দেখা? সাহিত্যে বাস্তবতা লইয়া তর্কের শেষ নাই। কোনো শিল্পই একেবারে অবাস্তব নয়। কিন্তু সব শিল্পীই সমান বস্তুনিষ্ঠও নহেন;—অনেকেই কল্পনাশ্রয়ে বাস্তবকে পাশ কাটাইয়া যাইতে চাহেন, অনেকে আবার আবেগ-বশে বাস্তবকে একটা অযথার্থ রূপ বা মূল্য দান করিয়া বসেন। কিন্তু তাহা লইয়া এখানে বিচার-বিশ্লেষণ নিষ্প্রয়োজন। দুই একটি মূল কথা মনে রাখিলেই চলে—সাহিত্যের ও শিল্পের বাস্তব আর বিজ্ঞানের বা ইতিহাসের বাস্তব এক জিনিষ নয়। সাহিত্য ও শিল্প জীবন-সত্য ও মানব-সত্যকে প্রকাশ করে। তাই, ঘটনা-যথার্থ্য তাহার চরম কথা নয়—জোলার বাস্তবতা শিল্পের পক্ষে কৃতিত্বের বড় প্রমাণ নয়।' জীবন-সত্য ও মানব-সত্য তাহাতে রূপ লাভ না করিতে ও পারে। শিল্পের বাস্তব তাই জীবন-সত্যকে প্রকাশ করে—মানব-বোধকে সুস্পষ্ট করে। তেমন রূপকার যদি বলেন, 'আমি জীবনকে ভালোবাসি, আমি মানুষের অমর্যাদা সহ্য করিব না', তাহা হইলে তাহাতে শিল্পের বা সাহিত্যের মর্যাদা ক্ষুণ্ণ হয় না—আসল কথা তিনি জীবনকে প্রকাশ করিতে পারিয়াছেন কিনা, তাঁহার হাতে মানুষ রূপলাভ করিয়াছে কিনা, তাঁহার আবেগ ও দৃষ্টি সৃষ্টিতে সার্থক হইয়াছে কি না।

আর একটি কথাও আছে: 'নিরাসক্ত' শিল্পী কতটা নিরাসক্ত তাহা জানি না। কিন্তু একটা কথা বুঝি—'বিশুদ্ধ শিল্পীর' অপেক্ষাও প্রেমময় শিল্পীকে আমরা বেশি সহজে স্বীকার করিতে পারি। এই কারণেই আনাতোল ফ্রাঁস অপেক্ষাও আমরা রোঁলাকে বেশি আপনার বলিয়া মনে করি। গোর্কি ও শরৎচন্দ্রকে আপনার বলিয়া চিনি। আসলে শিল্পও তো জীবনেরই একটি স্বীকৃতি—সে স্বীকৃতি যত সুনিপুণ হোক্, শুধু নৈপুণ্যের বলে জীবন-সত্যের শেষ পর্যন্ত তাহা আমাদের পৌঁছাইয়া দিতে পারে না। যেখানে মানুষ মানুষের সামনে আসিয়া দাঁড়ায়—

জন্ম, মৃত্যুর মত গভীরতম জীবন-সত্যের মুখামুখি আসিয়া পড়ে—সেখানে নিপুণ শিল্পে আর কুলায় না, সেখানে প্রেমময় সহযাত্রীর স্পর্শ আর বাহুডোর আমরা কামনা করি;- আর তাহা পাইলে সেই বাহু জড়াইয়া ধরি, জানি উত্তীর্ণ হইলাম, জানি নিজেকে আজ চিনিলাম—জানি জীবন সুন্দর ও সত্য।

—আর এইটিই শেষ কথা।

গোপাল হালদার

পুস্তক-পরিচয়

চীনদেশে প্রগতি ও প্রতিক্রিয়া

New China by Nym Wales (Eagle Publishers)
Makers of New China—by S. S. Batliwala
Who Threatens China's Unity ? Edited by M. Kumaramangalam
Critique of 'China's Destiny"—by Chen Pai-ta
China's New Democracy—by Mao tse-tung
} Peoples' Publishing House

চীন সম্বন্ধে এদেশে কৌতূহল স্বভাবতঃই বহুবিস্তৃত, অথচ অজ্ঞতাও নিতান্ত সামান্য নয়। জাপবিরোধী সংগ্রামের সাত বৎসর পূর্ণ হ'ল, প্রবল শত্রুদের বিরুদ্ধে চীনবাসীর আত্মরক্ষা সকল দেশের সাধারণ লোকেরই গৌরবের বস্তু। অদূর ভবিষ্যতে আমাদের নিকটতম প্রতিবেশীদের ইতিহাস কোন রূপ নেবে জানবার জন্য আমরা আগ্রহান্বিত, কিন্তু আগ্রহ মেটাবার উপায় প্রচুর রয়েছে বলা চলে না। চীনের সাম্প্রতিক ইতিহাস সম্বন্ধেও আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ। এদেশী পাঠকসমাজে উপরের পাঁচখানি বই-এর এইজন্য যথেষ্ট সমাদর হওয়া উচিত। ঈগ্‌ল্‌ পাব্লিশার্স নূতন প্রতিষ্ঠান, সম্ভবতঃ এই বইখানি এদের প্রথম উদ্যম। পিপল্‌স্ পাব্লিশিং হাউস লব্ধপ্রতিষ্ঠ প্রকাশক, চীন সম্বন্ধে পুস্তকগুলি তাঁদের খ্যাতি আরও বিস্তার করবে বিশ্বাস করি। চীনের বিষয়ে উৎসাহী সকলেরই বই পাঁচখানি বিশেষ কাজে লাগবে।

সুপ্রাচীন সভ্যতার অন্তরালে চীনে যে এক নূতন জগৎ গড়ে উঠছে, তার প্রেরণা আসছে পৃথিবীর নবীনতম সমাজের কাছ থেকে, মার্ক্সের মতবাদ যে লালচীনের প্রাণ প্রতিষ্ঠা করেছে, আট বৎসর আগে কেহই প্রায় সে খবর রাখতেন না। দুঃসাহসিক কয়েকজন বিদেশী লেখকের কল্যাণে আমরা প্রথম চীনের পুনর্জন্মের এই বিস্ময়কর

দিকটার পরিচয় পাই। এঁদের মধ্যে এডগার স্নো, নিম ওয়েল্স্, এপস্টাইন, অ্যাগ্নেস স্মেড্লি, অ্যানা লুই ষ্ট্রং প্রভৃতির নাম স্মরণীয়। ভারতীয় কংগ্রেসের প্রেরিত যে মেডিকেল মিশন পাঁচ বৎসর চীনবাসীর সেবা ক'রে সম্প্রতি ফিরে এসেছেন, তাঁদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাও এখন আমাদের জ্ঞান বর্দ্ধন করেছে। চীনের সার্থক আত্মরক্ষায় সাম্যবাদীরা যে প্রাণস্বরূপ একথা অনেকেরই আর এখন অবিদিত নেই। শ্রীযুক্ত বাট্লিওয়ালার বইখানিতে লাল চীনের সমস্ত জ্ঞাতব্য তথ্য প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণ থেকে সংগৃহীত হয়ে এক সূত্রে গাঁথা হয়েছে। নূতন চীন গড়ে তোলার কাজে সাম্যবাদী আন্দোলনের দান যে অমূল্য, এ-সম্বন্ধে যাঁদের সন্দেহ আছে তাঁদের এ গ্রন্থখানি পড়ে দেখতে অনুরোধ করি।

নিম ওয়েল্সের লেখা Inside Red China বইখানি হয়ত অনেকেরই পরিচিত। তার আসল অংশটুকুর পুনর্মুদ্রণ ও সুলভ প্রচলন করাতে ঈগল্ পাব্লিশার্স্ পাঠকদের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করলেন। এর মধ্যে লালচীনের উদ্ভব ও বিকাশের সংক্ষিপ্ত প্রামাণ্য ইতিহাস রয়েছে। লেখিকার বাস্তব অভিজ্ঞতা ও রচনার প্রসাদগুণ বইখানিকে তথ্য বহুল ও সুখপাঠ্য করেছে। নূতন পাঠকের সুবিধার জন্য চীনের গত এক শতাব্দীর একটি ছোট বিবরণ সংযোগ করা হয়েছে—তার লেখক শ্রীযুক্ত অমল বসু। বইএর শেষে আছে চীন-দেশে সাম্যবাদী আন্দোলনের ঘটনাপঞ্জি, ইতিহাসের ছাত্রদের কাছে এর মূল্য অনেকখানি।

আলোচ্য বইগুলির মধ্যে প্রধান স্থান অধিকার করেছে মাও-ৎসেটুং এর লেখা নবীন ডিমক্রাসির আলোচনা। মাও-ৎসেটুং শুধু লাল চীনের প্রধান স্রষ্টা ও পথ-প্রদর্শক নন, পৃথিবীর সেরা মার্ক্সিষ্টদের মধ্যে তিনি নিজের আসন প্রতিষ্ঠা করতে পেরেছেন। নূতন গণতন্ত্রবাদ শুধু চীনের সীমাবদ্ধ স্থানীয় নীতি নয়, পশ্চাৎপদ ঔপনিবেশিক সকল জাতির ভবিষ্যৎ অবস্থা ও আধুনিক আদর্শের ক্ষেত্রে তার প্রয়োগের সম্ভাবনা রয়েছে। থিওরি সম্বন্ধে যাঁদের কিছুমাত্র আগ্রহ আছে, তাঁরা সকলেই বইখানি সযত্নে পড়লে উপকার পাবেন। পাঁচ বৎসর আগের লেখা এই গ্রন্থ প্রগতিশীল সাহিত্যের একটা উল্লেখযোগ্য সম্পদ।

ধনতন্ত্র যখন সুপ্রতিষ্ঠিত হ'তে আরম্ভ করে, তখনকার রাষ্ট্রিক পুনর্গঠনের ঐতিহাসিক নাম বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক বিপ্লব, ফরাসী বিপ্লবকে তার প্রতিনিধি বলা চলে। ধনতন্ত্রের অবশ্যম্ভাবী প্রতিক্রিয়া দেখা গেল সমাজবাদী আন্দোলনে। সেই আন্দোলন পৃথিবীময়

ছড়িয়ে পড়ে, কিন্তু অনুন্নত দেশগুলিতে তখনও ফিউডাল সমাজ ও ফিউডাল বাষ্ট্রব্যবস্থাব অবসান হয় নি। ইতিহাসের গতি অসমান হওয়াতে তাই সমাজবাদী আন্দোলনকে অনেকসময় সম্মুখীন হতে হয় আধা-ফিউডাল আধা-ধনতান্ত্রিক সমাজ ও রাষ্ট্রেব বিরুদ্ধে। মার্ক্সেব বিশ্লেষণ-পদ্ধতিব সম্যক প্রয়োগ কবে লেনিন দেখালেন যে অনুন্নত অঞ্চলে সোসালিজম্ একলাফে আসতে পাবে না, সেখানে বিপ্লব আসবে দুই পর্য্যায়ে। প্রথমে বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক বিপ্লব ফিউডাল ব্যবস্থাকে কববে নির্ম্মূল, তাবপব প্রগতিব অমোঘ নিয়মে সেই বিপ্লব রূপান্তবিত হবে প্রকৃত সমাজতন্ত্রী বিপ্লবেব মধ্যে। লেনিনের উক্তিব যাথার্থ্য প্রমাণ কবল রুশবিপ্লবেব ইতিহাস।

১৯১৭ সালে রাশিয়ায় সমাজতন্ত্রের সূচনাব পব অন্য অনুন্নত দেশেব অবস্থাব মধ্যেও আব একটি বিশেষত্ব দেখা গেল। এবপব অন্যত্র বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক বিপ্লবের উপক্রম হলেও সে-বিপ্লব আব পুবানো গণ্ডিব মধ্যে আবদ্ধ থাকতে পারে না, ফরাসী বিপ্লবেব রীতিনীতি আব তাব সীমা নির্দ্ধাবণ কবতে পাববে না, নূতনতর রুশবিপ্লব তাকে সবিশেষ প্রভাবান্বিত করতে বাধ্য। আজকেব দিনে বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক বিপ্লব তাই মূলতঃ বুর্জোয়া-ধর্ম্মী হলেও তাব একটা নূতন ভঙ্গী থাকবেই, একটা নবীন স্বকীয়তা তাকে মূর্ত্তি দেবে, কাবণ ইতিমধ্যে পার্শ্ববর্ত্তী জগতে অনেক পবিবর্ত্তন এসে গেছে। এক কথায়, এখন আব রুশবিপ্লবেব ছোঁয়াচ এড়িয়ে বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক বিপ্লব সফল কবাব সম্ভাবনা নেই। অনুন্নত দেশে আজকেব দিনেব আসন্ন বিপ্লবকে তাই মাও "নিউ ডেমক্রাসি" আখ্যা দিয়েছেন। এই আদর্শ পুরো সমাজবাদ নয়, তাব বাস্তব ভিত্তি এখনও সম্পূর্ণ গড়ে উঠে নি, যদিও নিউ ডেমক্রাসিব স্বাভাবিক পরিণতি তাবই মধ্যে। অথচ গণতন্ত্রেব এই নবীনরূপ গত যুগেব বুর্জোয়া বিপ্লব থেকেও অনেকখানি স্বতন্ত্র। এব মধ্যে দেখতে পাই বুর্জোয়া শ্রেণীব নেতৃত্ব আব থাকছে না, শ্রমিক শ্রেণীব হাতে নেতৃত্ব চলে আসছে; বিপ্লবেব পব কার্য্যতঃ আব আগেব মতন বুর্জোয়াদেব একাধিপত্য থাকবে না, অর্থাৎ সেই অধিনায়কত্ব এখন আসবে বিত্তশালী মধ্যবিত্ত, শ্রমিক ইত্যাদি সকল বিপ্লবী শ্রেণীব হাতে।

উপনিবেশ ও সাম্রাজ্যতন্ত্রেব আশ্রিত দেশে মুক্তি আন্দোলনের এই নূতন বিশেষত্বের দিকে লেনিন দৃষ্টি আকর্ষণ কবেছিলেন ১৯১৬ সালে। স্টালিনের ১৯১৮ ও ১৯২৫-এব লেখায় এব বিশদ ব্যাখ্যা আছে। মাও এঁদেব অনুসবণ কবে নূতন গণতন্ত্রেব রূপ-নির্দ্দেশ কবেছেন। অনুন্নত দেশেব বুর্জোয়াদেব মধ্যে এখনও একটা বিপ্লবেব ঝোঁক

আছে ; বিদেশী মূলধনের কর্তৃত্ব ,সাম্রাজ্যতন্ত্রের শোষণ তাদের মধ্যে তীব্র প্রতিবাদ জাগায়। বর্ত্তমান জগতে আসল বিপ্লবী শ্রমিকশ্রেণীর কর্ত্তব্য এই ঝোঁকের সহায় হওয়া, তার সমর্থন করা। অথচ এই সব অঞ্চলে বুর্জোয়া-মহলে দুর্ব্বলতারও অন্ত নেই, সেই দুর্ব্বলতা এদের টানে সাম্রাজ্যবাদের সঙ্গে আপোষের দিকে। যে সাম্রাজ্যতন্ত্র ও প্রাচীন বিধি-ব্যবস্থা সাধারণ লোকের যুগ্ম শত্রু, বুর্জোয়াশ্রেণীর সাধ্য ও সাহস নেই তার প্রকৃত উচ্ছেদ সাধন করবার। এই আপোষ ও পরাজয়পন্থী মনোভাবকে আটকে রাখবার দায়িত্বও তাই এসে পড়ে শ্রমিকশ্রেণীর উপর। আজকের দিনের বুর্জোয়া-শ্রেণী দোটানার মধ্যে অবস্থান করছে, তার দু'মুখো প্রবৃত্তি এত সুস্পষ্ট যে তার পক্ষে আর আগের মতন বিপ্লবের সফল নেতৃত্ব করা সম্ভব নয়। আসন্ন বুর্জোয়া-ডেমক্রাটিক বিপ্লব আর বিশুদ্ধ বুর্জোয়াধর্ম্মী হতে পারে না, তাকে নূতন রূপ নিতে হচ্ছে। "নিউ ডিমক্রাসি" সেই রূপের সংজ্ঞা, ইউনাইটেড ফ্রণ্টের সম্মিলিত অভিযান তারই পূর্ব্বাভাস।

বিপ্লবের পথ থেকে চীনে বুর্জোয়াদের পশ্চাদ্‌গমনের প্রমাণ পাই কুয়োমিনটাং-এর মধ্যে অনেকের দক্ষিণপন্থী মনোভাবে, ওয়াং-চিং-ওয়াই-এর জাপানীদের সঙ্গে সহযোগ তারই প্রকাশ্য প্রমাণ। এই মনোভাব ১৯২৭ থেকে ১৯৩৭ পর্য্যন্ত সাম্যবাদী-দলনের প্রচেষ্টার মধ্যে প্রকাশ পেয়েছিল। এমন কি আজকের দিনেও মার্শাল চিয়াং-কাই-শেকের অন্তরঙ্গ পার্শ্বচরদের মধ্যে এই ঝোঁকের প্রমাণ পাওয়া যাচ্ছে। চীন থেকে যে সরকারী খবর আসে তার মধ্যে ভিতরের সব কথা জানা যায় না। প্রগতি ও প্রতি-ক্রিয়ার দ্বন্দ্বের সন্ধান দিচ্ছে আমাদের আলোচ্য বইগুলি।

চীনের প্রগতিশীল মন মূর্ত্তি পেয়েছে নিউ ডিমক্রাসির আদর্শের মধ্যে। নিউ ডিমক্রাসির রাষ্ট্রিক আদর্শ এখনই সমাজতন্ত্র গড়বার চেষ্টা নয়, তার সময় পরে আসবে। এই আদর্শের এখনকার লক্ষ্য হ'ল পরিপূর্ণ গণতান্ত্রিক রেপাব্লিক স্থাপন, তার নেতৃত্ব করবে সকল বিপ্লবীদলের সম্মিলিত শক্তি। বুর্জোয়া কুয়োমিনটাং চায় একদলীয় কর্ত্তৃত্ব। কিন্তু সোশালিষ্ট বিপ্লব আসার আগে পর্য্যন্ত যখন বিভিন্ন শ্রেণী থেকে যাচ্ছে, তখন তাদের মুখপাত্র হিসাবে বিভিন্ন দলের অস্তিত্ব অনিবার্য্য ; বিভিন্ন বিপ্লবী দলের সংযোগ ছাড়া রাজ্য চালানো এখন সম্ভব নয়। আজকের দিনের পপুলার ফ্রণ্টই পরে রেপাব্লিক চালাবে, নিউ ডিমক্রাসির রাষ্ট্রিক আদর্শ হ'ল এই। অর্থনীতির ক্ষেত্রে নিউ ডিমক্রাসি চায় মূলধনীদের উচ্ছেদও নয়, তার পরিপূর্ণ স্বাধীনতাও নয় ; ক্যাপিটালকে নূতন রাষ্ট্র নিয়ন্ত্রিত করবে, তাকে হ'তে হবে সংযত, সীমাবদ্ধ ও কর্ত্তৃত্বাধীন। অন্য দিকে জমির

উপর থেকে সকল রকম ফিউডালি প্রাচীন ব্যবস্থাকে নির্ম্মূল করতে হবে, জমিতে আনতে হবে আসল চাষীদের কর্ত্তৃত্ব, জমির হবে পুনর্বণ্টন। রাষ্ট্রিক ও আর্থিক উভয় ব্যবস্থাতেই নিউ ডিমক্রাসি ঠিক এখনই সমাজতন্ত্র আনতে চাচ্ছে না, অথচ পুরানো বুর্জোয়াগণ্ডিও অতিক্রম করছে, এর বিশেষত্ব এইখানেই।

১৯২৪ সালে যখন কুয়োমিনটাং-এর পুনর্জন্ম হয় তখন সুন-ইয়াৎসেন অনেকটা এই পরিকল্পনারই আশ্রয় নিয়েছিলেন। তিনি তাঁর "তিন নীতির" যে-ব্যাখ্যা করেছিলেন, তার সঙ্গে নিউ ডিমক্রাসির সম্পূর্ণ না হলেও আন্তরিক মিল আছে। তিনি তিনটি নির্দ্দেশও দিয়েছিলেন ঃ চীনের মুক্তি আন্দোলনকে সোভিয়েট রাশিয়ার সঙ্গে মৈত্রী রেখে চলতে হবে, দেশের মধ্যে সাম্যবাদী দলের সঙ্গে জাতীয় দলের পূর্ণ সহযোগ প্রয়োজন, চাষী মজুরদের উপর নির্ভর করে তাদের সঙ্গে সংযোগ রাখা দরকার। সুন-ইয়াৎসেনের দূরদৃষ্টির ফলে চীনে মুক্তি আন্দোলন প্রবল রূপ ধারণ করল। ১৯২৪ থেকে ১৯২৭-এর গৌরবময় যুগ তার ফল, বিজয়ের স্রোত তখন তাঁর নীতিকে সাফল্যমণ্ডিত করেছিল।

তারপর কুয়োমিনটাং অন্যপথ ধরল, নেতার তিনটি নির্দ্দেশ লঙ্ঘিত হওয়ায় দশ বৎসর অন্তর্যুদ্ধ দেখা দিল। জাপানী চাপের ফলে ১৯৩৬ সালে আবার ঐক্য ফিরে আসে, তার প্রধান উদ্যোগী ছিল সেই সাম্যবাদী দল যাদের উচ্ছেদের আপ্রাণ চেষ্টায় চিয়াং-কাই-শেক অভিযানের পর অভিযান করেছিলেন, মাদাম সুন-ইয়াৎসেন প্রভৃতির সকল উপরোধ উপেক্ষা করে। বর্ত্তমান জাপানী যুদ্ধের তৃতীয় বৎসর থেকে আবার ঐক্যের মধ্যে ভাঙ্গন লক্ষ্য করা যায়, প্রতিক্রিয়া আবার মাথা তুলতে থাকে। এ খবর এখন আর চাপা নেই, পৃথিবীর সকল দেশের ফাশিষ্ট-বিরোধী জনমত তাই চঞ্চল হয়ে উঠেছে। বিদেশী জনমত ও প্রকৃত প্রগতিশীল চীনবাসীদের মিলিত চাপে চিয়াং-কাই-শেক তাঁর প্রতিক্রিয়াপন্থী বন্ধুদের হাত থেকে মুক্তি পাবেন, আশা করা যায়। নয়ত চীনের দুর্ভাগ্য আবার ঘনিয়ে আসবে।

আমাদের তালিকার তৃতীয় বইখানিতে এই নূতন সংঘর্ষ সম্বন্ধে অনেক মাল মশলা সংগৃহীত হয়েছে। তাতে দেখা যায় যে চীনে জাতীয় ঐক্য ভাঙ্গবার চেষ্টা হয়েছে কুয়োমিনটাং-এর দক্ষিণ-পন্থীদের দিক থেকে। সাম্যবাদী দল ১৯৩৬-১৯৩৭-এর চুক্তির সর্ত্ত পালন করে এসেছে, কিন্তু সরকারী তরফ থেকে চেষ্টা চলেছে চতুর্থ আর্ম্মি ধ্বংস করবার, সীমান্তের লাল চীন অঞ্চল করায়ত্ত করবার ; গেরিলা বাহিনীকে সাহায্য এবং সীমান্ত অঞ্চলের দিকে যুদ্ধের সাজসরঞ্জাম পাঠাবার চেষ্টা হয়নি

জাপ-বিরোধী সংগ্রামে নিশ্চেষ্টতা এসেছে, অথচ দাবী উঠেছে আবার কুয়োমিনটাং-এর একদলীয় কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের। সুন-ইয়াৎসেনের নির্দ্দেশ লঙ্ঘিত হচ্ছে আগেকার অভিজ্ঞতা অগ্রাহ্য করে। প্রতিক্রিয়ার স্রোতকে মার্শাল চিয়াং-কাই-শেক বাধা দিতে পারবেন, চীনের সকল বন্ধুর আজ এই কামনা।

চিয়াং-কাই-শেকের নামে "চীনের ভবিষ্যৎ" শীর্ষক যে-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে, সম্ভবতঃ সে-বই কোনও দক্ষিণপন্থীর লেখা। উপরের তালিকায় চতুর্থ পুস্তক তার সুদক্ষ সমালোচনা। "চীনের ভবিষ্যৎ"-এ যে-চিন্তাধারা প্রকাশ পেয়েছে, সুন-ইয়াৎসেনের নীতি ও নিউ ডিমক্রাসির সঙ্গে তার পার্থক্য লেখক স্পষ্টভাবে দেখাতে পেরেছেন। "চীনের ভবিষ্যৎ" প্রাচীন চীনের গুণগানে পরিপূর্ণ। সেই প্রাচীন চীন যে স্বেচ্ছাচারী ফিউডাল সাম্রাজ্য ছিল, "চীনের ভবিষ্যৎ"-এর গ্রন্থকার তা স্মরণ রাখেন নি। বিদেশী চাপই নাকি চীনের সকল অনর্থের মূল, কিন্তু পুরানো সমাজের দুর্ব্বলতাই কি সেই চাপ সফল হবার কারণ নয়? প্রাচীন চীন সভ্যতার আদর্শের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পড়তে গিয়ে মনে পড়ে না কি যে সেই সভ্যতাও সাধারণ লোকের শোষণের উপর প্রতিষ্ঠিত? সমালোচক দেখিয়েছেন যে ১৯১৯ সালের ৪ঠা মে তারিখে যে-সাংস্কৃতিক আন্দোলন চীনে নব-প্রেরণা এনে দেয় সে সম্বন্ধে "চীনের ভবিষ্যৎ" সম্পূর্ণ উদাসীন। সমাজবাদ দূরে যাক, গণতন্ত্রের আদর্শেও গ্রন্থকারের আস্থা নেই; জনসাধারণের প্রতি গভীর অবজ্ঞা তাঁকে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। এক দিকে সনাতন পুরাতনের প্রতি অহৈতুকী প্রীতি, অন্যদিকে "এক দল, এক নীতি, এক নেতা" ফাশিষ্ট-গন্ধী সকল আন্দোলনের এই বুলির আশ্রয় গ্রহণ—বইখানির বিশেষত্ব এইখানে, সঙ্গে আছে লাল চীনের ইতিহাসের বিকৃত ব্যাখ্যা। চিয়াং-কাই-শেক দূরদর্শী ও শক্তিমান পুরুষ, চীনের জাতীয় ঐক্য তাঁর উপর নির্ভর করছে; চীনের হিতাকাঙ্ক্ষীদের বিশ্বাস আছে তিনি প্রতিক্রিয়ার শক্তিকে কাটিয়ে উঠে প্রগতির সহায়ক হ'তে পারবেন।

সুশোভন সরকার

সংস্কৃতি-সংবাদ

চলচ্চিত্র দেখা ছেড়েই দিয়েছিলাম ; কিন্তু সেদিন 'উদয়েব পথে' ছবিখানি দেখে খুশী হয়েছি। এবকম দেশী ছবি ত আব দেখি নি।

প্রথমেই বলা দবকাব যে-ছবিব টেক্‌নিক্ পুবাতন ধরণেব। চলচ্চিত্র এখনও এদেশে বঙ্গমঞ্চেব টেক্‌নিকই অবলম্বন ক'বে রয়েছে। সুতবাং সংলাপই তাব প্রধান উপজীব্য। নূতন টেক্‌নিক্ আবিষ্কাব কবতে হ'লে আইসেনষ্টাইন জাতীয় প্রতিভাব দবকাব ; আব দবকাব সিনেমা-শিল্পেবও শিল্পগত উন্নতি।

ছবিখানিব বৈশিষ্ট্য তবু আছে। এব প্রধান বৈশিষ্ট্য গতি। প্রথম থেকেই ঘটনাপ্রবাহ আখ্যানবস্তুকে এক অবশ্যম্ভাবী পবিণতিব দিকে প্রবল বেগে টেনে নিয়ে চলে। সংলাপেব মধ্যে এমন action বোধ হয় এক 'যোড়শী' ছাড়া অন্য কোনো নাটকে দেখি নি।

ছবিখানির theme-ও পুবাতন ; নেহাং বোমান্টিক। আমাদের দেশে উপকথা থেকে শুরু ক'বে নভেল নাকটে সকল ক্ষেত্রেই এবকমেব গল্প দেখা যায়। বাজকন্যা মাল্যদান কবেন বীব যোদ্ধাকে অথবা কবিশেখবকে। এ ধবণেব স্বপ্ন দেখে মন্দভাগ্য লেখক বা কর্মচাবীবা এক রকমের সুখ পায়। 'উদয়েব পথেব' মূল গল্পও তা'ই : বুর্জোয়া-কন্যা ববমাল্য দিচ্ছে লেখক ও ট্রেড ইউনিয়নেব কর্মী অনুপকে। নতুন কালের লেখকেবা ও দর্শকেবা নিজেদেব ইচ্ছাপূবণেব পথ খুঁজছেন পুবাতন ধাবায়। স্বপ্নবাজ্যে তাবা অসম্ভবকে সম্ভব কবে নিজেদেবই বাস্তব ক্ষেত্রে বঞ্চিত কবেন। অবশ্য এ বোমান্টিকতাব ব্যাধি এ কালের লেখকদেবও বোধহয় আব টিঁকবে না, শ্রমিক-কর্মীদেব তো তা জন্মাতেই পাবে না, তা বলাই বাহুল্য।

ছবিখানিব আখ্যনবস্তু শ্রেণীবৈষম্যেব উপব প্রতিষ্ঠিত হতে চেয়েছে, তাই আশা করেছিলুম বাস্তব কিছু দেখব। সেদিকেও একেবাবে নিবাশ হই নি। বোমান্সেব ফাঁকে ফাঁকে জীবনেব প্রতিচ্ছবি সব সময়েই দেখা গেছে। সে-জীবনকে কিরূপে মহত্তব জীবনে পবিণত কবা যায় তাবও আভাস পাওয়া যাচ্ছিল। অথচ কোথাও প্রচাবেব গন্ধ পাওয়া যায় নি। মোট কথা, নব-জীবন-বোধই এই ছবিখানিব মূল প্রেবণা, তা সত্য।

ধনিকেব কন্যা গোপা তাব নিম্ন মধ্যবিত্তশ্রেণীব বন্ধু সুমিতাকে ভাইঝিব জন্মদিনে নিমন্ত্রণ কবতে এসে সুমিতাব দাদা অনুপের ঘব দেখে বিস্মিত হ'ল। সেখানে দেয়ালেব

গায়ে আঁকা রয়েছে ভারতের দেশপ্রেমিক মনীষীদের রেখাচিত্র—গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ, অরবিন্দ, বঙ্কিমচন্দ্র। আর অনুপের তক্তাপোষের ঠিক শিয়রের দিকে রয়েছে একটি মাত্র বিদেশীর রেখাচিত্র—কার্ল মার্কস্। প্রযোজক এর বেশী আর কিছু বলেন নি। তবু দর্শকরা বুঝে নিলেন নায়ক কোন পথের পথিক।

অনুপ ও গোপা দুই জগতের মানুষ,—শরৎচন্দ্রের নায়ক-নায়িকার মত সজ্মাতেই তাদের পরিচয়। তবু গোপার গান শুনেই অনুপের শিল্পীমন গোপার আকর্ষণ সম্বন্ধে সচেতন হয়ে উঠল। এখানেই গল্পের একটা মোড়। প্রযোজক বিশেষ ক'রে বিজ্ঞাপিত না করলেও বুঝতে পারা যায় যে, অনুপ শুধু মননশীল কর্মী নয়, সে একজন রসজ্ঞ শিল্পী। সমাজের স্বাভাবিক অবস্থায় যে হ'তে পারত একজন সাহিত্যস্রষ্টা তাকে বর্ত্তমান অবস্থায় হ'তে হ'ল একজন সমাজস্রষ্টা।

আসলে, লেখকের ও প্রযোজকের হয়ত ট্রেড-ইউনিয়নের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা নেই; মজুরদের জীবনের বাস্তব চিত্র তাই এতে নেই। মজুরদের সভায় রজনীগন্ধা ফুল থাকে না; যদিও গল্পের জন্য রজনীগন্ধা দরকার। দেয়ালেও নাৎসি-প্রতীক স্বস্তিক থাকে না! অম্বিকা এতগুলি মজুরের সামনে অনুপই যে এ-আন্দোলনের মূল তা মিলের মালিককে নিশ্চয়ই বলত না। মালিক ও মালিক-কন্যার কৃপায় শ্রমিক-সমস্যা মিটছে, তারা 'গোপা দেবী কী জয়,' বলে কৃতার্থ হচ্ছে, এ দেখলে মজুরেরা হাস্য সম্বরণ করতে পারে না। এ অসঙ্গতি যে দর্শকের সহ্য হয়, তার কারণ দর্শকেরা মজুর নয়, কর্মচারী। তারা এদেশের ব্যাংকের কেরানী, ইনশিওরেন্সের কর্মচারী, যারা আপিসেই মুনিবদের দেখে, কলকারখানার মালিককে দেখে না।

শুধু মজুরদের জীবনের চিত্র নয়, বিলাত-ফেরত সমাজেরও চিত্র বাস্তব হয়ে উঠে নি; এই বিলাত ফেরত সমাজের কোনো মূল নেই সত্য; তারা স্বদেশী সমাজের সব কিছুই অবজ্ঞা করে, অথচ বিলাতী সমাজ গড়বার ক্ষমতা তাদের নেই। তারা বৈঠকখানা ভেঙ্গে ফেলে, অথচ বিলাতী ড্রইং রুমও গড়তে পারে না। দামী বিলাতী ছবি কিনবার মতো অর্থ ও রসজ্ঞান তাদের নেই। তাই তারা কুমারটুলীর বুদ্ধমূর্তি ড্রইং রুমের dummy fireplace-এর উপর রেখে সিগারেটের ধোঁয়ায় তার অর্চ্চনা করে, আর নটরাজের মূর্ত্তির সামনে নৃত্য ক'রে 'oriental' হয়। এক কথায়, সে এক কিম্ভূতকিমাকার, অসমঞ্জস জীবন, এবং তা দেখলে হাস্যরসের উদ্রেক হয়। তবু সে-জীবনও বাস্তব। এতবড় ইঙ্গ-বঙ্গ অভিজাত পরিবারের বধূ রমা আরও মার্জিত, আরও ইংরেজীভাষিনী হ'লে বাস্তব ব'লে মনে হ'ত। বিভাসের বাঁদরামিও যেন স্বেচ্ছাকৃত; এ বাঁদরামি যদি তার চরিত্রের স্বাভাবিক অঙ্গ হ'ত তবে ছবিখানির মূল্য আরও বেড়ে যেত। যাকে খেলো করতে হবে তারও একটা বাস্তব রূপ দেওয়া দরকার। ব্রজেন্দ্রনাথের চরিত্রও ঠিক capitalist-এর চরিত্র হয় নি। প্রেম যদি dividend না দেয় তবে তারও কোনো মূল্য নেই capitalist-এর কাছে। কঠোরতার আবরণে এতখানি স্নেহপ্রবণ মন শুধু feudal lord-এই সম্ভব। এ যেন মনে হয় আধুনিকতার আবেষ্টনে তারাশঙ্করের কোনো জমিদার চরিত্র।

দেখা গেল, ফুটেছে সবচেয়ে সত্য হ'য়ে নিম্ন মধ্যবিত্তের জীবন—অনুপের গৃহস্থালি, তার মায়ের স্নেহ, বোনের ভালোবাসা। আর নিম্ন মধ্যবিত্তই যে বর্তমান সমাজ ব্যবস্থায় এক প্রকার বঞ্চিত, তাতে আর সন্দেহ নেই। এই বঞ্চিত নিম্ন মধ্যবিত্তদের প্রতি দর্শকের সহানুভূতি স্বাভাবিক,—দর্শকেরাও প্রায়ই নিম্ন মধ্যবিত্ত। ছবিখানির সাফল্যের একটি প্রধান কারণও তাই, তা ভুললে চলবে না।

ধনিকের বিরুদ্ধে ক্ষোভটা এক্ষেত্রে শ্রমিক সঙ্ঘর্ষ নয়, বঞ্চিত মধ্যবিত্তের বিক্ষোভ। কিন্তু একটি কথা এই জন্যই আজ আমাদের মনে রাখতে হবে বেশি। আমরা নিম্ন মধ্যবিত্তরা আজ আর মধ্যবিত্ত নেই; আমরা মেয়ে পুরুষে আজ রোজগার করছি, তবু বাঁচতে পারছি না। জীবন যাত্রায় আমরা বঞ্চিতের দলে। কিন্তু অনেক কালের 'ভদ্রলোকের' দেমাক তবু আমাদের মনে। তাই ভদ্রলোকের খোলসটা সম্বল করে থাকি, মালিকের মুখে ভদ্রলোকের মুখোস দেখলেও বেঁচে যাই। অথচ জীবনক্ষেত্রে সত্যই আমরা শ্রমিক শ্রেণীর সগোত্র। তাদের সঙ্গেই আমাদের বন্ধন দিনে দিনে ঘনিষ্ঠ হচ্ছে। এই কথাটা আমাদেরও বোঝা চাই—আমাদের শিল্পী আর লেখকদেরও। তাদের রোমান্সের জায়গা নেই।

রোমান্সের ফাঁকে ফাঁকে এই ক্ষীয়মান সমাজব্যবস্থার চিত্র এ ছবিতেও দেখা যাচ্ছিল। শুধু মধ্যবিত্ত শ্রীকণ্ঠবাবু নয়, বড় বড় শিল্পপ্রতিষ্ঠানের ও ব্যাংকের মালিকরাও চালের মজুতদারী ক'রে কিরূপে দুর্ভিক্ষ সৃষ্টি কচ্ছিল তারও আভাস পাওয়া গেল।

চিত্রের সমাপ্তি খুবই রোমান্টিক, তবে অসহ্য নয়। উদয়ের পথে যাত্রা যেন চার্লির 'Modern Times'-এর নায়কনায়িকার অজানা পথে যাত্রার কথা মনে করিয়ে দেয়। প্রযোজক অজ্ঞাতসারে তার দ্বারা প্রভাবিত হয়ে থাকবেন, তাতে ক্ষতি নেই।

তবু বলব এরকম দেশী ছবি আর দেখি নি। শুধু থিওরি নয়, জনতার জীবনের সঙ্গে সত্যকার পরিচয় ঘটলে আমাদের রোমান্টিক আত্ম-বঞ্চনার জায়গা থাকবে না—আমরা সত্য হয়ে উঠব, আমাদের ছবিও সত্য হয়ে উঠবে,—সিনেমার শিল্পীদের সামনে উদয়ের পথ সেই ইঙ্গিতই উপস্থিত করেছে।

এ ছবির আর একটা বৈশিষ্ট্য এই যে লেখক, প্রযোজক ও অভিনেতা-অভিনেত্রী সকলেই প্রায় নূতন। সকলেই পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়েছেন। আশা করি তাঁরা আর্থিক সুবিচারও লাভ করবেন, লেখকও তা' থেকে বঞ্চিত হবেন না। নূতন অভিনেতা রাধামোহন অনুপ-চরিত্রের দৃঢ়তা ও মর্য্যাদা-বোধ যে-ভাবে ফুটিয়ে তুলেছেন তা পুরাতন অভিনেতাদের মধ্যে বড় একটা দেখতে পাই নি। তাঁর শ্লেষাত্মক বাক্যবাণ শিশিরবাবুকেই মনে করিয়ে দেয়। ছবি দেখে মনে হয় পুরাতন লেখক, প্রযোজক ও অভিনেতা অভিনেত্রীরা পুরাতন ভাবলোক ও অভিনয়-কলায় বাঁধা পড়ে গেছেন। অথচ দর্শকরা যে প্রগতি চায় তাতো স্পষ্ট;—ধনিক চিত্রব্যবসায়ীরাই তা পরিবেশন করতে নারাজ ছিলেন। তবে তাতে এবার যখন মুনাফার সম্ভাবনা দেখা গেল তখন এদিকেও জোর-করা প্রগতি ও ধার-করা কল্পনার বান না ডাকলে হয়।

রঙ্গীন হালদার

চতুর্দশ বর্ষ—৪র্থ সংখ্যা।
কার্ত্তিক, ১৩৫১

পরিচয়

টি, এস., এলিঅটের মহাপ্রস্থান

I sometimes wonder if that is what Krishna meant—
Among other things—or one way of putting the samething :
That the future is a faded song, a Royal Rose or a lavender spray
Of wistful regret for those who are not here to regret,
Pressed between yellow leaves of a book that has never been opened.
And the way up is the way down, the way forward is the way back.
You cannot face it steadily, but this thing is sure,
That time is no healer : the patient is no longer here.

(The Dry Salvages)

উনিশ-কুড়ি বছরে যে কবি লিখতে পারেন শুচিবাইগ্রস্ত এল্‌ফ্রেড্‌ প্রুফ্রকের প্রেমগীতি বা এক মহিলার ছবির মতো পাকা কবিতা এবং যাঁর অদম্য পরিণতি শেষে বর্ন্‌ট্‌ নর্টন থেকে লিটল্‌ গিডিং অবধি বিশ শতকের সবচেয়ে সার্থক ইংরেজি কবিতার চতুরঙ্গে এসে দাঁড়ায়, তাঁর বিষয়ে ভাষান্তরে কিছু লেখা কঠিন। বিশেষ করে' ভিন্নধর্মী আন্‌-কোরা ভাষায় এই কবিতার তীব্র সৌন্দর্য এবং এই কবির রসলোকের ক্ষুরধার যাত্রার আশ্চর্য সঙ্গতি ও সম্পূর্ণতার পরিচয় দেওয়া আমার পক্ষে ব্যর্থ চেষ্টা।

আমি শুধু এলিঅটের বিষয়ে বহু বক্তব্যের একটি বল্‌তে চাই। এলিঅটের কাব্যে যে বেদনা, যে রোমান্টিক যন্ত্রণা—সেই ভাবাশ্রিত বিশেষত্বেই এলিঅট্‌ আমাদের এতো নাড়া দেন এবং সেই বেদনার আবেগেই তাঁর চিত্রকল্পগুলি প্রতীক হয়ে ওঠে। এলি-

অটের প্রতিনিধি-মূল্যও এই কারণে এতো বেশি। এ যন্ত্রণার উৎস শেষ পর্যন্ত স্বভাবের গভীরে এক দ্বন্দ্বে, নানা অভিজ্ঞতার সমষ্টিতে নয়,—খাপছাড়া অনুষঙ্গে। এলিঅটের স্বকীয় প্রতিভার রসায়নে আমাদের সমাজের এই বিচ্ছিন্নতা কাব্যরূপ পেয়েছে। তাই একালের কবিদের তাঁর কাছে ঋণস্বীকার করতে হয় বারবার। খণ্ডচৈতন্যের এমন একাগ্র উপলব্ধি ও এমন কাব্যসমৃদ্ধ রূপ এবং তার থেকে বর্ধমান নৈর্ব্যক্তিক দৃষ্টি কাব্যজগতে এলিঅটের দান। এ দান ভুললে এলিঅটোত্তর কাব্যের মুক্তির উৎসও ভুলতে হয়।

অখণ্ড চৈতন্যের এলিঅটের দায়িত্ব অনেকখানি নিশ্চয়ই ব্যক্তিগত ক্ষমতার বাইরে। আত্মসচেতন মানস স্বকীয় দ্বিধায় খণ্ডিত সমাজে দীর্ণ হতে বাধ্য, সততা যদি থাকে। এখানে এ দ্বিধার ইতিহাস বা কারণ নির্দেশ অবান্তর। এলিঅটের শেষ বয়সের কাব্যে চৈতন্যের সন্ততি বা বিস্তার ও একতার ভাববিলাসী প্রশ্ন উঠে' কি ভাবে কাব্যকে বঞ্চিয়েছে, তাই সংক্ষেপে দেখা যাক্।

প্রশ্নটির চঞ্চলতা, সুদূরের পিয়াসী আমাদের এই শেষ রোমান্টিককে প্রেরণা দিয়েছে ক্লাসিসিস্‌মের দিকে; হৃদয়বেদনা তাই খুঁজেছে গির্জার সমর্থন; সমাজ-বোধের অভাব আত্মগোপন করতে গেছে সামন্তবাদী রাজশক্তির কল্পনায়। লক্ষণগুলি নগণ্য নয়, কারণ এলিঅট শুধু আত্মসচেতন কবি নন, যদিচ সে কীর্তিও নির্বোধ আনাড়ি কাব্য-তত্ত্বের প্রচলনের মধ্যে প্রচণ্ড সিদ্ধি। তার চেয়ে বড়ো কথা, এলিঅট হচ্ছেন আত্ম-সচেতনতারই মহাকবি। তাঁর কাব্যের মূল বিষয়ই হচ্ছে আত্মসচেতন মানস, তার নাট্যরূপ ভিন্ন কবিতায় ভিন্ন হলেও। ইংরেজি কাব্যে তার প্রয়াস এই প্রথম,—ভালেরি রিল্‌কে-র কথা দুটো কারণে এখানে ওঠে না। প্রথমত তাঁরা বিদেশী; দ্বিতীয়ত, ভিন্ন ভিন্ন ভাবে, ভালেরি বা রিল্‌কে-র মধ্যে যন্ত্রণা এতো তীব্রতায় দানা বাঁধে নি বলে'ই হয়তো তাঁদের আত্মপ্রকাশ কবিত্বে প্রচ্ছন্ন। আত্মসচেতনতার সাহিত্যরূপ অবশ্য গদ্যে দেখা গেছে প্রুস্তে, জয়সে, কাফ্‌কায়, খানিকটা ভর্জিনিয়া উল্‌ফে। ইংরেজি কাব্যে কিন্তু এলিঅট অতুলনীয়; তাঁর এই আপন সত্তার মুখোমুখি কাব্যযাত্রার অমাবস্যাই আমাদের মন বিচলিত করে। শিল্প-সাহিত্যের মানসে সামাজিক কারণে বা যে কারণে হোক পূর্বোক্ত দ্বন্দ্ব অর্থহীন, যদি না এই চৈতন্যের আত্মনির্ভরতা দেখা দেয়। শিল্প-সাহিত্যের বিষয়ী মনের পক্ষে দ্বন্দ্বের নিরাকরণে প্রয়োজন ঐ প্রাগাত্ম চৈতন্য, অর্থনীতির মূল্যবান ছক্ নয়।

চৈতন্যের সন্ততি ও একতার প্রশ্নেই জড়িত কর্মজীবন, মানসিক সক্রিয়তার তাগিদ্। এলিঅটের আত্মসচেতন ভাবসাম্য পাবার বারম্বার চেষ্টাই আমার কথার প্রমাণ। ১৯১৭ সালেই এলিঅট বোঝেন আত্মসচেতনতার প্রকৃতি—তাঁর ভাষায়, প্যার্সনল্যাটি বা ব্যক্তিস্বরূপ এবং নৈর্ব্যক্তিকতার আদর্শ। কারণ নৈর্ব্যক্তিকতার জানলার পথেই ব্যক্তিস্বরূপের মুক্তি। অতঃপর অল্প বয়সেই তিনি লেখেন তাঁর বিখ্যাত প্রবন্ধ—ঐতিহ্য ও ব্যক্তিগত প্রতিভা। পশ্চিম য়ুরোপের ঐতিহ্য এলিঅট্ নিজে সংগ্রহ করছিলেন প্রচুর ও গভীর। দুর্ভাগ্যক্রমে তন্ময় পশ্চিম য়ুরোপে এসে পড়ল গত মহাযুদ্ধ আর গত শান্তিপর্ব। নৈরাশ্যের পোড়োমাঠে এলিঅট্ দেখলেন নৈর্ব্যক্তিকতার আরো গভীরে শিকড়ের প্রয়োজন, এবং ভাবলেন তাঁর ঐতিহ্যবোধ তাঁর সহায় হবে ভাবদুর্গেরমধ্যেই মৃত্তিকা সন্ধানে। এ সন্ধানের পরিণাম যে ধর্মধ্বজ হবে তাতে আশ্চর্য কি? কিন্তু লক্ষ্য করবার বিষয় হচ্ছে যে, এই মনোভাব যে-হিসাবে এবং যতোখানি তাঁর কবিতার উপজীব্য জুগিয়েছে, সে-হিসাবে তা মোটেই নৈর্ব্যক্তিক নয়, ধ্রুপদীও নয়। নৈর্ব্যক্তিকতা বা ধ্রুপদী শান্তির নির্ভর সমাজব্যাপী পুরাণে, যে পুরাণ মোটা একটা সমাজ-সংস্কৃতির একতায় ব্যক্তি সাধারণকে আশ্রয় দেয়। পুরাণ যে ঐতিহ্য-জ্ঞানার্জনে তৈরি করা যায় না বা পুরাণ যে কখনো ব্যক্তিগত সৃষ্টি হয় না, এ ভুল প্রাচীন রোমান্টিক কবিরা পণ্য-বিপ্লবের পরে তাঁদের উদ্‌ভ্রান্ত মানুষের মর্যাদার অন্বেষণে করলেও, এলিঅট্ নিশ্চয় তা করেন নি। অন্তত এলিঅটের পক্ষে তা করা মানায় না, শেলি বা ব্লেকের অতো কঠিন সমালোচনার পরে।

পুরাণের পটভূমির খোঁজে কালোপযোগী সামাজিক পরিবর্তনে ভীরুর গন্তব্য হয়ে' পড়ে ফ্যাশিস্‌মের স্নায়ুবিকারে জোরকরে'-তৈরি সাময়িক একতার ছক্। পাউণ্ডের মতো এলিঅট্ তাতে ঝোঁকেন নি। তাঁর বিবেচনায় ইংরেজি গির্জার আশ্রয়ে ক্যাথলিক ঐতিহ্যের নিরাপদ দিব্যভাবের আবেদন বেশি। ব্লেক সম্বন্ধে এলিঅটের মন্তব্য ছিল: পুরাণাভাবে বাধ্য হয়ে এই সব কল্পনায় যদি ব্যক্তিনিরপেক্ষ দৃষ্টির প্রতি,—সাধারণ বুদ্ধির উপরে, বিজ্ঞানের নৈর্ব্যক্তিকতার উপরে,—শ্রদ্ধা থাকত, তাহলে ব্লেকের উপকারই হত। মন্তব্যটি এলিঅটের সম্বন্ধেও প্রযোজ্য।

এলিঅটের যে ঐ ব্যক্তি নিরপেক্ষ শান্ত দৃষ্টির উপরে লোভ আছে, সেটা স্পষ্ট। কিন্তু বিজ্ঞানে তিনি নিরুৎসাহ; বিজ্ঞান মানুষের মূল্য স্বীকারে আজ তৎপর বলে'ই কি? তিনি ফিরে চান ধর্মের মাল-মশলার ফর্দ; তার যাদুঘর ঐতিহ্যের সামাজিক প্রাণ

একদা ছিল বলে'ই সেই বিগত যুগের টুকিটাকিতে তিনি অশ্রুপাত করেন। ব্লেক্ এবং শেলির বেলাতে যেমন, এলিঅটের ক্ষেত্রেও 'চিন্তা, আবেগ ও দৃষ্টির বিশৃঙ্খলা' শুধু কবির দায়িত্ব নয়, সেটা জড়িত 'কবির পারিপার্শ্বিকের সঙ্গে যেখানে কবির প্রয়োজন মেটে নি'। কবি হিসাবে এলিঅট্-ও 'হয়তো এইসব কারণ-বিষয়ে সম্পূর্ণ অচেতন'।

আমাদেরই মতো এলিঅট্ মানুষের ইতিহাসটা দেখতে গিয়ে থম্‌কে গেছেন ক্যাপিট্যালিস্‌মের ব্যাপারটায়—তাঁর মতে যা অর্থনীতি ও যন্ত্রশিল্পে একটা খট্‌কা মাত্র। সভ্যতার ইতিহাসে সবচেয়ে বড়ো এই খট্‌কার ব্যাপারটার ফল হয়েছে জন্ ডিউঈ-র ভাষায়: compartmentalisation of occupations and interests which brings about separation of that mode of activity commonly called "practise" from insight, of imagination from executive doing, of significant purpose from work, of emotion from thought and doing ... Those who write the anatomy of experience then suppose that these divisions inhere in the very constitution of human nature.

তাই গীডিয়ন্ বলেছেন ভালো, যে গত শতাব্দীর দায়ভাগে মানুষের বিবিধ কর্মধারাও স্বতন্ত্র, প্রতিযোগী হয়ে' উঠেছে। ব্যবসা-বাণিজ্যের laissez-faire and laissez-aller মানসিক জীবনের কচঙ্গনে প্রয়োজিত।

মানুষের চৈতন্যের এই খণ্ডতায় এলিঅটের যন্ত্রণা ডিউঈ-ভাষ্যের অনুবর্তী। তিনি একে মানবস্বভাবের চিরাচরিত পাপপুণ্যে ফেলে ঈশ্বরের অখণ্ডতায় দুরূহ সন্ধানে ব্যস্ত। অর্থনীতি ও যন্ত্রগুলোর ঐ সামান্য ব্যাপারটা সংশোধনের অনেক বেশি সহজসাধ্য সমাজব্যবস্থার পরিবর্তনের চেষ্টা না করে' তাই এলিঅট্ অসম্বদ্ধ মুহূর্তে শান্তি খোঁজেন, ফাঁকি দেন নিজেকে বিচ্ছিন্ন ব্যক্তিস্বরূপের মতবাদে। সে ব্যর্থ চেষ্টায় যন্ত্রণা বৃদ্ধিই পায় (যন্ত্রণা বৃদ্ধিতে অবশ্য কাব্যের আবেগ আরো তীব্র হয়ে ওঠে)।

সুবিধা হচ্ছে এ ফাঁকিতে ফাঁপামানুষ ঠাসামানুষের কিছু দায়িত্ব থাকে না, কারণ মানুষের মন তো বহুধা হবেই। বহুকাল আগে তাঁর ঐতিহ্য-প্রবন্ধে (আমার বন্ধু সুধীন্দ্রনাথ দত্তর স্বগত দ্রষ্টব্য।) এলিঅট্ লেখেন:

The point of view which I am struggling to attack is perhaps related to the metaphysical theory of the substantial unity of the soul; for my meaning is, that the poet has, not a personality to express, but a particular medium, which is only a medium and not a personality.

মীডিঅম্ বা শিল্পপদ্ধতি-কে যে কি করে' শিল্পী প্রকাশ দেবে সে প্রশ্ন না তুলে বলা

যায় যে শিল্পী, প্রকাশ নয়, ব্যবহার করে' তার শিল্পপদ্ধতি,—মানস ও শিল্পবস্তুর জ্যাবদ্ধ সহযোগিতার ও বাধার মধ্যে দিয়ে। মনের একতা বা সমগ্রতা-কে এলিঅট্ একাকার সংমিশ্রণ বলে ভুল করেন, সে প্রশ্নও এখানে তোলা নিষ্প্রয়োজন।

শুধু স্মরণীয় যে এই রোমাঞ্চসাধনা এলিঅটের ভাষা-ব্যবহারের মাত্রাতেও দ্রষ্টব্য। জন্‌সনের পদাঙ্কে তিনি ন্যায়তই ধমক দিয়েছিলেন মিল্‌টনের অপ্রাকৃত ভাষা-ব্যবহারকে। তিনি নিজে অবশ্য ভাষার ধর্ম বা প্রকৃতি অনুসারে শব্দ বাক্য ইত্যাদি প্রয়োগ করেন। মিল্‌টনের মতো অমিত্রাক্ষরের চৈনিক প্রাচীর তৈরি করার গুরুচণ্ডালী দোষ না থাকলেও কিন্তু কার্ল্ ফস্‌লের-এর অর্থে এলিঅটের ভাষাব্যবহারও খানিকটা অপ্রাকৃত। ধরা যাক্ ঈষ্ট কোকর্-এ সেই জাঁকালো ছত্র যেখানে এলিঅট্ সেকেলে ইংরেজিতে পূর্বপুরুষের কথা বলেন কিন্তু উহ্য থাকে সমারসেটশিয়রের গণ্ডগ্রামের বর্ণনা। সপ্তদশ-শতকে নাকি এলিঅটেরা ঐ গ্রাম ছেড়ে সাগরপারে যান। কিম্বা আগেকার কোনো একটি কবিতা ধরা যাক্—বর্ব্যাঙ্ক উইথ্-এ বায়ডেকের দেড় পৃষ্ঠার কবিতাটি ঐতিহ্যের ভাঁড়ার বল্লেই হয়। সেক্‌স্‌পিয়রের নানা রচনা থেকে উদ্ধৃতি উল্লেখের সংখ্যা অন্তত নয় হবে, তাছাড়া গতিয়ে, সেণ্ট্-আগষ্টীন্, হেন্‌রি জেম্‌স্, ব্রাউনিং, রস্‌কিন্, ডন্, মার্স্টন, ফোর্ড ও স্পেন্সর আছেন।

পেটার সম্বন্ধে এলিঅট্ লিখেছিলেন, "...it represents, and Pater represents more positively than Coleridge of whom he wrote the words, 'that inexhaustible discontent, languor, and homesickness .....the chords of which ring all through our modern literature'. সিম্বলিষ্টদের গুরু-স্থানীয় পেটারই প্রথম চর্চা করেন মুহূর্তমাহাত্ম্যের, হীরকদীপ্তিতে মুহূর্তে মুহূর্তে জ্বলা-র তীব্রতার: to give nothing but the highest quality to your moments as they pass, and simply for those moments' sake.

মুহূর্তের ক্ষণিকতাই যন্ত্রণার কারণ, মুহূর্তের এই নশ্বরতাই মহৎকাব্যের বিষয় এলিঅটের শেষ চারটি কবিতায়:

The moments of happiness—
Not the sense of welbeing, fruition, fulfilment, security or affection,
Or even a very good dinner, but the sudden illumination—
We had the experience but missed the meaning,
And approach to the meaning restores the experience
In a different form, beyond any meaning
We can assign to happiness.

অথবা—For most of us, there is only the unattended
Moment, the moment in and out of time,
The distraction of it, lost in a shaft of sunlight,
The wild theme unseen, or the winter lightning,
Or the waterfall, or music heard so deeply
That it is not heard at all, but you are the music
While the music lasts.

এই সব সুখেব মুহূর্তগুলি—পাতার আড়ালে শিশুব দল, হাস্যবত, সূর্যের রশ্মিপাতে হঠাৎ উচ্ছল বা নিরুদ্দেশ; শুষ্ক সবোববেব শানে রৌদ্রেব ছটা; গোলাপবাগানেব কুঞ্জগলি; ত্ববিতে, এখনই, এখানে, এখনই, চিবকাল—এই সব মুহূর্তগুলি বাববাব ঘুবে' ফিবে' আসে চারটি কবিতাতেই এবং পবিবাবেব পুনর্মিলন নামক নাটকে। এই মুহূর্তগুলিই কি the spring of the still point of the turning world? ঘূর্ণায়মান বিশ্বেব স্থিবকেন্দ্রে দোলকযন্ত্রেব প্রতীকটি এলিঅটের কাব্যে কোরিওলান্ যাবৎ দ্রষ্টব্য। প্রতীকটি তাঁব বহু গভীব কাব্যাংশের কেন্দ্র। মনে হয় এই পবিবর্তমান বিশ্বেব স্থিববিন্দুটি, there where the dance is, যে নাচে বিশ্বজন মোহিছে, নাচের গতিতে নেই, বতোটা আছে ঐ সব নিছক মুহূর্তে, আছে শৈশবেব অমব স্মৃতিতে। অর্বাচীন বোমান্টিক্ ওআর্ডস্ওআর্থেব মতো, প্রবীণ ধ্রুপদী এলিঅটও গান কবেন শিশুমনেব নিবালম্ব শুদ্ধতাব।

Issues from the hand of God, the simple soul (animula). ঈশ্বরের হাত থেকে বাহিবিয়া সবল হৃদয় যদি বিজ্ঞানে চেষ্টা না কবে "পবিবর্তমান সদা আকারে ও বর্ণে চির জড় এ পৃথিবী" নিযন্ত্রিত কবতে, তাহলে পেটারের মুহূর্তসাধনা ছাডা উপায় কি বা ওআর্ডস্ওআর্থেব শৈশবের অমবতাবাহক সংবাদ ছাড়া? কাবণ শিশু স্বভাবতই আত্মসচেতনতায বিধুব নয। কিন্তু ঐ নাচেব প্রতীক?

প্রত্যক্ষ জীবনেব অবসাদ ও বুদ্ধিগত পবোক্ষতত্ত্বেব প্রাণবত্তায় চিন্তিত ভালেবি এই নাচেব প্রতীক টেনেছেন তাঁব স্থপতি য়ুপালিনস্—মন ও নৃত্যের বিষযে নামক সক্রাটিক্ আলাপে। ভালেরিব যুক্তি এলিঅটেব চেয়ে বেশি সম্পূর্ণ, সাধ ও সিদ্ধান্ত-সঙ্গত। দীর্ঘ এক আলোচনায় চিকিৎসার বাইরে এই জীবনাবসাদরোগ ক্ষণিক আবাম পেল শিল্পেব স্বাধীন সত্তাব স্পর্শে, আতিক্তেব নাচের পবোক্ষ মুক্তিতে; এবং সক্রাটিস্ বলে ওঠেন:

হে অগ্নিশিখা!....

মেয়েটি আসলে হয়তো মস্তিষ্কহীন ? …
হে অগ্নিশিখা ! …
কে জানে ওর অতিসাধারণ মনটা কতো কুসংস্কারে
আর কতো খামখেয়ালে বোঝাই ?…
হে অগ্নিশিখা, চির নিবাতনিষ্কম্প্র ! প্রাণময় আর দেবতুল্য ! …
এই অগ্নিশিখা, এ আর কি, বন্ধুগণ ! যদি না
এ হয় সাক্ষাৎ মুহূর্তটিই ?…

এলিঅট্ কিন্তু ঐ অবসাদ-সীমা ছাড়িয়ে নাচটাকে একেবারে এবষ্ট্রাক্‌শন বা পরোক্ষ-তত্ত্ব ভাবে দেখেন না, নর্ত্তককেও দেখেন না। অথচ নৃত্যের বিষয়ানুগ নৈর্ব্যক্তিকতা তাঁর মতো মহাকবিকে কাব্যবিষয় জোগাতে পারত। চিত্রকল্পটী সবল ও দ্বৈত—এক হচ্ছে দর্শক দূর থেকে বসে দেখে এবং নর্তকদের খণ্ডগতির সমষ্টিতে উপলব্ধ হয় নাচটার রূপ। আর দ্বিতীয়টি হচ্ছে কবি নৃত্যের মধ্যে সক্রিয়, নৃত্যের কেন্দ্র ঘিরে ঘুরে ঘুরে এদিকে ওদিকে সংলগ্ন নর্তকরা যেখানে নৃত্যকে মূর্তি দিচ্ছে। নৃত্যের খণ্ডিত কিন্তু সক্রিয় উপলব্ধিতে আসে নৃত্যের পরোক্ষ রূপটি, স্থানে কালে সমগ্রে ও খণ্ডের সংলগ্নতায়। এখানে দর্শকের ব্যক্তিগত বিষয়ী চিন্তাবলীতে উপলব্ধির আরম্ভ নয়। অংশের ক্রমিকতায় নয়, নর্তকের স্বাতন্ত্র্যে নয়, সারা নৃত্যে সক্রিয় উপলব্ধি একাগ্র। আমার প্রতীকটা স্থূল হল, কিন্তু এলিঅটের লেখনীতে এ প্রতীকের কাব্যোৎসারে বিশ্ব ও ব্যক্তি, বিষয় ও বিষয়ীর চৈতন্যকৈবল্য কি মর্মস্পর্শী রূপ নিতে পারে, তা কল্পনীয়।

শেষ কবিতাগুলিতে এলিঅট্ এ প্রতীকের খুবই কাছাকাছি আসেন। তাঁর অন্বিষ্ট—বিষয়সর্বস্ব বা বিষয়বিষয়ীর দ্বন্দ্বাতীত স্থিরবিন্দুটি, স্থিতি যার গতির মধ্যে, অবিচ্ছিন্ন চিৎপদ্মের মধ্যমণিতে। বিষয়লগ্ন এই দৃষ্টি সম্ভব সক্রিয়চক্রের মধ্যে অস্তিত্বস্বীকারেই, উপর থেকে আবছা দেখায় বা পাশ থেকে তির্যক দৃষ্টির ছবিতে দ্রষ্টাদৃশ্যের মীমাংসা ঘটে না। এবং এই চক্রবৎ পরিবর্তন তো জীবনেরই গতি যার পরিধির পারে শুধু মৃত্যুরই নেতি নেতি। তাই মৃত্যুর জীবন্ত ছলা—মৃত্যুর মধ্যে দিয়ে দর্শকের স্বাধীনতা অর্জন। কিন্তু এ স্বাধীনতায় নৃত্যের রূপায়ন ব্যাহতই হয়, স্থিরবিন্দুটি হয় অস্থির। ঘূর্ণায়মান বিশ্বের স্থিরবিন্দুর এ প্রতিবাদে, মানছি, অশান্ত হৃদয় অনেক চমৎকার কল্পনা ছিটিয়ে বেড়ায়,—অনেক নরকল্প দেবদেবী, কাল্পনিক আয়ার্ল্যাণ্ডের মৃত পুরাণ, অনেক তন্ত্রমন্ত্রের কুহক।

এলিঅট্ তাই অনিবার্যকারণে বিজ্ঞানবিদ্বেষী, মানবচৈতন্যের সমগ্রতা তাঁর কল্পনায় নেই, জড়প্রকৃতি বা সমাজে সম্ভব যে মানুষের নিয়ন্ত্রণতা তা তিনি মানেন না। তাঁর সুর পণ্যবিপ্লবের দ্বিধাদীর্ণ বেদনার—what man has made of man! মানুষের মনের ভাঙন মর্তলোকে চিরস্থায়ী, কারণ "চিরস্থায়ী বন্দোবস্তে" কিঞ্চিৎ সুখসুবিধাও আছে! সুতরাং—

And hear upon the sodden floor
Below, the boarhound and the boar
Pursue their pattern as before
But reconciled among the stars.

অমানুষিক ঐ নক্ষত্রস্বর্গ আমাদের দায়িত্বের নাগালে নয়, অতএব কর্মফলহীন কর্মে কিবা লাভ? শিকার-শিকারীর প্রকৃতি নশ্বর জীবনে চিরাচরিত, তার থেকে আসে মৃত্যু নিয়ে দুশ্চিন্তার গভীর আবেদন।

এলিঅট্ অবশ্যই সাম্রাজ্যের স্তম্ভ নন, তবু তিনিও যে দায়িত্বহীন ব্যক্তিস্বরূপের মতবাদ খাড়া করে' ইটন্-হ্যারোর ব্যক্তিমাহাত্ম্য গান করবেন এবং সামাজিক নিয়ন্ত্রণ আর সমাজ-পারিপার্শ্বিকের প্রভাব ও সংস্কৃতির প্যাটর্ন্স্ মানবেন না, তাতে সাম্রাজ্যের পাপই প্রমাণিত। সেই পাপেই জড়প্রকৃতি বা পশুপ্রকৃতির সঙ্গে মানবস্বভাবকে এক করা ইতিহাসের চোখে মার্জনীয়, ঈশ্বরের চোখে নারকীয় ভ্রান্তি। কিন্তু আমার মন্তব্যের স্থানে এলিঅটের আশ্চর্য কবিতা উদ্ধৃত করাই বাঞ্ছনীয়ঃ

At the still point of the turning world. Neither flesh nor fleshless;
Neither from nor towards; at the still point, there the dance is,
But neither arrest nor movement. And do not call it fixity.
Where past and future are gathered. Neither movement from
nor towards,
Neither ascent nor decline. Except for the point, the still point,
There would be no dance, and there is only the dance.
I can only say, there we have been: but I cannot say where.
And I cannot say, how long, for that is to place it in time.

অতুলনীয় এ কবিত্বে শ্রদ্ধা স্বতই অসীমে পৌঁছায়; ভাবি এবারে বুঝি আইনষ্টাইন্-প্লাঙ্কের জগৎ, আধুনিক জীববিদ্যার মনোবিজ্ঞানের অভিজ্ঞা কাব্যের গভীর রূপ পেল। কিন্তু এ পরিগ্রহণ সাময়িক, এলিঅটের দ্বন্দ্ব যে নিরাকৃত হয়নি তার প্রমাণ ভিন্নস্তরের অভিজ্ঞতার ব্যর্থ মধ্যপদলোপী সন্ধিচেষ্টায়। গতি ও আপেক্ষিকতা এবং স্থিতিকেন্দ্র অস্বীকারের ব্যথিত ভিত্তিতে, ব্যক্তির চৈতন্যের কল্পিত তাঁর দ্বিধাঃ

I said to my soul, be still ; and let the dark come upon you
Which shall be the darkness of God. As, in a theatre,
The lights are extinguished, for the scene to be changed
With a hollow rumble of wings, with a movement of darkness on darkness,
And we know that the hills and the trees, the distant panorama
And the bold imposing facade are all being rolled away—
Or as, when an under-ground train, in the tube, stops too long between stations.
And the conversation rises and slowly fades into silence
And you see behind every face the mental emptiness deepen
Leaving only the growing terror of nothing to think about ;
Or when, under ether, the mind is conscious but conscious of nothing
I said to my soul, be still, and wait without hope
For hope would be hope for the wrong thing ; wait without love
For love would be love of the wrong thing ; there is yet faith.
But the faith and the love and the hope are all in the waiting ;
Wait without thought, for you are not ready for thought :
So the darkness shall be the light, and the stillness the dancing.

Whisper of running streams, and winter lightning,
The wild theme unseen, and the wild strawberry,
The laughter in the garden, echoed ecstasy
Not lost, but requiring, pointing to the agony
Of death and birth.

মর্মভেদী এ কাব্যের পরে নতমস্তকে জানাতে হয় বিচলিতহৃদয়ের সম্ভ্রম। কিন্তু ধার্মিক মরমিয়ার একি মহাশূন্য ? মনে পড়ে রবীন্দ্রনাথের আশ্চর্য সম্পূর্ণ জীবনের শেষে জীবন্মৃত্যুর ছন্দের দৃপ্ত স্বীকার বা পূরবীর ঐশ্বর্যের কথা—শূন্যতার অগ্নিবাষ্পে ভরা।

এ স্থির মহাশূন্যের সমস্যাই আরো সহজবোধ্য নাট্যরূপ পেয়েছে ফ্যামিলি রিয়ুনিঅন্-এ। বুড়ো লেডি মন্চেন্সে এমি-র অতীতের শোকে নাটকের আরম্ভ :

O Sun, that was once so warm,
O Light, that was taken for granted
When I was young and strong and sun and light unsought for—

স্থূলবুদ্ধি আইভি বলে : আমি হলে সূর্যের পিছনে ছুটতুম, সূর্যের আশায় থাকতুম নাকো বসে। চার্লস্ বলে : এমি আমাদের বনেদী ধরণে চিরটা কাল ঘোড়া ও কুকুর বন্দুক নিয়ে কাটিয়ে শেষে ইংলণ্ড ছেড়ে কোথায় কাটাবে শীত। এমির দিন কাটে

উইশ্‌উড্‌ প্রাসাদে ছেলের প্রতীক্ষায়। লর্ড হ্যারি আট বছর ধরে' সারা পৃথিবী ঘুরছে এক বাজে বউ নিয়ে। এগাথা বলেঃ তার প্রত্যাবর্তন নিশ্চয়ই হবে যন্ত্রণাকর,

I mean painful, because everything is irrevocable,
Because the past is irremediable,
Because the future can only be built
Upon the real past.....................

He will find a new Wishwood. Adaptation is hard.

এমি বলেঃ কিছুই তো পরিবর্তন হয়নি। এগাথা উত্তর দেয়ঃ আমি বল্‌ছি যে উইশ্‌উডে হ্যারি দেখবে আরেক হ্যারিকে। যে মানুষ ফিরবে, সে দেখবে সেই ছেলেটিকে যে যাত্রায় বেরিয়েছিল। ইতিমধ্যে হ্যারি জাহাজ থেকে তার নির্বোধ স্ত্রীকে সাগরতলে পাঠিয়ে ফিরে এল। একা, তার পিছনে পিছনে গ্রীক গল্পের বিবেকরূপিনী চণ্ডীভগিনীরা প্রতিশোধের খোঁজে ছুটছে, ফিরে এল বর্‌ন্‌ট্‌ নর্টনের মতো উইশউডের জমিদার-বাড়ীতে। হ্যারি দেখ্‌ল সেই সব চেনা মানুষ, যারা আত্মঅচেতন, যাদের মনের তীরে ঘটনার ঢেউ বৃথাই আছড়ে আছড়ে পড়েছে, আর সে নিজের মনের বালাই নিয়ে অস্থির।

হ্যারি বলে তার নিঃসঙ্গতার কথা, ভিড়ের মধ্যে একাকীত্বের বুকচাপা ভাব, তার স্ত্রীর মৃত্যুর কথা, নিজের যন্ত্রণা। ছোট মাসী এগাথা সান্ত্বনা দেয় আর বলেঃ

There is more to understand, hold fast to that
As the way to freedom.

যা আবশ্যিক, তার সীমা স্বীকারেই তো মুক্তি। এ বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিতে হ্যারি বলেঃ মনে হয় বুঝি তোমার মানেটা, অস্পষ্টভাবে—সেই যেমন তুমি বুঝিয়েছিলে চিম্‌নিতে কান্নাটা বা অন্ধকার ঘরে সেই মন্দটার ভয়।

মেরি-র সঙ্গে ছেলেবেলার স্মৃতির আলাপের পরে হ্যারি বুঝতে পারে স্মৃতিজীবী বিচ্ছিন্ন মুহূর্তের ভ্রান্তিঃ

The instinct to return to the point of departure
And start again as if nothing had happened,
Is n't that all folly ?

নাটকে এলিঅট্‌ কিভাবে তাঁর মোট প্রশ্নগুলি তোলেন এবং নিজেই জবাব খোঁজেন, সেটা লক্ষ্য করবার বিষয়। কিন্তু চণ্ডিকাদের সাম্‌নে হ্যারি আবার ভয়ে আঁকড়ে ধরে, বহুধা ব্যক্তিস্বরূপের অছিলাঃ আমি যখন তাকে (স্ত্রীকে) জানতুম, সে আমি আর এ

আমি এক নয়। চেম্বরলেন্-সবকাবের দায়িত্ব আব চর্চিল্ সবকাবেব ভুগতে হবে না। এগাথা বৃথাই বলে' যায় যে শাস্তি এড়িয়ে অপরাধেব দায়িত্ব এড়ানো যায় না :

That there is always more : we cannot rest in being
The impatient spectators of malice or stupidity.
We must try to penetrate the other private worlds
Of make-believe and fear. To rest in our suffering
Is evasion of suffering. We must learn fo suffer more.

প্রায় মার্ক্সীয় প্রস্তাব এ আভাসে শেষটা অবশ্য হ্যাবি চণ্ডিকাদেব বহির্বিষয় করতে সক্ষম হল এবং পেল মনেব মুক্তি :

This time you are real, this time you are *outside* me
And just endurable.

এখানে হ্যাবিব যে ব্যাখ্যা তাব বাপমায়েব অপরিতৃপ্ত প্রেমের, সে বিষয়ে একটা কথা বলা যায়। There was no ecstasy. তাই কি এলিঅটেব সাবা কাব্যে শুধু প্রেমের ক্লান্তি ও বীভৎসতা—the boredom, the horror-ই আছে, প্রেমেব আনন্দ, the glory নেই? তাই কি প্রেম কীটজর্জব শবীবে পর্যবসিত, ক্লেদ, ও মৃত্যুব বিভীষিকায়, dung and death-এ? এতো বড কবির কাব্যসংগ্রহে মাত্র দুটি কবিতায় প্রেমেব বিষয়ে এলিঅট্ একটু সহিষ্ণুতা দেখিয়েছেন—লা ফিল্লিয়া কে পিয়ান্জে এবং দি ওএস্টল্যাণ্ডেব প্রথম অংশে। তাও সেখানে কবিব বিষয় প্রেমেব চঞ্চলতা, পিয়াস, প্রেমেব সম্পূর্ণতা নয়। বোধ হয় প্রেম দুই ব্যক্তিব দ্বৈতে একটি চলিষ্ণু সম্বন্ধ বলে তাতে মুহূর্তবিলাসী দেখে শুধু ক্ষণিক সক্রিয়তাব অনাচার।

গীতা এলিঅটকে তাঁব কাব্যেব চমৎকাব বসদ জুগিয়েছে, তাই গীতাব ভাষাতেই বলা যায় যে কর্মেন্দ্রিয় নিবৃত্ত রেখে যে ব্যক্তি ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয়সমূহে মনে মনে বাস করে, সে উদ্‌ভ্রান্ত জন কপটাচার করে। বলাই বাহুল্য, কাব্য আচরণ নয়, কাব্য হচ্ছে মনেব অন্তবঙ্গ উদ্বেলতাব বহির্বিষয়ে অঙ্গীকার, কাজেই কপটতা নয়, উদ্‌ভ্রান্তিই এখানে দ্রষ্টব্য। এই উদ্‌ভ্রান্তি ছাড়া এলিঅটেব একাধারে আশ্চর্য সুকুমাব প্রজ্ঞান্বেষণ এবং মৃত্যুব উপবে ভয়ানক ঝোঁক মেলানো যায় না। ক্ষুধা নয়, বোগ নয়, প্রেম নয়, ঝগড়া নয়, যুদ্ধ দুর্ভিক্ষ নয়, কাবণ এ সবই মানুষেব সক্রিয় সাধ্যেব ভিতবে, শুধু বিষ্ঠা আব মৃত্যু। মৃত্যু যে স্বাভাবিক, এবং স্বাভাবিক নিয়ে শোককবা যে নির্বুদ্ধিতা, সে অবশ্যই এলিয়ট্ জানেন তবু কেন এতো ঝোঁক? প্রাজ্ঞ কখনো বিচলিত হন না জীবিত বা মৃতের জন্য। এলিঅটেব মুখ্যবিষয় নিশ্চয়ই আত্মসচেতনাব সমস্যা, আত্ম-

সচেতনতা ও কর্মের আপাত দ্বন্দ্ব,—কর্মফল নয়,—কর্মের আর আত্মসচেতন মনেব সঙ্গতির সন্ধান, বিচ্ছিন্ন জীবনের পুরুষার্থে ঐক্যেব সমস্যা।

নিশ্চয়ই থিয়েটাবসভার নিষ্কর্ম ঐ অন্ধকার নয়। কাবণ কৃষ্ণ উবাচ যে নিষ্ক্রিয় হয়ে' বসে' থাকলেও কর্মের দায় এড়ানো যায় না। প্রকৃতিজাত কাবণে জীবমাত্রেই প্রতিমুহূর্তে কর্মস্রোতে চলিষ্ণু। কর্মের স্বাধীনতা কর্মেব মধ্যেই। সকল কর্মেব সমগ্রতায়, হে পার্থ, জ্ঞানেব উৎস। আগুন যেমন জ্বলতে জ্বলতে ইন্ধনকে কবে' দেয় ছাই, জ্ঞানের অগ্নি তেমনি জ্বলে কর্মের জ্বলার মধ্যেই।

কিন্তু হৃদয় যদি মানে না মানা, যদি মুহূর্তেই বসে' থাকে অনড জড়পদার্থবৎ? ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বিষয় যদি সোনাব হবিণেব মায়ায় ডাকে? সে বাসনাব পবিণাম বাগে, কারণ এ পিয়াসী মন বৈজ্ঞানিকোচিত নৈর্ব্যক্তিকতায় ভেবে দেখে না কেন মুহূর্তেব বাসনা চিবস্থায়ী বস্তু হতে পারে না, তাই হয় নিরাশ, ক্রুদ্ধ। ক্রোধ থেকে আসে, কৃষ্ণ বলেন, ভ্রান্তি; ভ্রান্তি থেকে উচ্ছৃঙ্খল স্মৃতির দৌবাত্ম্য। প্রতীকোৎসারী স্মৃতিব যন্ত্রণা। যতোই বিশৃঙ্খলা, যতোই যন্ত্রণা, ততোই জীবনে অসহিষ্ণুতা—বাসনাসঙ্কুল এই যে জীবন অসম্বদ্ধ, সামাজিক সমর্থনহীন, একক আত্মজ্ঞানের দ্বন্দ্বে স্মৃতিমুখব। আর দুর্মব এই স্মৃতি।

আমাব বিশ্বাস এলিঅট্ এই ভাবগুলিই নাট্যকাব্যে রূপায়িত করেছেন। তাঁব persona (রূপায়নে শিল্পীব নাট্যরূপ বা মুখোস্) সুচিন্তিত, তিনি নিজে নন, তোমার-আমাব মতো সাধারণ লোকই হচ্ছে নাট্যপাত্র, বাদবিসম্বাদে উদ্‌ভ্রান্ত। তাই তিনি বল্‌তে পারেন যে মুক্তির পথ শূন্যেব পথ, মালার্মের নেতির মতো। ধর্মসাধকেরা তো অধ্যাত্মউপলব্ধিব এ বর্ণনা মানেন না, এলিঅটেব মতো সাধক নিশ্চয়ই সে বর্ণনা করতে চান্ নি। এ শূন্য বোধহয শুধু যন্ত্রণাব স্বর নিখাদে চড়িয়ে দেবার কৌশল। (গীঃ অঃ ১২, ১৩-১৪)

এলিঅটের এই সমস্যা। বিজ্ঞানবিবোধী, তিনি গতিশীল জীবনে কোনো ডায়ালেক্‌টিক্‌সের হাল ধরতে পাবেন না। সমস্যাটা অবশ্য একেবাবে নতুন নয়। টমাস্ ব্রাউন্ এই সমস্যাব শিং ধবে' সমাধান কবেন নিজেব মতো। ধর্মে তাঁর বিশ্বাস নেতিবাচক ছিল না, বিজ্ঞানেও ছিল আস্থা; তিনি ভিন্ন স্বতন্ত্র ন্যায়বিশ্বেব মতবাদে সমাধান খুঁজে পান, যাতে অধ্যাত্ম ও বিজ্ঞান দুইই বিশ্বাস্য। মন্‌টেনেব সমাধানও প্রায় এইবকম, যদিচ তাতে জিজ্ঞাসাব ভাগটাই বেশি। মিল্‌টন বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিরই

একচেটে ভক্ত ছিলেন, তাই তাঁর ঈশ্বর প্রায় বৈজ্ঞানিক বুদ্ধিব রূপক বল্লেই হয়। বেকন তো বৈজ্ঞানিক। সূর্যেব চারদিকে পৃথিবীব ঘোরায় সেকালে ডনের কান্নাটা খুবই করুণ—And New Philosophy calls all in doubt. এলিঅটের অবস্থা প্রায় ডনের মতো; মনেব গঠনে নেই অধ্যাত্মজীবীব ঐশ্বর্য, তবু তিনি ধর্মবাদী স্থায়ী বন্দোবস্তেব মরীয়া ভক্ত। তাই এ বিচ্ছেদের, ভেদাভেদেব গান। কৃষ্ণ ব্যাপারটা জানলে হয়তো বলতেন, যে জ্ঞানে সর্বজীবেব বিবিধ জীবনধারা বিচ্ছিন্নরূপে প্রতিভাত, সে জ্ঞান বাসনাদুষ্ট।

বলাই বাহুল্য গীতাব অপব্যবহারে আমাব কিছুমাত্র আর্যোচিত আপত্তি নেই। এলিঅট্ নিজেই তো সেনেকা প্রবন্ধে দেখিয়েছেন কি কবে', অজ্ঞানে বা অল্পজ্ঞানের ভিত্তিতে মহৎকাব্য রচিত হতে পাবে। দি ড্রাই স্যাল্‌ভেজেস্-এব জম্‌কালো গীতা-ব্যবহাবে আমাব কাব্যাস্বাদ পরিতৃপ্ত; আব পাণ্ডিত্য না থাকায়, পাণ্ডিত্যাভিমান সংযত করাব প্রশ্নই ওঠে না। আমার মতে দি ড্রাই স্যাল্‌ভেজেস্‌ই কবিতাচতুষ্টয়েব মধ্যে সবচেয়ে আঁটসাঁট কবিতা। লিটল্ গিডিং-এব দাস্তেশোভন ভাস্কর্য ও গাম্ভীর্য সত্বেও এই শেষ কবিতাটি এক হিসাবে প্রত্যাবর্তন। এখানে এলিঅট্ শেষ কবেছেন এয়ব-বেড রাত্রিব জাঁকালো বর্ণনাব পবে নটিংহামের রয়্যালিস্ট চ্যাপেলে প্রথম চার্লসের নৈশাভিযানে যখন অন্তর্যুদ্ধে রয়ালিস্টবা হেবে গেল। অবিসম্বাদী কবিত্বে এলিঅট্ আর্তনাদ করেছেন পার্টিবাজনীতিব নশ্বরতায়। মৃত্যুতে, কালস্রোতে রয়ালিস্ট্‌ও শূন্যে বিলীয়মান, কি হবে কিছু কবে', লড়ে', তাই হায় হায়।

আমি শেষ করি তৃতীয় কবিতার আশাপ্রদ শেষ ছত্রে:

We content at the last
If our temporal reversion nourish
(Not too far from the yew tree)
The life of significant soil,—প্রুফ্রকেব আত্মসচেতন নিষ্ক্রিয় কৈশোর থেকে এ কবি পবিণতির দীর্ঘ মহাপ্রস্থান নমস্য কীর্তি।

বিষ্ণু দে

সুয়েজ খাল

বৃদ্ধ এশিয়া নব ইউরোপ মৃত্যুমগ্ন আফ্রিকার
বৈশ্যযুগের সিংহদ্বার !
স্তব্ধপাঁজরে বিগত দিনের কাহিনী
পণ্য-খড়্গে দ্বিখণ্ড দেহ পশ্চিমী প্রাণ-বাহিনী—
সুয়েজ খাল
শুকনো পাহাড়ী ধূলোয় লাল !

*

দূরে-বহুদূরে উত্তমাশার আশা কেড়ে নিয়ে
সোজা সড়ক্
সন্ধান দিলে বিশ্ব-লুঠের। কালাদের দেশে
চলে মড়ক ;
শ্রম-শোষণের যাঁতাকলে পিষে হাড়মাস হ'ল
ভাজা ভাজা
বৈশ্যতীর্থ ইউরোপ জুড়ে ব্যাঙ্কে ব্যাঙ্কে
বেনে রাজা—
মানুষ করবে বিশ্বকে ?
সাথে ক'রে নেয়, কখনো শাসায়
সমব্যবসায়ী শিষ্যকে।
তুমি সবই জানো সুয়েজ খাল !
বুকে ক'রে শুধু কুমীর বহেছ দীর্ঘকাল।

*

মন্থর গতি ইস্পাতী রঙ্
আনাগোনা করে নৌ-বহর
উদ্ধত শ্বেত-সওদাগর।

সাম্রাজ্যের লুণ্ঠিত ধনরত্নের ভারে
দোলে জাহাজ,
মত্ত মাতাল মানোয়ারী গোরা
সজাগ পাহারা গোলোন্দাজ।
নিগ্রো-হাব্সী-বেদুঈন আজ দীন মজুর
বেওনেটে কাঁপে শ্বেত-জুজুব।

*

শ্যামলতাহীন পাটল পাংশু মরু-উপকূলে খেজুর বন
তীক্ষ্ণ কাঁটার মর্মর গানে কী উন্মন্!
দুর্দিনে তবু স্বপ্ন-বিভোর কারাভান, উট, মরূদ্যান,
সেমুম ঘনায়। কোথা কতদূরে কৃষ্ণ-সাগর,কাস্পিয়ান?
কোথা কতদূরে ভল্গার তীরে চির-মানুষের মুক্তি-গান?
স্বপ্ন-বিভোর সুয়েজ খাল
লোহিত সাগরে নীলজলরাশি রক্ত-মেঘের আভায় লাল।

*

পশ্চিম তটে মিশরী উষর শিলীভূত
মহামরু পাহাড়!
পূর্বপ্রান্তে স্তিমিত বীর্য
সোদী-আরবের জুড়ানো হাড়,
লোহিত-সাগর উপকুল জুড়ে কী গম্ভীর
পুঞ্জিত রোষ হু হু করে শত শতাব্দীর
বালুকণিকায় ভারী বাতাস
শূন্যে ঝড়ের লাল আভাস!

বিমলচন্দ্র ঘোষ

হিসাব-নিকাশ

রেলে যেতে চোখে এলো অফুরন্ত মাঠ-ঘাট-বন
বেশুমার গাছপালা নদীনালা ঝোপঝাড় ক্ষেত।
পিছনে শহরে করে হিসাব নিকাশ ততক্ষণ
খাতার পাতায় কিলবিল, স্থির সব অভিপ্রেত
গোপন গলির গর্ভে ফলপ্রসবের লোভে কাঁপে,
অন্দি-সন্ধি কোনাঘুঁজি ইঞ্চি ইঞ্চি আঁকা, আলো জ্বালা
জল ঢালা রাত্রিদিন মাত্রামান মিটারের মাপে,
সত্ত্বাধীকারের সীমা ছককাটা টালি হ'তে টালা।

মাইল মাইল পথ ছুটে যায় পিছনে, বিস্তৃত
সুনীল আকাশ যেন কোনো এক শিশুর আহ্লাদ!
দিগন্তে যে সব গ্রাম সুকোমল সবুজে আবৃত
জনমনুষ্যের চিহ্ন নেই যেন সেখানে, অবাধ
উন্মুক্ত মাঠের প্রান্তে শুধু এক খুসির স্তব্ধতা!
প্রান্তর সীমানাহীন, অপসৃত দৃশ্য ছেদহীন
লাবণ্যপ্রবাহ এসে ভেসে ভেসে যায়, কলস্রোতা
রেলপথে অবিরল হেসে চলে বেহিসেবী দিন।
তবু হায় যে প্রান্তর দিগন্তপারেও নৃত্যপর
তারি পায়ে জরীপের জমকালো অচল শিকল!
আলি দেওয়া ফালি ফালি জমি আর সত্বের সাক্ষর!
বিশ্বের কোনো না কোনো কোণে ঠিক আছে অবিচল
প্রত্যেক জমির ন্যায্য অধিকারী! সযত্নে রক্ষিত
দাখিলা-কবালা-পাট্টা-পরোয়ানা নথিপত্র সব

ঘরে ঘরে, দেওয়ানি আদালতে ! একান্ত নিভৃত
তৃণাগ্র পর্যন্ত চলে অনন্য দাবীর অনুভব !

দৈনন্দিন রাজপথে কত শত উর্বশী-উদয়,
মনে হয় বৃন্তহীন ; দিব্যকান্তি নিটোলনধর
ছেলেমেয়ে, মনে হয় স্বুখস্বর্গখসা ; স্বপ্নময়
সফেদ প্রাসাদ, মনে হয় স্বয়ংসম্ভূত শিখর।
শূন্যমূল আকাশকুসুম, আকাশে দোদুল্যমান ;
প্রেমভালবাসা, স্বর্গীয় সম্পদ। যে যেমন তার
তেমন সম্মান প্রাপ্য এবং ভদ্রলোক বীর্যবান
বিচক্ষণ, অতএব বসুন্ধরা-ভোগে অধিকার !
অটলনিটোল ভদ্র মোহময় সুরের প্রলাপ
যে তন্ত্রীতে গুঞ্জরিত তার একপ্রান্তে প্রাচুর্যের
পাহাড় দণ্ডায়মান, আর অন্যপ্রান্তে অভিশাপ
মহামারী-দুর্ভিক্ষ-মড়ক-যুদ্ধে। চাষী মজুরের
দেশ দিয়ে রৌদ্রোজ্জ্বল রেলওয়ে-তার প্রসারিত।
নির্জন উদাস মাঠে সমুদ্রপারের ছায়াভাস।
অদূরে শহরে গ্রামে কত মৃত কত জীবন্মৃত।
আরো দূরে লালসৈন্য রাখে এক হিসাব-নিকাশ !

গোলাম কুদ্দুস

২

দীক্ষা

তোমাকে পরাই এস জয়ের তিলক।
তুমি যাবে রণক্ষেত্রে, যেথা উৎপীড়ক
উৎপীড়িত হবে। সেই ভাবী জয়োল্লাসে
কাঁপে তনু থরো থরো। কী দারুণ ত্রাসে
হে প্রিয় আমার, কত কেটেছে দিবস।
আত্মগ্লানি বারে বারে হয়ে পরবশ
শুধু ভয় নানাভাবে ঘিরেছে জীবন।
গভীর আশায় মেতে আনন্দে যখন
যদি বা ডেকেছি দূর নিকট বন্ধুরে,
সহসা উড়েছে ধূলি তীব্র অশ্বখুরে,
দেখি ফিরে ধাবমান বর্বর নির্দয়
ছিন্ন করে সে উৎসব, ভিন্ন এ হৃদয় ;
নিরানন্দ, অনিশ্চিত, কালের প্রহার।
মৃতসঞ্জীবনী সুধা অমৃত আধার
মোদের কাণ্ডারী আজ এ বিপদে তুমি
এস পর জয়টীকা ; চুম্বি মাতৃভূমি
দেখা দিক নয়নে তোমার দীপ্তশিখা,
বিদ্যুত আখরে তার হোক জয় লিখা
ললাটে সবার। চেয়ে দেখো এ হৃদয়
উদ্বেলিত সাগরের মতো। প্রেমময়
হয়ে রয় কাংস সে নিনাদে শুনি যবে

বিদীর্ণ আকাশ বিদ্রোহের উচ্চরবে।
কোথায় সান্ত্বনা বল নিলর্জ্জ বিলাপে ?

শুধু আশা (শেষবার এ হৃদয় কাঁপে)
বলি যবে, উৎপীড়ক উৎপীড়িত হবে।

জোগাব রসদ মোরা রণক্ষেত্রে যবে
তুমি যুদ্ধরত। কামারের হাপরের
অগ্নিদগ্ধ লোহা আর কাটা ফসলের
পাঠাব রসদ। দেশের সম্পদ জানি
ভোগ্য সবাকার, তবু তার সবখানি
এতকাল মুষ্টিমেয় শাসকের হাতে
হয় নিয়ন্ত্রিত। এ বিপদে তার সাথে
হবে শেষ পরিচয়। সম্মুখ সমরে
কিংবা গুপ্ত আয়োজনে বিপ্লবের তরে
মোরা সদাই জাগ্রত।—জাগে সামগান
হৃদয়ে সবার। বৈষম্যের সমাধান
চলে দ্রুততালে। একই স্বার্থে সুর
মেলাবে সবাই আজ নিকট সুদূর।
এত আয়োজন আহা! দেখি এরই মাঝে
মুক্তি অঙ্কুরিত প্রায়। নিষ্পিষ্ট সমাজে
নির্ভীক সঙ্কল্পে ব্রতী মজুর কিসানে
একটি শ্রেণীর মুক্তি আজ তারা জানে
চিরমুক্তি মানব জাতির।—নিরোধক
বিশ্বব্যাপী উৎপীড়ক উৎপীড়িত হোক—
এই কথা ঘরে ঘরে নিখিল মিছিলে
রক্ত পতাকায় ওড়ে আকাশের নীলে।

একদা দেখেছি পাকা ফসলের শেষে
হাতে কাস্তে দলে দলে গ্রাম্যজন মেশে।

দেখি মৃত্যু মহোৎসব। কাটা ফসলের
ভারে পৃথিবী মন্থর। নেমেছে শোকের
ছায়া-প্রান্তরের কোণে। মৃত্যুর মহিমা
না এ পুনরুজ্জীবন ? কোথা এর সীমা।
নৃত্যতালে অভিনয় চলে একাধারে
জন্ম ও মৃত্যুর। শুনি সেথা বারে বারে—
প্রাণ চায় মৃত্যু আর মৃত্যু আনে প্রাণ।
আজো বুঝি জন্ম ও মৃত্যুর সেই গান
সর্বগ্রাসী অনীকেরে তুমিই শোনাবে
অগ্নির কন্দুকে দীর্ঘ নির্ধৃত আরাবে।
জলে, স্থলে, অন্তরীক্ষে শোনো কিবা ক্ষোভে
ওঠে ধ্বনি—উৎপীড়ক উৎপীড়িত হবে।

সাঙ্গ হোক দীক্ষা তব দেহের রুধিরে
প্রতিভা লিখন ! সর্বজনে ডাকো ফিরে
শত্রুর নিশ্চিহ্ন তরে। তোমার এ দান
এই ক্রোড়ে আবরি এ বালক সন্তান
ঝঞ্ঝাহত নিশীথে কি উৎকণ্ঠিত প্রাণে
ভুলাব ক্রন্দন তার সেই একই গানে—
রণক্ষেত্র বিকম্পিত যার উচ্চরবে
শোনা যায়—উৎপীড়ক উৎপীড়িত হবে।

চঞ্চলকুমার চট্টোপাধ্যায়

মনু

ক্ষেত ছেড়ে, লাংগল কাঁধে তুলে বাড়ি যাচ্ছিলো মেনাজ। খালের পাড়ে বৈরাগীর দোকানের সামনে একটু থামলো--কলহিডা দেও দেহি এট্টু বৈরাগী ভাই।

দুই তালুর মাঝে কলকেটা রেখে প্রকাণ্ড এক সুখটান দিয়ে ধোঁয়া ছাড়তে ছাড়তে আবার ছুটলো গরুটার পিছে ;—হ, হ।—পাড়ের কাদায় ঠ্যাং আটকে মুখ থুবড়ে পড়ে ডেকে উঠেছে বেচারা। হাঁটু অবধি পা ডুবে গেছে ; টেনে তুলতেই পারছে না!—এই ওঠ্ মনু এই তো—এই ওঠ—বহুকষ্টে মেনাজ টেনে দাঁড় করালো তাকে। মনু কী আমার বুড়ি নাহি যে কাদায় পড়লে খাড়াইতে পারবে না! গরুটার গলায় হাত দিয়ে আদর করে মেনাজ। মনু নিঃশব্দে একবার তার দিকে চোখ তুলে তাকায় তারপর মাথাটা ঘেঁষে আনে মেনাজের পাঁজরের দিকে।

—ওকী মেনাজ—এহোনো যে কাদাকোদা মাইখ্যা খাড়াইয়া রইছো—বাড়ি যাবানা ?

খালের ওপাড়ে বাড়ি ফেরার পথে মেনাজকে দেখে দাঁড়িয়ে পড়লো করমালী।

—হ যামু, এট্টু রয়েন দাদা, দেখছেন নি মনু কাদায় কেমন অইছে—এট্টু ধোয়াইয়া লই! মনুকে নিয়ে খালে নেমে পড়লো মেনাজ। ভালো করে রগড়ে ধুয়ে দিলো মনুর সারা গা। নধর দেহটি মনুর। তেলালো খয়েরী রঙ এমন আর কারো গায়ে নেই সারা নাচনমহলে। মনুকে নিয়ে সাঁতরে খাল পেরোলো মেনাজ। করমালী স্মিতমুখে তাদের দিকে তাকিয়েছিলো। বয়সের সম্ভ্রমে মেনাজ তাকে দাদা বলে ডাকে। শুধু মেনাজের নয়, হাসিখুসী গালগল্পে বা দুঃখের দিনে সকলেরি দরদি দাদা করমালী। দীর্ঘদিন পরে তার মুখে—কী দাদা, হাসেন দেহি ?

—দেহি বাপ ব্যাটার কাণ্ড! শাদা দাড়ি নেড়ে হো হো করে হেসে উঠলো করমালী।

—দূর, আপনার কেবল—লয়েন, লয়েন এহোন! তাড়া দিয়ে ওঠে মেনাজ। মনু আর তাকে নিয়ে কেবল দাদা নয়, সারা গ্রামের লোক পর্যন্ত এমনি রসিকতা করে, নানান কথা বলে। মেনাজের দুঃখ লাগে মাঝে মাঝে ওরা বোঝেনা মনু শুধু গরুই নয়—বাস্তবিক তার মানুষের মতো অনুভূতি আছে ; সব বোঝে ও—আদর করে ঘাস, বিচালি খেতে দিও দেখো কালো চোখ দুটি তুলে কী নিবিড় কৃতজ্ঞতাই না

তোমাকে জানাবে। চড় চাপড় দিয়ে দেখো বেদনায় পাঁজরের চামড়াটা কেমন থর থর করে কাঁপে, সমস্ত মুখে কেমন কালো ছায়া নামে,—দুঃখে আর ভয়ে তোমার দিকে কী ও আর তাকাবে ভেবেছো? সব বোঝে ও—কেবল বলবার ভাষা দেয়নি খোদা এই যা। অন্যমনস্কভাবে দাদার নানান কথার 'হুঁ' 'না' জবাব দিয়ে যাচ্ছিলো মেনাজ। মনে ভাবছে মন্নুর কথা—বাঁ কাঁধে লাংগলটা নিয়ে ডান হাতখানা রেখেছে মন্নুর ঘাড়ে।

আরেকটা খালের সাঁকো পেরিয়ে দুপথে চলে গেলো দুজন। মুখে ক্লক ক্লক শব্দ করে মন্নুকে উৎসাহ দিয়ে চলতে লাগলো মেনাজ। ঐ তো তার বাড়ি। মন্নুর জন্য তাজা ঘাস কাল 'খিল'* থেকে এনে কেটে রেখেছে সে। মরিচ-ক্ষেতের পাশ দিয়ে বাড়ির 'দরজায়' পড়ার মুখে, মন্নুকে থামিয়ে মেনাজ একবার চারিদিকটা দেখে নিলো কেউ আছে কিনা। তারপর মাথা থেকে গামছাটা খুলে অতি আস্তে মুছিয়ে দিলো মন্নুর সারাটা গা।

চৌচালা টিনের ঘরের পেছনে গোয়াল-ঘর। মন্নুকে দেখে ডেকে লাফালাফি শুরু করে দিলো বাছুরটা—ছেড়ে দিতেই দুধের বাটে এসে চুমুক লাগালো। মেনাজ মন্নুর গলার দড়িটা বাঁশের খুঁটির সংগে বেঁধে—ও পাশের স্তূপকরা কাঁচা ঘাসের মাঝ থেকে কয়েক খামচা ঘাস তুলে মাটির গামলাটার মধ্যে রাখলো;—তারপর এক কলসী পানি এনে গামলার মধ্যে ঢেলে দিলো—খা মন্নু!—গলায় কয়েকটা আদরের চাপড় দিয়ে বেরিয়ে গেলো সে।

বাংলার শস্য ভাণ্ডারের এই দক্ষিণ অঞ্চলের চাষীরা বোধ করি অন্যান্য জেলার চাষীদের থেকে একটু স্বতন্ত্র। এদের মতো কাদা পাণিতে ও জোঁকের কামড় খেয়ে এতো শস্যও বোধ হয় কেউ ফলায় না—তবু এদের ঘরে অভাব বর্তমান পুরোমাত্রায়। সর্বোপরি তো এরা সংগ্রাম করে বিরুদ্ধ প্রকৃতির সংগে—হয় প্রচণ্ড বন্যা ধানের খাড়া খাড়া সোনালী শিষগুলোকে মাটিতে মিলিয়ে দিয়ে যায় অথবা ক্ষেত থেকে যা ঘরে ওঠে মামলা-মোকদ্দমা, জমিদারের খাজনা প্রভৃতির শেষে হাতে জমা থাকে অতি অল্পই। কোনো মতে দিন চলে। তেরোশো পঞ্চাশের মন্বন্তর মহামারীতে সারা জেলায় হাহাকার জেগেছিলো। ধার-কর্জ-দেনায় মন্বন্তর থেকে যারা বাঁচলো—তাদের আবার অধিকাংশ নিশ্চিহ্ন হোলো মহামারীতে। ধরা যাক না ঐ করমালীর কথা—তালুকদার রহিম মিঞার কর্জে যদি বা তারা মন্বন্তর থেকে বাঁচলো; কিন্তু সমস্ত ঘরটা তার খাক হয়ে

---

* 'খিল'—অনাবাদি জমি।

গেল বসন্তে। যে করমালী একদা ছিলো গ্রামের বয়োবৃদ্ধ 'দাদা'—আনন্দের খনি—কেমন যেনো নিঃঝুম হয়ে পড়েছে সে এবার। বুড়োবয়সে লাংগল কাঁধে আবার সে ক্ষেতে নেমেছে।

মেনাজের বরাত ভালো। জমি দুকুড়ার ফসলে তার ছোট্ট পরিবারটি উৎরে গেছে; রোগেও কেউ পড়েনি। কিন্তু গতো বছর ভাদ্রে চাষের গরুটা মারা গেলো। নোতুন একটা কিনে এনে জুড়বে—কিন্তু আগুন হয়ে উঠলো দাম। গাই গরুটা ছিলো বলে রক্ষা পেলো। আশ্বিনের শেষের দিকে বেশ একটু টানাটানিই শুরু হোলো সংসারে—সে সময় দৈনিক দেড় সের দুধ দিয়ে তাদের বাঁচিয়েছিলো ঐ গাই গরুটাই। আদর করে মেনাজ যার নাম দিয়েছে মন্নু। তা না হলে বহুজনের মতো তাকেও শহরের পথে বেরিয়ে পড়তে হোতো দুমুঠো খাবার খুঁটে বাঁচতে!

এবারো একটা গরু কেনা তার সাধ্যে কুলোয়নি। একেতো গতোবারের মড়কে দিকবিদিকের গরু মারা গেছে; তার ওপর মিলিটারী কনট্রাকটর চড়া দামে গরু কেনে—দেড়শো-দুশোর কমে কোনো ভালো গরু কেনার কথা কল্পনাতেও আসে না। গাইটা দিয়েই কাজ চালাচ্ছে। আরেকটা ধার নেয় মাঝে মাঝে করমালীর কাছ থেকে। তারো সাড়ে সাতকুড়া জমি সে 'বদলা' দিয়ে চষে দিচ্ছে। তার তো পোষ্য একরকম নেই-ই বলতে গেলে—ছেলের বউ আর একটিমাত্র নাতি। ইদানীং মেনাজের প্রতি তার স্নেহ ও তার বাড়ীতে আনাগোনা দেখে গাঁয়ের লোকে নানান কথা বলতে শুরু করেছে। প্রথম প্রথম সে-সব কথা শুনে কাণ দিতোনা মেনাজ। কিন্তু করমালীর মৃত্যুর পর যে কী হবে সে কথা ভেবে তার মনে যে কোনো লোভ উঁকি দিতোনা তা নয়। ও গাঁয়ের দয়াল সেদিন হাটের মাঝেই তো তাকে এক খোঁচা দিয়ে বলেছিলো—কী আলাদার, করমালীর পুতের বউরে নিহা হরেন বোলে হুনি? মেনাজ তীব্রভাবে উড়িয়ে দিয়েছে কথাটা; চিন্তিতভাবে ফিরে এসেছে বাড়ি; বউ বাবেয়ার কাণে এসব কথা উঠলে কেলেংকারীর সীমা রইতোনা আর। প্রয়োজন নেই তার করমালীর সম্পত্তি বা গরুতে; বেশ আছে সে তার ছোট সংসারটি নিয়ে—থাকলোই বা এখন অভাব, মন্নুকে দিয়ে সে বরাত ফিরিয়ে নেবে তার, যাকনা কিছুটা দিন!

আষাঢ়ের শেষ দিকে গো-মড়ক লেগেছে শুনে সারা গ্রামের চাষীরা সন্ত্রস্ত হয়ে উঠলো। প্রকাণ্ড বাহাদুরপুর মৌজা নাকি টপাটপ খাক হয়ে যাচ্ছে একেবারে।

ভয়ে আতংকে সবাই নিথর হয়ে পড়লো। গতোবার তবু মড়কের সময় ইউনিয়ন বোর্ডের প্রেসিডেণ্ট শহর থেকে পশু-ডাক্তার আনিয়ে টিকা দেওয়ার বন্দোবস্ত করেছিলো; এবার তার কোনো উদ্যোগ যেনো নেই। প্রেসিডেণ্ট বললেন—ডাক্তার আসছে। কিন্তু দেখতে দেখতে মেনাজদের গ্রামের কয়েকটা বাড়ির গরু মারা পড়লো। করমালীরও একটা গরুর অসুখ হোলো—তখন পর্যন্ত সরকারী ডাক্তারের কোনো সাহায্য এসে পৌঁছালো না।

তিনটা গরু করমালীর গোয়ালে। প্রথমটার তিনদিনের মধ্যে আরো একটা আক্রান্ত হোলো। দুর্ভাগ্যের দুশ্চিন্তায় প্রাণ নেই যেনো আর করমালীর। চাষ বন্ধ। গোয়াল ঘরের খুঁটিতে ঠেস দিয়ে নিঝুম হয়ে সে বসে থাকে। মেনাজকে দেখে একটা দীর্ঘশ্বাস টানলো বুকভরে; কী যেনো তার বাকী ছিলো, এইবার তা পূর্ণ হয়েছে।

মেনাজ তাকালো গরুদুটোর দিকে। দুটি গরুর চামড়ার নিচে গুটি গুটি মাংসের গোলক উঁচু হয়ে উঠেছে। একটা ওদিকে হাত-পা ছুঁড়ে গড়াগড়ি খাচ্ছে মাটিতে। একবার থরথর করে পা ক'টা কেঁপে টান্ হয়ে যায় আবার সমস্ত দেহটাসুদ্ধ ছটফটিয়ে এদিক ওদিক গড়াগড়ি খায়। চোখের কোণ বেয়ে ঝরছে পাণি, মুখে ফেনা, লালার স্রোত। মাছি। হরদম পাতলা বাহ্যে করছে। অন্যটা অবিচলভাবে বাঁধা রয়েছে আর একটা খুঁটিতে। মাথাটা ঝুঁকে পড়েছে—অর্ধ-নিমীলিত চোখে সে কিছু দেখছে কী দেখছে না বোঝা যায় না! চোখের কোণ বেয়ে পাণি ঝরছে—মুখের কষে লালার স্রোত, ফেণা। গঙিয়ে কাতর আর্তনাদ করে উঠলো অন্য গরুটা—হাম্বোয়াঁ-য়াঁ—চারটে পা সিধে করে ছড়িয়ে দিলো চার পাশে, মুখের মোটা ঠোঁটদুটো খিঁচড়ে বিকৃত হয়ে গেলো—চোখদুটো উল্টে গেলো উপরদিকে। আবার আর্তনাদ করে উঠলো তেমনি হাত পা ছুঁড়ে—এবার আওয়াজ ক্ষীণ। অন্য গরুটা আর্তনাদে চোখ ফিরিয়ে তাকালো একবার তার দিকে—সে ঘোলাটে চোখ এতো অসহায় আর বর্ণহীন যে তার কোনো ভাষা নেই—মাথা ফিরিয়ে এনে ঝুঁকিয়ে আবার সে ঝিমুতে লাগলো। পাতলা বিবর্ণ গোবরে সমস্ত গোয়ালটা ছেয়ে গেছে। আর্তনাদ-পরায়ণ গরুটা আরেক-বার মলত্যাগের সংগে সংগে পা ছুঁড়লো—তারপর যেনো ধীরে ধীরে বাতি নেভার মতো ঝিমিয়ে নিঃশেষ হয়ে গেলো। মেনাজ কোনো কথা আনতে পারেনি মুখে, চোখ ফিরিয়ে তাকালো করমালীর দিকে। শাদা দাঁড়ি-গোঁফ চুলের মাঝখানে করমালীর দুটি ক্ষীণ নিষ্প্রভ চোখের কোণ বেয়ে টপটপ করে পাণি ঝরছে—নাকের ডগাটা ফুলে

ফুলে উঠছে, গোঁফ দাড়ির অন্তরালের ঠোঁটদুটি হয়তো বা কাঁপছে। নির্ণিমেষে সে দেখছে গরুটার মৃত্যু।

কী সান্ত্বনা দেবে মেনাজ? সে স্তব্ধ, বিমূঢ়। চারিদিকের দুনিয়া থেকে হঠাৎ যেনো বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে সে। বাহাদুরপুর উজাড় হয়ে গেছে, সুবিদপুরে হাহাকার—তাদের শুরু;—করমালীরটা মরেছে ওইটা মরবে, ধীরে ধীরে হয়তো সারাগ্রামে ছড়িয়ে পড়বে সর্বনাশা চিকিৎসাহীন রোগ! সহসা কাঁটা দিয়ে উঠলো মেনাজের সমস্ত দেহে। করমালীকে কিছু না বলেই নিজের বাড়ির পথ ধরলো।

করমালী তখন গামছায় মুখ ঢেকে আকুল হয়ে কাঁদছে। পুত্রবধূ আর তিন বছরের নাতিটা এসে দাঁড়ালো সামনে।

ওই গরুডা ওরমে ক্যা মরইয়া গেছে, মা?

তার মা জবাব দেবে কী, এ মৃত্যু যে অসম্ভব, অস্বাভাবিক নিদারুণ!

শুয়ে শুয়ে জাবর কাটছে মনু। বাছুরটা নিয়ে বাপের মতো আদর করে খেলা করছে মেনাজের পাঁচ বছরের ছেলে রহমান। মেনাজকে দেখে ছুটে এলো রহমান—দেহো দেহো বাজান ও আমার গা চাটইয়া দেতে চায়! বাছুরটাও যেনো মজা করে তার গা শুঁকছে। হাসি ফুটলো মেনাজের মুখে, মনুর কাছে হাঁটু গেড়ে বসে ছেলেমানুষের মতো বলতে লাগলো সে—পেট ভরইয়া খাইছো মনু?…কাইল আরো তাজা ঘাস কাটইয়া আনমুহানে।…গ্রামে ব্যারাম শুরু অইছে হোনছো? সাবধানে থাকতে অইবে তোমার; ডাক্তার আইবেহানে শহরে গোনে। টিকা লইতে ভয় পাবানাতো আবার, কিছু ব্যথা লাগেনা হেতে, বোজজো?—মনুর শিঙের সংগে গাল ঠেসে বলে যাচ্ছিলো মেনাজ। রহমান বাবার কাঁধের কাছে ঘেঁষে প্রশ্ন করলো—টিকা কী বাজান?

—কমুহানে, হেয়ার আগে তোর মায়রে তামাক দেতে ক যাইয়া। মনুর পায়ে কাদা লেগেছিলো কয়েক জায়গায়—তাই তুলে ফেলতে ফেলতে বললে মেনাজ।

—এ যা দেখছোনি কতোখানি খাইছে?

—কী বাজান?

—জোক।

খুরের মাঝে লম্বালম্বি চুমুক লাগিয়ে রয়েছে একটা ছিনে জোঁক। রক্ত খেয়ে ফুলে উঠেছে। হাত দিয়ে সেটা ছাড়িয়ে এনে কাছের পুকুরটার মাঝে ছুঁড়ে ফেলে দিলো মেনাজ।

—ইসস্! হাবামজাদা শত্তুরডায় অনেকখানি রক্ত খাইয়া হালাইছে তোমাব, না মনু ?—মাথাব ওপব হাত বুলোতে বুলোতে আবাব বিড়বিড কবে সে কথা বলতে লাগলো। মনু নীরবে তাব হাঁটুর সংগে মুখ ঘষতে লাগলো; মাঝে মাঝে মাছি তাড়াচ্ছিলো সে কাণ নেড়ে।

—হাবাদিন মনু মনুই হরবা আইজ, নাওয়া-খাওয়া লাগবে না ?

হুঁকোহাতে এসে, কৃত্রিমকণ্ঠে মেনাজকে ভৎর্সনা কবে উঠলো বাবেয়া।—কী যে বাতিক তোমাব!—

গরুব গলাটা ছেড়ে লজ্জিতভাবে উঠে দাঁড়ালো মেনাজ, হুঁকোটা হাতে নিয়ে গোটা দুই টান দিয়ে বললে—বাতিক! মনু যে আমাগো কী ধন হেয়া বোজো' বউ ?

তার ঠাণ্ডা স্বরে আর পরিহাস করাব সাহস হোলোনা রাবেয়াব। একটু পরে বললে—দাদার গরু দুইটা কেমন অইছে ?

মেনাজের হুঁকো টানা বন্ধ হয়ে গেলো,—আবাব তার চোখে সেই ভীতি ফুটে উঠলো। একবাব গরুটার দিকে তাকিয়ে বাবেয়াকে প্রায় ঠেলেই বাইরে নিয়ে এলো সে—আস্তে, এসব কথা ওবে হোনাইয়া কইওনা কিছু।

—বাঃ ক্যা ?

—ক্যা! ক্যা কী! কইয়া থুইলাম, আর কহোনো এসব কথা ওর হোম্মে কবানা!—চাপাস্বরে তর্জন কবে উঠলো মেনাজ।

—দাদার গরু—

—একটা মবছে। জিগাও কী আবার, বোজোনা কী অইতে পারে ? এ বোগে কি বাচছে কোনোহানে, হোন্‌ছো ?

খানিকক্ষণ চুপ করে থেকে সমবেদনাব কণ্ঠে বলে উঠলো বাবেয়া—

—আহা! যে দিন! আব যে কেনবে—

—হুঁ, কেনবে, টাকা পাইবে কোম্মে ? বহিম মিঞার টাকাই তো দেওয়া অয় নায় এহোন তাইক—

—ক্যা, এলহা মানু, হেব এহোন টাকাব অভাব কীতে!

হুঁকোটা নামিয়ে ঠোঁট কুচকে আনলো মেনাজ—দেনা দেতে দেতে আতে কাণা-কড়িডাও নাই!

—ইসস্। কেমন হবরে এহোন !—করমালীব প্রতি সহানুভূতিতে রাবেয়াব মন ভাবাক্রান্ত হয়ে উঠলো। অনেকক্ষণ চুপ করে রইলো দুজনেই।

—কাঁদতে লাগছে দেইখ্যা আইলাম।·· ক্ষেত চওয়া বাই। কী যে কববে দাদায়—এবাব ভুঁই খিল পড়বেই। জানো বউ একিব যেবহম গরু মবতে লাগছে, হেতে কান্দাকাটির আর শ্যায থাকবে না।

মন্নুর দিকে তাকিয়ে কী যেনো ভাবতে থাকে রাবেয়া।

—যাউক। তুমি একটা মুবগী জবো দিয়া দুউগ্যা ভাত র‍্যান্ধো দেহি বিকালে। মৌলুদশরীপ পড়ামু এট্টু। যা দিনকাল—

দীর্ঘ নিশ্বাস ছেড়ে রাবেয়াব হাতে হুঁকোটা তুলে দিয়ে স্নানের জন্য যায় মেনাজ।

ইয়া নবী খালাম আলাইকা—

কয়েকজন বন্ধু-মরুব্বি নিয়ে মৌলবীর সংগে মিলাদ পড়ছে মেনাজ। কণ্ঠে পরিপূর্ণ জোর আব অসীম ভরসা নিয়ে সে আবৃত্তি কবছে প্রত্যেকটি পদ। যেনো এই অনুষ্ঠানেব ওপরেই নির্ভর কবছে মন্নুব সমস্ত শুভাশুভ। সতর্ক হয়ে আছে সে—পাছে তাব অন্তরের এই গোপন কামনা জেনে কেউ পরিহাস না করে।

পাশে দাঁড়িয়ে ক্ষীণকণ্ঠে আবৃত্তি করছে করমালী। পিঠটা তার নুয়ে ভেংগে পড়েছে ঝাপটাখাওয়া গাছেব মতো। মোনাজাতেব সময় কেঁদে ফেললো সে। মেনাজ তখন ব্যাকুল অন্তবে খোদাব কাছে প্রার্থনা জানাচ্ছে—মন্নুকে তুমি আপদ-বিপদ থেইক্যা ভালো রাখইও। মন্নু আমাব সুস্থ থাকুক।

পর পর এই কয়েকটা দিনে গ্রামের এতোগুলো গরু মারা গেলো যে বহুজনেবি গোয়াল শূন্য হয়ে গেলো। 'ভিটা'র মাঠে, খালের পাশে পাশে ভিড় কবলো মৃতদেহ-লোলুপ শকুন-কুকুর পথে পথে দেখা যেতে লাগলো, গ্রাম্য-গরু-চিকিৎসক 'গোয়ালে'র আনাগোনা। অথচ এ রোগের আব চিকিৎসা নেই। প্রথম গরুগুলো নিঃঝুম হয়ে মাথা ঝুঁকিয়ে বসে থাকে—খায়না কিছু। সারা গায়ে গুটি জাগে—শেষে একদিন ছটফট করে নিথর হয়ে যায়।' গোয়ালেব বড়ো বড়ো কালো বড়িগুলোতে কোনো কাজই

হয়না। তখনো আসেনি সরকারী ডাক্তার! অবশেষে ডাক্তার নিযে আসতে প্রেসিডেণ্ট নিজেই গেলেন শহরে।

এদিকে করমালীর গোয়াল একেবারে শূন্য হযে গেছে। সমস্ত দিন নীরবে সে দাওয়ার ওপর শুয়ে থাকে। মিথ্যা সান্ত্বনা দিতে আসেনা কেউ। মেনাজ মাঝে মাঝে এসে বসে—নানা মতলব করে কিন্তু করমালীর কোনো সাড়া পায়না। কয়েকদিন ধরে চাষ বন্ধ। মনুকে নিযে ক্ষেতে যাবার সাহস পায়না মেনাজ। করমালীর দাওয়ায় বসে কেবল নানান কথা ভাবে আর ভাবে। 'গোয়ালে'র কাছে পরামর্শ নিয়ে মনুকে সাবধানে রাখতে কসুর করেনি সে। তবু নানা আশংকায় মনে যেনো স্বস্তি নেই কিছুই। সেদিন বাড়ি ফিরে দেখে গোয়াল শূন্য মনু নেই! খোঁজ খোঁজ কে খুলে দিলো, কোন শত্তুরের কাজ?—মেনাজ পাগলের মতো হোলো। খুঁজতে খুঁজতে মনুকে পাওয়া গেলো বাড়ির পেছন দিককার 'ভিটা'য়। ভিটায় পানি উঠেছে; তার মধ্যে সামনের দুই পা নামিয়ে পরমানন্দে সে সবুজ ধানের বীজ খাচ্ছে। ক্ষেত মল্লিকদের—ভাগ্যিস তারা কেউ দেখেনি, নইলে হয়তো তখুনি একটা বিবাদ বেধে উঠতো!—শাপ দেবে যে পোড়াকপালী, ঘরে এতো ঘাস তুমাড় করা থাকতে বীজধান খাইতে আইলি ক্যা?—রাগে দুঃখে, আশংকায় দাঁত কিড়মিড় করে মনুর পিঠে কয়েকটা চাপড় লাগালো মেনাজ। মনুর আহত স্থানটা কুঁচকে থরথর করে কেঁপে উঠলো—চোয়াল নাড়া বন্ধ করে সে মুখ ফিরিয়ে তাকালো মেনাজের দিকে।

তার সে চাহনি দেখে মেনাজের রাগ উবে গেলো,—মুখে গাম্ভীর্য টেনে তাড়াতাড়ি সে বললে—চল্ চল শীগ্‌গীর।

গোয়ালে বেঁধে চাপড় দেওয়া জায়গাটাতে হাত বুলোতে লাগলো মেনাজ।—খুব ব্যথা পাইছো মনু আয়? য়া, তুই ওহানে গেলি ক্যা, ক? খুলইয়া দেলে কেডা তোরে?

মনুকে পাওয়া গেছে দেখে হাততালি দিতে দিতে ছুটে এসেছিলো রহমান, বললে—তুমি গেছো পর, কেবল হাম্বা হাম্বা করে হেইর পানহে আমি খুলইয়া দিছি!

—হুঁ। আর কোনোদিন খুলইয়া দেলে মারইয়া হালামু তোরে।—ধমকে উঠলো মেনাজ।

ওপাশের খুঁটি থেকে বাছুরটার বাঁধন খুলে দিতেই সে ছুটে এসে মায়ের স্তন মুখে পুরে দিলো।

গাঁয়ে তথন মাত্র কয়েকটা গরু বেঁচে আছে, আঙুলে গোণা যায়। এর মাঝে রাবেয়ার বাপের বাড়ি পাশের গ্রাম থেকে খবর এলো, মেনাজের শ্বশুরের এখন-তখন অবস্থা—তাদের না গেলেই নয়। রাবেয়া তো ক্রন্দনের তুফান তুললো—অগত্যা মনুকে ফেলে যাওয়া স্থির করা ছাড়া গত্যন্তর রইলো না মেনাজের। বাধ্য আর বিরক্ত হয়ে করমালীর বাড়ি গেলো।

—কী ম্যাভাই। প্রাণহীন ভাবে হেসে অভ্যর্থনা করলো করমালী; এই কদিনের দুর্ভাগ্যে চেহারায় আর এতোটুকু শ্রীও অবশিষ্ট নেই তার। ঘোলাটে চোখ দুটো আরো ভেতরে ঢুকে গেছে। কপালে দুশ্চিন্তার অনেকগুলো রেখা। কী যে দুর্ভাগ্য লোকটির। তিন স্ত্রীর একজনো আজ জীবিত নেই। পাঁচ ছেলে দুই মেয়েতে জমজম করতো একদিন বাড়ি—তারা-ও গেছে। প্রকাণ্ড বাড়িটা খাঁ খাঁ করে।—অন্যমনস্কতা দূর করে শ্বশুরের অসুখের কথা বিবৃত করে মেনাজ;—আমি গেলে, গরু দুইডার দিকে এট্টু নজর রাখতে পারবেন দাদা ?

একটু পরে ঘাড় হেলিয়ে সম্মতি দিলো করমালী,—ফেরবা কবে ?

—আইজ হাঁঝের কালে রওনা অইলেও পরশু ব্যানের আগে আওয়া যাইবে না।

—তোমার বাড়ির উপরেই তো আসগর আছে, হেরে দেহাশোনা করতে কইয়া গেলেই তো ভালো অয়।

আছে সত্যি। কিন্তু তাদের ওপর ভরসা নেই মেনাজের। বিশেষত তুলনায় সে একটু সচ্ছল আছে বলে আসগর তাকে ঈর্ষা করে। ঘাস খেলো কী খেলোনা, স্নান করা হোলো কী হোলোনা—এতো কি লক্ষ্য রাখবে সে ?

—না দাদা, মনু গোয়ালেই বান্ধা থাকপে হানে—তুমি একটু ঘাস পাণি ডা দিও।

শ্বশুর বাড়ী রওনা হয়ে গেলো মেনাজ।

শ্বশুর মারা গেলো। তাকে খবর দেওয়া মাত্রই নৌকা নিয়ে ছুটে এলো সে। মনুর জন্য মন ভারী হয়ে উঠেছে তার। গোয়ালে পা দিয়েই সে থমকে দাঁড়িয়ে পড়লো। কী চেহারা হয়েছে মনুর এই দুদিনেই। অনেক যেনো শুকিয়ে গেছে সে, মুখের কাছে নেই একটি ছড়া সবুজ ঘাস। নিথর ভাবে নিচে তাকিয়ে ধুঁকছে সে—বাছুরটা নির্জীব ভাবে শুয়ে রয়েছে ওদিকে খুঁটির গোড়ায়। মেনাজকে ফিরে দেখলোও না মনু। দাদা এই যত্ন নিয়েছে তার ? সামনে ঘাসের গামলাটা একেবারে খালি। একদিনও বোধ

হয় স্নান হয়নি। হলে কী তার এই চেহারা হয়?—করমালীর উপর আক্রোশে নাক ফুলে উঠলো মেনাজের।

—মেনাজ আইছো নাকি? কেমন আছে তোমার শ্বশুর!

পুকুরঘাটের পথে যেতে তাকে দেখে প্রশ্ন করলো আসগর।

—তোমরা—তুমিও আমার গরুডার দিকে এট্টু খেয়াল রাখলা না?

—ক্যা, কাইল দেহি দাদায় ঘাস-টাস দিয়া গেল দেকলাম। আইজ দে নায়?

জবাব দেবার ভাষা খুঁজে পেল না মেনাজ। পরের জিনিস মানুষ এতো হেনস্থাও করে! একটা দীর্ঘশ্বাস ফেলে হাতিনার চালে গোঁজা কাস্তেটা নিয়ে ঘাস কাটতে বেরিয়ে গেল সে।

কিন্তু সে ঘাস স্পর্শও করলো না মনু। মুখ ফিরিয়ে নিলো। কতো সাধাসাধি করলো মেনাজ—আলাইয়া গেছি বলইয়া আমার উপরে রাগ অইছো মনু? আর যামুনা, আর কখনো যামুনা—তুই খা মনু খা—

অবিচলভাবে নিচের দিকে মুখ ঝুঁকিয়ে রইলো মনু। হাম্বা হাম্বা ডাকতে লাগলো বাছুরটা। মনুর চোখের কোণে ঝর ঝর করে ঝরছে পাণি। তার ঠোটের দিকে নজর পড়তেই আশংকায় দম বন্ধ হয়ে গেলো মেনাজের। পাতলা লালার ধারা। আবো লক্ষ্য করলো—সমস্ত গোয়াল, মনুর বসার স্থানটা পাতলা গোবরে আকীর্ণ।

কাঁপতে কাঁপতে উঠে দাঁড়ালো মেনাজ। দিকবিদিক জ্ঞানহারা হয়ে ছুটলো 'গোয়াল'-এর বাড়ি।

আসগরের মুখে মেনাজের ফিরে আসার খবর পেলো করমালী; অমনি তার মনে পড়লো সেদিন মনুকে ঘাস-পাণি তো দিয়ে আসা হয়নি! লজ্জার সীমা রইলো না আর —কী বলবে মেনাজ! দেহে অসুখ। গরুগুলো মরার পর থেকে জীবনীশক্তি যেটুকু ছিলো তাও যেন নিঃশেষ হয়ে এসেছে। যতোটা তাড়াতাড়ি সম্ভব, মেনাজের বাড়ির দিকে সে পা বাড়ালো।

ওদিকে 'গোয়াল' কোনো ভরসা দিলোনা। মনুর ব্যারাম যে হয়েছেই, এতে আর বিন্দুমাত্রও সন্দেহ নেই তার। কী করবে যেয়ে; তার চাইতে এই বড়িটা নিয়ে যাক সে, যদি রাখবার হয় তো ওতেই, নইলে কোন আশা নেই! ফ্যাল ফ্যালিয়ে কথাগুলো শুনে টলতে টলতে বাড়ির পথ ধরলো মেনাজ। তার জীবনের সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম, প্রকৃতির বিরুদ্ধে সংগ্রাম করবার সব চাইতে ভারী মূলধন আজ ফুরিয়ে যাচ্ছে। আধচষা অবস্থায় তার ক্ষেতখানা বুক ছড়িয়ে আছে। পাকা ফসলে একী আর ভরে

উঠবে কোনোদিন ? আজ মনু মরে গেলে—কোথায় পাবে সে নোতুন গরু কেনার টাকা ?

দূর থেকে মনুর কাতর আর্তনাদ কানে গেলো। এমনি সে ডেকে উঠেছিলো সেদিন কাদায় পড়ে, ও আর্তনাদ নয়—মেনাজকে ডাকা ! দু'হাতে বুক চেপে গোয়ালের কাছে এসে দাঁড়ালো মেনাজ। কলাপাতা ঝুলিয়ে বেড়া-দেওয়া গোয়ালের বাইরে মনুর দুটো ঠ্যাং বেরিয়ে রয়েছে।

করমালী তখন দুর্বল হাতে ওধারের মাচা থেকে কয়েকটি আঁটি বিচালি এনে মনুকে খেতে দিয়েছে। মুখ ফিরিয়ে চেঁচিয়ে উঠছে মনু।

দাদাকে দেখেই মেনাজের দুই চোখে যেনো আগুন ধরে গেলো ; চিৎকার করে উঠলো সে, তুমি তুমি—

ছুটে ঘরের ভিতরে গিয়ে একতাল ভাঙামাটি কুড়িয়ে নিলো সে—তুমি শয়তান, অপয়া —তোমার হাতে মনুরে দিয়া যাওনেই আমার এই সর্বনাশ আইলে !

হতভম্ব লজ্জিত করমালী তার দুই সারল্য-ভরা চোখ তুলে কিছু বুঝে উঠবার আগেই মেনাজের ছোঁড়া মাটির তালটা তার মাথায় লাগলো—'আঃ' বলে আর্তনাদ করে মাথায় হাত দিয়ে বসে পড়লো সে। আঘাত খাওয়া সেতারের তারের মতোই কেঁপে উঠলো তার সমস্ত দেহটা। ঘোলাটে, বোগা চোখে সে একবার তাকালো মেনাজের দিকে, কী এক আবেগে তার নাক ঠোঁট ফুলে ফুলে উঠলো। তারপর কাঁপতে কাঁপতে সিধে গোয়াল ছেড়ে বেরিয়ে গেলো ধীরে।

—হাম্বা-আ—

মাথা হেলিয়ে শুয়ে পাগুলো আছড়াতে আছড়াতে আর একবার চেঁচিয়ে উঠলো মনু। তখন সে তাকিয়ে রয়েছে মেনাজের দিকে—চোখে পাণির ধারা। নাক ফুলছে কাঁপছে—ঘন ঘন শ্বাস বইছে। ঠোঁট দিয়ে গড়াচ্ছে লালা—বেদনায় বিকৃত হয়ে উঠছে মাঝে মাঝে। হয়তো সে তার কষ্ট থেকে উদ্ধার করবার জন্য ডাকছে মেনাজকে —কী ত্রান দেবে ওকে মেনাজ ? ফ্যালফ্যাল করে মনুর দিকে সে তাকিয়ে রইলো শুধু।

আবুলকালাম শামসুদ্দীন

পুস্তক-পরিচয়

তমসার শেষে—আলেকসাই টলষ্টয়; পূরবী পাবলিশার্স, কলিকাতা; আড়াই টাকা।

রামধনু—ভান্দা ভাসিলিয়েভ্‌স্কা; ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড; তিন টাকা।

সোভিয়েটের গল্প-সংগ্রহ—সম্পাদক, সুধী প্রধান, ন্যাশনাল বুক এজেন্সী লিমিটেড; একটাকা।

সোভিয়েটের কয়েকটি যুদ্ধ-গল্প—প্রতিরোধ পাবলিশার্স, ঢাকা; ছয় আনা।

সমালোচ্য গ্রন্থগুলির সব কখানি-ই মৌলিক রচনা নহে, অনুবাদ। তবুও ইহাদের গুরুত্ব উপেক্ষা করা যায় না। অনুবাদ প্রগতিশীল সাহিত্য মাত্রের অপরিহার্য্য অঙ্গ, কারণ কোনো দেশেরই সাহিত্য আজ স্বয়ং-সম্পূর্ণতার দাবী করিতে পারে না। অনুবাদের সহায়তাতে এক ভাষায় রচিত সাহিত্য অন্যভাষার সাহিত্যকে প্রভাবিত করে। ইহাও অবশ্য সত্য যে, বর্ত্তমান যুগে সাহিত্য-রচয়িতার পক্ষে শুধু স্বভাষানিষ্ঠ হইলে চলে না, তাহাকে নানা বিদেশী ভাষায় কুশলী হইতে হয়। বলিতে গেলে, ব্রিটিশ যুগের সমগ্র বাংলা সাহিত্য ইংরাজী সাহিত্যের অনুপ্রেরণায় বর্দ্ধিত। অথচ, সেই অনুপাতে, ইংরাজী শ্রেষ্ঠ সাহিত্য গ্রন্থের প্রকৃত সাহিত্যিক অনুবাদ হয় নাই। হইলেও তাহা উপেক্ষিত হইয়াছে। কোনো বাংলা সাহিত্যিক কি 'ম্যাকবেথ' বা 'কেনিলওয়ার্থ' বাংলা অনুবাদে পড়িয়া অনুপ্রাণিত হইয়াছেন? আমাদের দেশের শিক্ষা ব্যবস্থার গুণে বাঙালী সাহিত্যিক লেখেন বাংলা কিন্তু পড়েন ইংরাজী; ফলে তাঁহাদের বাংলা রচনা ভাবে ও ভাষায় ইংরাজী রচনার গন্ধে আমোদিত হইয়া থাকে। ইহাতে এতদিন ধরিয়া আমাদের দেশের পক্ষে ক্ষতির চেয়ে লাভই হইয়াছে বেশী। ইংরাজী সাহিত্যের ঋদ্ধিমান সংস্পর্শে আসিয়া বাংলা ভাষার প্রকাশ ক্ষমতা কি অভাবিত বেগে বাড়িয়া গিয়াছে তাহা আজ কাহারো অজানা নাই। যে ইংরাজী সাহিত্য, ফরাসী ও জারমান সাহিত্যের প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বিতা সত্ত্বেও, ষোল হইতে উনিশ শতকের মাঝামাঝি পর্য্যন্ত, সমস্ত বিশ্বের উপর বিরাট আধিপত্য করিয়াছে, তাহার সহিত সাক্ষাৎভাবে পরিচয়, পুরুষানুক্রমে তাহার একনিষ্ঠ সাধনা বাঙলার সামাজিক জীবনের রূপান্তরের সহায়ক হইয়াছে—আমাদের কল্পনা শক্তিকে উদ্‌বুদ্ধ করিয়া, দৃষ্টিশক্তিকে প্রসারিত করিয়া, চিন্তাশক্তিকে জাগ্রত করিয়া, কর্ম্মশক্তিকে বেগবান করিয়া।

কিন্তু যাহা এককালে আনিয়াছিল মুক্তির উন্মাদনা, তাহাই এখন হইয়া উঠিয়াছে অবসাদের গুরুভার। ইউরোপে ফিউডালতন্ত্রের সর্ব্বপ্রথম সংগঠিত প্রতিবাদ হিসাবে, বিবর্দ্ধমান ধনতন্ত্রের পূর্ণাঙ্গ বাহক হিসাবে, ইংরাজী সাহিত্যের প্রভাব দেশে দেশে নবতর সাহিত্য-সৃজনের ঐতিহাসিক কারণ হইয়া উঠিয়াছিল। এখন ইংলণ্ডের ধনতন্ত্র সাম্রাজ্য-বাদের শেষ পর্য্যায়ে আসিয়া ক্ষয়িষ্ণু, মুমূর্ষু; তাহার সাহিত্যেও তাই মানবমুক্তির উদাত্ত স্তোত্র আজ স্তম্ভিত। শোষণ-মুক্ত মানবসমাজের ভিত্তিপত্তন করিয়া যে দেশ সভ্যতার অভিযানে অন্য সকল দেশকে একটি সমগ্র যুগ পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গিয়াছে তাহারই সাহিত্যে আজ মন্দ্রিত হইতেছে সেই মহাগীতি। সোভিয়েট সাহিত্যের সহিত পরিচয় তাই এখন প্রত্যেক মুক্তিকামী বাঙালী সাহিত্যানুরাগীর অবশ্য কর্ত্তব্য।

'তমসার শেষে' আলেক্‌সাই টল্‌স্টয় প্রণীত বিশাল ত্রি-পর্ব্ব উপন্যাসের প্রথম খণ্ডের অনুবাদ। তিন পর্ব্বের নাম, যথাক্রমে "দুই বোন", "১৯১৮" ও "বিষণ্ণ প্রভাত"। ইহা সম্পূর্ণ করিতে টল্‌স্টয়ের তেইশ বছর লাগিয়াছে। রুশ বিপ্লবের ফলে রুশিয়াতে যে অভূতপূর্ব্ব সামাজিক আলোড়ন ও আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছে তাহারই যথাযথ চিত্র মহাকাব্যের আকারে অঙ্কিত করাই এই উপন্যাসাবলীর উদ্দেশ্য। লব্ধপ্রতিষ্ঠ সোভিয়েট সমালোচকের মতে, এই ত্রি-পর্ব্বে বিশেষতঃ ইহার শেষ ভাগে দেশব্যাপী জীবন-সংগ্রামের সমস্ত অংশ প্রতিফলিত হইয়াছে—সুদূর কোন গ্রামের একটি শিশুর জীবন হইতে লেনিন ও স্টালিন পর্য্যন্ত। মনে হয় যেন আখ্যায়িকা-কার সর্ব্বদা আশঙ্কিত হইয়া আছেন, পাছে কোনো খুঁটিনাটি বাদ পড়ে, পাছে কোনো তথ্যের প্রকৃত ব্যাখ্যা না হয়। ইহার সমস্ত উপাদান বাস্তব অভিজ্ঞতা হইতে গৃহীত; অথচ গল্পের স্রোত কোথাও ব্যাহত হয় নাই, খণ্ডের গুরুত্ব পূর্ণতার সুষমাকে বিকৃত করে নাই। আলেক্‌সাই টল্‌স্টয়ের রচনা শুরু হয় বিপ্লবের পূর্ব্ব হইতেই। পাঠকেরা তখন তাঁহার নাম লইয়া কেবল পরিহাসই করিত; টল্‌স্টয় নামধারী লেখক কেবল একজনই হইতে পারে, ইহাই ছিল ব্যঙ্গের হুল। আলেক্‌সাই টল্‌স্টয় বিপ্লবকে সহজে গ্রহণ করিতে পারেন নাই, তাহার সমগ্র তাৎপর্য্যকে উপলব্ধি করিতে তাঁহার কয়েক বৎসর লাগিয়াছিল। সেই আলেক্‌সাই টল্‌স্টয় আজ রুশ-বিপ্লবের সামাজিক বিবর্ত্তনের সবচেয়ে শক্তিমান কথক। তাই তিনি অর্জ্জন করিতে পারিয়াছেন ১৯৪৩ সালের স্টালিন পুরস্কার।

'তমসার শেষে' প্রধানত দুটি বোনের কাহিনী। মূল গ্রন্থকার এই পর্ব্বের নামই রাখিয়াছেন, "দুই বোন"। ইংরাজী অনুবাদকের অনুসরণে বাংলা অনুবাদক এই পরিবর্ত্তনটি ঘটাইয়াছেন, যাহার কোন প্রয়োজন ছিল বলিয়া মনে হয় না। "দুই বোন"-এর বিষয়বস্তু একটি ছোট শিক্ষিত পরিবারের নিয়তি; ইহার পশ্চাৎ-পটে আছে সেণ্ট পিটারস্‌বুর্গ ও ক্রাইমিয়ার বাক-সর্ব্বস্ব বুদ্ধিজীবীদের সামাজিক জীবন। তাহার উপর প্রথম বিশ্বযুদ্ধের প্রতিঘাত, ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে জারের পতন ও বিপ্লবের প্রথম সূচনা, ও পরে অক্টোবর মাসে (পুরাতন পঞ্জিকা অনুযায়ী) সাম্যবাদী বিপ্লবের সফল আবির্ভাব। এইখানে প্রথম পর্ব্বের সমাপ্তি।

ভান্দা ভাসিলিয়েভ্‌স্কা-র "রামধনু" পড়িতে গিয়া আমরা উপনীত হই সোভিয়েট জীবনের প্রায় আধুনিকতম স্তরে, যাহাতে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নির্ম্মম পেষণে, নাৎসিবাদের বিশ্বাস-ঘাতক ও বর্ব্বর আচরণে, সুবিস্তীর্ণ সোভিয়েট রাষ্ট্রের নরনারী ও শিশু একান্ত হইয়া স্বদেশ স্বজাতি ও স্বকীয় সংস্কৃতি রক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পৃথিবীর সকল দেশের নিপীড়িত জনগণের শৃঙ্খল মোচনের পথ প্রশস্ত করিয়া দিতেছে। লেখিকা জাতিতে পোলীশ, জার্ম্মান-অধিকৃত যুক্রেনের ছোট একটি গ্রামের প্রতিরোধকে কেন্দ্র করিয়া রচিত এই কাহিনী ১৯৪৩-এর স্টালিন পুরস্কার লাভ করে। উপন্যাসখানির পরিসর স্বল্প, যাহাকে বলা যায় রচনা-চাতুর্য্য, তাহার কোনো চেষ্টা ইহাতে নাই, কোনো জটিল সামাজিক বা রাজনৈতিক সমস্যার সমাধানের প্রয়াস-চিত্র ইহাতে নাই। তবুও ইহার গভীরতা ও অর্থবহতা অপ্রমেয়। অধুনা-রচিত কোনো দেশের কোনো উপন্যাসের সহিত ইহার একদিক দিয়া তুলনা চলে বলিয়া মনে হয় না। ইহা অনায়াসে বিশ্বের শ্রেষ্ঠ সাহিত্য-শ্রেণীতে আপন আসন অধিকার করিয়াছে। সোভিয়েট রাষ্ট্রে অর্থনৈতিক ব্যবস্থা ও সমাজ-গোষ্ঠী গঠনের অবশ্যম্ভাবী পরিণামে যে নূতন চেতনা ও নবতর মানস বিকশিত হইয়া উঠিতেছে, তাহারই প্রকৃষ্ট প্রকাশ পাওয়া যায় এই উপন্যাসে। আমাদের পরিচিত ধনতান্ত্রিক সাহিত্যের প্রধান সুর হইল রোমান্টিক বা ব্যক্তিকেন্দ্রিক। ব্যক্তিত্ব অর্জ্জনের আগ্রহে জ্ঞাত ও অজ্ঞাত সকল প্রকার আবেগ ও অনুভূতি, হউক তাহারা যতই প্রবল বা সূক্ষ্ম, ইহাদিগকে লইয়াই ধনতান্ত্রিক সমাজের ও রোমান্টিক সাহিত্যের কারবার। ভয় ছিল, সমাজতন্ত্রী রাষ্ট্রে ব্যক্তিত্বের অবসান ঘটিবে, তাহার সাহিত্য হইবে যন্ত্রচালিত সাহিত্য। এ ভয় যে কত মিথ্যা, বর্ত্তমান সোভিয়েট সাহিত্য তাহার জলন্ত প্রমাণ। স্নেহ, প্রীতি, প্রেম, প্রতিহিংসা, ক্রোধ, জিঘাংসা, আত্মত্যাগ

ইত্যাদি যে সব মনোবৃত্তিগুলিকে আমরা ব্যক্তিত্ববিধানের বিভিন্ন প্রবাহ বলিয়া মনে করি, "রামধনু" পড়িলে দেখিতে পাই, নূতন সমাজে তাহাদের পরিধি সংকুচিত না হইয়া বাড়িয়া চলিয়াছে, তাহাদের সাহিত্যিক প্রকাশও যান্ত্রিক পুনরাবৃত্তি না হইয়া অভাবনীয় বাস্তবিকতার বিস্ময়ে শ্বাসরোধী হইয়া উঠিয়াছে। নূতনত্ব হইতেছে এইখানে যে, এই সব একান্ত ব্যক্তিত্ব-ব্যঞ্জক প্রবাহের উৎস সেখানে আর ব্যক্তিত্ব বোধ নহে, উন্নততর গোষ্ঠীচেতনা। গোষ্ঠীর সহিত ব্যক্তির বিরোধ—ধনতান্ত্রিক সাহিত্য ও সমাজের যাহা মূল উপজীব্য, এ-রাষ্ট্রে তাহা আজ হইয়া উঠিয়াছে অতীতের কথা। এখানে ব্যক্তি ও গোষ্ঠী অঙ্গাঙ্গীভাবে সমপৃক্ত, তাই গোষ্ঠীর বিপদে প্রত্যেকটি ব্যক্তি নিজেকে গোষ্ঠীর সমগ্রতার প্রতিনিধি ভাবিয়া সানন্দে আপন নিয়তি নির্দ্ধারণ করে। এই সুর, এই বিরাট মহান্ মিলনবাণী, সোভিয়েট সাহিত্যের বাহিরে অন্য কোথাও ধ্বনিত হইতেছে বলিয়া আমার জানা নাই।

মানব-সাহিত্যের ইতিহাসে এই যে নূতন বসন্ত, "রামধনু-"র লেখিকা তাহার একমাত্র কোকিল নহেন। সোভিয়েটের সাহিত্য-কুঞ্জ বহু-বিহঙ্গের বিচিত্র কাকলীতে মুখর। উল্লিখিত দুটি গল্পচয়ন গ্রন্থে, অন্ততঃ দশজন লেখকের রচনা সংগৃহীত হইয়াছে। প্রথমটিতে আছে বারোটি গল্প ও একটি প্রবন্ধ ; দ্বিতীয়টিতে আছে পাঁচটি। আলেক্সাই টলস্টয় ও ভান্দা ভাসিলিয়েভ্স্কা ত আছেনই। তা ছাড়া আছেন শোলোখভ, টিখোনভ, সোবোলেভ, ডচেনকো—যাঁহাদের নাম আর বাঙ্গালী পাঠকের নিকট একেবারে অপরিচিত নহে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, সিমনভ বা গর্ব্বাটভ-এর একটি গল্পও অনুবাদকবর্গের চোখে পড়ে নাই। নির্ব্বাচিত গল্পগুলির মধ্যে তারতম্য নিশ্চয়ই আছে কিন্তু কোনোটিকেই বলা চলে না, বিশেষত্ব বর্জ্জিত। "দশ ফোঁটা তাজা রক্ত","মা", "প্রিয়া", "কুটীরের ভিতরে" "নীল ওড়না" প্রভৃতি গল্পের সহিত পরিচয় না থাকিলে সাহিত্যচর্চ্চা অঙ্গহীন হইয়া পড়ে।

অনুবাদগুলি প্রায়শঃই সুখপাঠ্য। সোভিয়েট সাহিত্যের অনুবাদ শুরু করায় অনুবাদকের প্রত্যেকেই বাঙ্গালী পাঠকের ধন্যবাদার্হ। সেই জন্যই মনে হয়, তাঁহাদের উচিত, তাঁহাদের গুরুদায়িত্ব সম্বন্ধে সম্যক সচেতন হওয়া। সোজাসুজি রুশভাষা হইতে অনুবাদ করার সামর্থ্য আমাদের দেশে কতদিনে হইবে বলা যায় না! ইংলণ্ডের সাহিত্যিক মহলে ও বিদ্যায়তনে রুশভাষার অনুশীলন প্রবলবেগে আরম্ভ হইয়াছে। বহু দিন ধরিয়া ইংরাজী অনুবাদের সহায়তা নেওয়া ছাড়া আমাদের অন্যগতি নাই। কোন অনুবাদ

মূলের সমকক্ষ হইতে পারে না ; অনুবাদের অনুবাদ তাহা হইলে কোথায় গিয়া দাঁড়ায় ! অথচ দেখিতেছি, ইংরাজী অনুবাদে মূলের সাহিত্যরস পরিবেশন করার যতটা সযত্ন প্রয়াস আছে, বাংলা অনুবাদে তাহা অনেকাংশে স্বল্পতর। স্থানে স্থানে ইংরাজী ইডিয়মের অনুবাদে ভ্রান্তি ঘটিয়াছে ; ভাষান্তরের পথে যেখানে প্রতিবন্ধক দেখা দিয়াছে, তাহাকে এড়াইয়া সহজ করার প্রবৃত্তি প্রকট। এ-প্রবৃত্তি নিশ্চয়ই সমর্থনযোগ্য নহে। পবিত্র গঙ্গোপাধ্যায়ের "রামধনু" অনুবাদ এইরূপ ত্রুটি হইতে মুক্ত। কিন্তু যে-দুটি সাহিত্যিক গুণের জন্য লেখিকার প্রসিদ্ধি—শব্দ প্রয়োগে কঠিন মিতব্যয়িতা ও ভাবপ্রকাশে বহুল ইঙ্গিতময়তা—তাহা ইংরাজী অনুবাদে যতটা ফুটিয়াছে, বাংলা অনুবাদে পবিত্রবাবুও তাহা বজায় রাখিতে পারেন নাই। ইহার জন্য দুই ভাষার অনুবাদশক্তি দায়ী কিনা বিবেচ্য। কারণ অনুবাদ ক্ষেত্রে বাঙলায় পবিত্রবাবুর মত সক্ষম অনুবাদক আর বড় কেহ নাই।

"তমসার শেষে"-তে অনুবাদক অশোক গুহ কিরূপ দায়িত্বজ্ঞানের পরিচয় দিয়াছেন তাহা বুঝাইতে এইটুকু বলিলেই যথেষ্ট হইবে যে, ইংরাজী অনুবাদে যেখানে লাগিয়াছে তিন শত পৃষ্ঠার উপর, বাংলা অনুবাদে তাহা দেড়শত পৃষ্ঠাতেই কুলাইয়া গিয়াছে। এ পার্থক্য টাইপ ও কাগজের সাইজের দোহাই পাড়িয়া উড়াইয়া দেওয়া চলে কি ? কি করিয়া এই অসম্ভব সম্ভব হইল ইংরেজি অনুবাদের ও বাঙলা অনুবাদের শেষ অংশ দুইটি মিলাইয়া পড়িলেই পাঠক তাহা বুঝিতে পারিবেন।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

PUT OUT THE LIGHT (LE SILENCE DE LA MER)—by Vercors Translated by Cyril Conolly (Macmillan, 3/6)

ফ্রান্সের মুক্তির পরে মধ্যে মধ্যে এমন সব খবর আসে, যা গল্প উপন্যাসের বিষয় হতে পারে। মাক্স বোনফু নামক ভিসির খাদ্যমন্ত্রীর গ্রেপ্তারই ধরা যাক্! জর্মানদের সহযোগী ব'লে তাঁর নামে পরোয়ানা খুঁজে পাওয়া গেল শেষ পর্যন্ত ফিল্মস্টার্ গাবি মরলে-র ফ্ল্যাটে গুপ্ত। গাবি নাকি নজরবন্দী গৃহস্থ এখনও। জর্মান রেডিও তো সেদিন মহৎ অবজ্ঞা জানাল মরিস শেভালিয়ে-র মৃত্যুদণ্ড বিষয়ে। এদিকে রয়টারের খবরের টুকরো দেখে মনে হয়, শেভালিয়ে বেঁচেই আছে—অবশ্য আজও রয়টার জানালে

না—রোলাঁ বা অন্যান্য মনীষীদের কথা। এসব খবরে মনে পড়ে এরেনবুর্গের প্যারিস্-জগৎ।

ফ্রান্সের এই বর্তমান জাগরণের আরম্ভও সেই তিন বছর আগেই ঘটেছে। লুই আরাগঁ-র হৃদয়-ভাঙানিয়া নামে কাব্যগ্রন্থে দেখা যায়, কি ভাবে প্রথম দিককার হতাশা গোপন বীরত্বের মানসিক স্বাস্থ্যে পরিণত হল, দ্বিতীয় বিচার্ডের চালুশে বিষাদ জীন দা'র্কের আশ্বাসে দাঁড়াল। কাব্যের দিক থেকে অতি সৌখীন কিন্তু বলিষ্ঠ এক কবিতায় আরাগঁ মধ্যযুগের ক্রুসেডার ও ত্রুবাদুরদের থেকে আরম্ভ করেন এলেওনোর দাকিতেনের প্রেমজাগানে স্বপ্নালু নাম। সে নাম শেষ ছত্রে রূপান্তর পায় ফরাসী জাতীয় সঙ্গীতের শেষ শ্লোকের "লিবেতে লিবেতে শেরী"-র মন্ত্রোচ্চারণে।

তারপরে মাকিস্ ইতিহাসের সূত্রপাত—ঝোপেঝাড়ে লুকিয়ে কঠিন শপথধারী এদের ব্রত নিয়ম আর আত্মত্যাগ পশ্চিম য়ুরোপে অতুলনীয়। এর নাটকীয় সাহিত্যিক উপজীব্যের আভাস দেওয়া সম্ভব নয়। কিন্তু তার মেজাজ দেখেছি এই বড়ো গল্পটিতে। ভের্কোর্ নাকি মাকিস্‌দের একটা আড্ডা ছিল, পূর্ব-দক্ষিণ ফ্রান্সের পাহাড়ে এলাকায়, রোণ্ আর সোনের পাড়ে পাড়ে, যখন ইঙ্গ-মার্কিন বিরুদ্ধতার মধ্যেই এরা জর্মানদের নাজেহাল করে' তুলছিল, যার জন্যে রাইনের সঙ্গে রোণ্-সোন্ খাল জুড়ে ভূমধ্যসাগরে ইউ বোট আনা আর ঘট্‌ল না।

বইটি পড়ে গভীরভাবে বিচলিত হয়েছি। লেখকের সূক্ষ্ম নজর, মনস্তত্ত্বের তীক্ষ্ণ কিন্তু সহজ বিচার-বর্ণনা এবং মনুষ্যধর্মের উপলব্ধি ফরাসী সংস্কৃতিতেই সম্ভব। ফরাসী মূলটির ষ্টাইল্ এক হিসাবে হয়তো মোপাসাঁর সঙ্গে তুলনীয়, কিন্তু এ লেখকের নিদারুণ মানবিকতার সংযম বোধ হয় ১৮৭০-এ সম্ভব ছিল না। এই বৈজ্ঞানিক অনুকম্পা ও ঐতিহাসিক ধৈর্য একালেই সম্ভব। গল্পটি সরল। এক ফরাসী গৃহস্থের উপর বিলি করা হল এক জর্মান অফিসারকে। বাড়ীতে প্রৌঢ় ভদ্রলোক—যিনি গল্পের আমি, আর তাঁর ভাইঝি। একজন নীরবে ধূমপান করেন, আরেকজন করেন নীরবে সেলাই। ফন্ এব্রেনাক্ বৈঠকখানার দরজায় টোকা দেন, জবাব আসে না; ঢুকে ক্ষমা প্রার্থনা করেন ও জানান—প্রৌঢের গাম্ভীর্যে ও তরুণীর স্তব্ধতায় তাঁর শ্রদ্ধা, তাদের মার্শাল ও এড্‌মিরালের প্রতি অবজ্ঞা। ফ্রান্সের সংস্কৃতি ও সভ্যতার কথা চলে। কিন্তু জবাব নেই। জর্মান সঙ্গীতকারটি সন্ধ্যার পরে সন্ধ্যা-কথা বলে' যান, দুই দেশের বন্ধুত্ব-বিবাহ, তাঁর স্বপ্ন, পৈতৃক স্বপ্ন। বিউটি এবং বীষ্ট্। সুন্দরীর স্নিগ্ধ প্রেম শেষে যখন

জাগল, পশুবও শাপবেশ তখন তো ঘুচেছিল। তাবপব শুভতম বাত্রিব বাসনাজ্ঞাপন ও সমুদ্রেব মতো নীরবতার মধ্যে বিদায় গ্রহণ। প্রৌঢেব মন প্রায় গলল—শুধু করুণ শালীনতায়, কিন্তু ভাইঝির তুষারকঠিন এক চাউনিতেই তা রুদ্ধ। তাবপরে ফন্ এব্রেনাক্ প্যারিস্ যান ছুটিতে, ফিবে এসে দেখা নেই কয়েক সন্ধ্যা। তাঁব খোঁড়া পায়েব শব্দ প্রৌঢ়েব কানে আসে কিন্তু দেখা নেই। উদ্বেগ জাগে, মানুষ তো, বাগানেব ধাবে বৈঠকখানা ঘরেই শুধু আগুন। এক সন্ধ্যায় এল দবজায় টোকা বাববার। সেদিন খুলে দিতে হল দবজা। তীক্ষ্ণস্নায়ু মুখচোখ, আঙুল কাঁপছে, জর্মানটি বল্লেন তাঁর ভুলের কথা। সব ভুল, প্যাবিসে তাঁব বন্ধুবা হেসেছে তাঁর ফ্রান্স জর্মানিব বিবাহ-স্বপ্নে। বিবাহ তো নয়ই, ফ্রান্সেব অন্তবাত্মার মৃত্যু তাবা চায়। তিনি তাই পুবে, যেখানে ভাবীকালের গমের ক্ষেতে ফসল হবে শতশবেব উপর, সেই পুবে লড়াই-ফৌজে বদলি হয়েছেন। তাই বিদায় চাই। দরজাব কাছে ফন্ এব্রেনাক্ বলেন, বিদায। এক-দৃষ্টিতে তাকিয়ে থাকেন, জবাব আসে না—প্রৌঢ়ের নিঃশ্বাস নিতে ভাবী লাগে ঘরের টান হাওয়ায়। শেষ পর্যন্ত মেয়েটি মুখ তোলে, এই প্রথম তোলে আব অস্ফুট স্ববে বলে, বিদায়। অদ্ভুত হাসিমুখে জর্মানটি মিলিয়ে যান।

বইটি প্রকাশ ছদ্মনামা লেখকেব, প্রকাশকেব ও মুদ্রাকরেব সাহসেব পরিচয়—কাবণ তখন জর্মান শাসন ছিল কড়া। অনুবাদক সিবিল্ কনলি জ্যাকেটে বলেছেন যে, এ জর্মান নাকি সত্য হতে পারে না। তাঁব ভ্যান্সিটার্ট-মন তাঁকেই আব তাঁর ইংবেজ সহচবদেবই মানায়।

বিষ্ণু দে

বিন্দু বিসর্গ—বনফুল ; দাম ২৲ টাকা
দশ-ভাণ—বনফুল ; দাম ২৸৹ (বেঙ্গল পাব্লিশার্স)

মানুষ চিবদিনই গল্প শুনতে চেয়েছে। অন্তত আমাদেব দেশেব মানুষেব এই নেশা বহুদিনকাব, তাতে সন্দেহ নেই। সাহিত্যেব একটা বিশেষ শাখা হিসাবে ছোটগল্প কিন্তু নতুন করে জন্ম নিয়েছে আমাদের দেশে এ-কালে। 'মেঘনাদ বধ কাব্য' ও 'দুর্গেশ-নন্দিনী' যে প্রেবণাব ফল, আমাদের এ কালের ছোটগল্পও সেই সাগবপাবেব সাহিত্য থেকেই নতুন কবে জীবন লাভ কবে। রবীন্দ্রনাথের ছোট গল্প এক অপূর্ব সৃষ্টি। রবীন্দ্রনাথেব পবে অবশ্য বাঙলা ছোটগল্পের পথ সুগম হয়ে উঠে। উঠবাবই কথা।

তবু কিন্তু মানতে হবে বাঙলা ছোটগল্পের আর্ট তেমন উন্নতি লাভ করে নি। এ কথার প্রমাণ পাওয়া যাবে মাসিক পত্রের সম্পাদকদের জিজ্ঞাসা করলেই। ছোটগল্প কি হবে, তা নিয়ে বড় আলোচনা করে এখানে লাভ নেই। একটা কথা অন্তত এই কাগজ-কমানোর দিনে আমরা বিশেষ করেই অনুভব করছি—সত্যই ছোট করে ছোটগল্প লিখতে আমরা শিখি নি। এর একটা বড় কারণ বাক্-সংযম আমাদের জাতিরই একটু কম, আমাদের লেখকদেরও সে অভাব থেকে গিয়েছে। অথচ ছোট গল্পের আসরে বেশি কথার জায়গা নেই। তার আর্ট নির্ভরই করে বিশেষ করে এই গুণের উপর। ছোটগল্পের আর্ট 'রসঘন' হবেই, তার কেন্দ্র বা লক্ষ্য হবে এক—আর তাতে বাহুল্যের, এমন কি ব্যাপ্তিরও, অবসর নে । বাক্ সংযম একপ লেখার পক্ষে হবে প্রধান প্রয়োজন। কিন্তু ছোটগল্পের সেরূপ লেখক ক'জন আছেন? একজন একপ সার্থক লেখকের কথা বাঙলাদেশের পাঠক সাধারণ প্রায় ভুলে গেছেন—'আবর্তি'র লেখক শ্রীযুক্ত প্রবোধ ঘোষ, এক সময়ে 'সবুজপত্রে' যাঁর সে-সব ছোটগল্প বের হত। কিন্তু বাঙলা সাহিত্যে যে লেখক বাক্ সংযমে সিদ্ধ হয়েছেন মানতে হবে তিনি 'বনফুল'। তাঁর এই গুণের পরিচয় অবশ্য বাঙালী পাঠক ইতিপূর্বেই পেয়েছেন, এমন কি তাঁর উপন্যাসেরও মাঝে মাঝে বহু আখ্যানে 'বনফুল' তাঁর এই শক্তির পরিচয় রেখে যান। দু'টি কথায়, দু'টি আঁকে, এমন করে একটা ঘটনা বা একটা চরিত্র—যাই তাঁর লক্ষ্য হোক্,—বোধ হয় আর কোনো বাঙলা লেখক ফুটিয়ে তুলতে পারেন নি। শব্দের মিতব্যয়িতা সব সময়েই একটা বড় গুণ; অবশ্য তাই একমাত্র গুণ বা চরমগুণ তা বলছি না। কিন্তু এই মিতব্যয়িতায় বনফুল অদ্বিতীয়,—রবীন্দ্রনাথ থেকে অন্য কোনো আধুনিকতম লেখককেও বাদ না-দিয়ে একথা বলা চলে।

আলোচ্য গ্রন্থ দুখানি 'বনফুলের' সেই অল্প কথায় লেখা গল্প ও একাঙ্ক নাটকের সমষ্টি। 'বিন্দু-বিসর্গে' আছে বিশটি ছোট গল্প; সব চেয়ে বড় গল্পটি কোনো রকমে আট পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত এসে পৌঁছেচে, ছোটগুলো এক পাতা দেড় পাতায় শেষ হয়েছে। 'দশ-ভাণে' আছে দশটি একাঙ্ক নাটিকা—বড়গুলো চব্বিশ পঁচিশ পৃষ্ঠার, আর ছোট দু-একটি পাঁচ সাত পৃষ্ঠায় সমাপ্ত। শুধু এই পাতার হিসাব থেকেও বলতে হবে বাঙলা ভাষায় এ এক অসাধারণ জিনিস। অবশ্য এই বাইরের হিসাব থেকেই এই লেখাগুলোর স্বভাবও আমরা অনুমান করতে পারি;—পূর্বেই তা বলাও হয়েছে। বিন্দু বা বিসর্গ খুব বাশভারী জিনিস নয়, তবু ভাষায় তাদের স্থান আছে। জীবনের ক্ষেত্রেও এমনি বিন্দু বিসর্গের অভাব নেই।

আমরা সে সব অনেক সময়ে দেখেও দেখি না, অ'মোল দিতে চাই না। 'বনফুল' সে-গুলোকেই সামনে তুলে ধরলেন—বিন্দুকে সিন্ধু ব'রে নয়, বিসর্গকেও সর্গ করে নয়। তিনি এক একটি ছোট কথা, ছোট অধ্যায়কে তুলে ধরেছেন ছোট রূপেই, কিন্তু তার মানে ঠিক মতো ধরিয়ে দিতে ছাড়েন নি; আর তাই প্রত্যেকটি পড়েই মনে হয়, 'তাইতো, জীবনের এই ছোট, তুচ্ছ, ফেলে-দেওয়া, ঝরে-যাওয়া মানুষ বা মুহূর্ত কোনোটাই তো মূল্যহীন নয়'। এইটি লেখকের কবিদৃষ্টিরই প্রমাণ। আর এই প্রমাণ তিনি দিতে পেরেছেন তাঁর অসাধারণ কলা-নৈপুন্যের জন্য—কথার মিতব্যয়িতা ও সার্থক প্রয়োগের জন্য। অবশ্য একটি কথা আছে—সবগুলো গল্পই যে সমান মূল্যের তা নয়। আর অন্য দুইটি কলা-বৈশিষ্ট্যের কথাও বলা দরকার—অনেক বিদেশী ছোটগল্পে যেমন শেষ দিকে লেখক একটি দুটি কথায় গল্পের মোড় ঘুরিয়ে আসল জায়গায় এনে পৌঁছে দেন—কয়েকটি গল্পে বনফুলও তেমনি সুনিপুণ চাতুর্যের পরিচয় দিয়েছেন। এইটা বড় গুণ নয়, একটা কলা-কৌশল; কিন্তু একালের ছোটগল্পে তার স্থান যথেষ্ট, আর 'বনফুল' বাঙলা লেখকদের মধ্যে তা বেশ আয়ত্ত করেছেন। দ্বিতীয় কথাটি কিন্তু বড়গুণ—লেখকের সত্যকারের রসিকতা; রঙ্গ, ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ—বিশেষ করে স্বচ্ছ হাস্য মধুর পরিহাস অতিরিক্ত সূক্ষ্ম নয়, কিন্তু স্থূলও নয়—'বনফুলের' এই নিজস্ব গুণটি প্রায় গল্পেই ফুটে উঠেছে।

'দশ-ভাণের' একাঙ্ক নাটিকা দশটিও এ জাতের। তবে তা একটু স্বতন্ত্র গোষ্ঠীর। একাঙ্ক নাটিকা যে আমাদের দেশে ছিল তা জানতাম না। কিন্তু আমাদের দেশের সংস্কৃত নাটকে আর ইউরোপের নাটকে একটা স্বভাবগত বৈষম্য আছে। আমাদের নাটক রঙ্গ-প্রধান, গীতিপ্রধান, ইউরোপের নাটক কর্মপ্রধান। তাই আমাদের সেকালে যাকে 'ভাণ' বলত 'একাঙ্ক' নাটিকা হয়ত ঠিক তা নয়; তবু 'সাহিত্যদর্পণ' থেকে এই কথাটি উদ্ধার করে 'বনফুল' ভালোই করেছেন। যে কারণে একালে ছোট গল্পের এত প্রসার সেই বাস্তব কারণেই একালে 'একাঙ্ক' নাটিকাও দিনে দিনে বাড়ছে। বলা বাহুল্য এসব একাঙ্ক নাটিকা কর্মবহুলই হবে—নাটকধর্মী হবে। সেদিক থেকে 'দশভাণের' সব কয়টি লেখা সমান নাট্যধর্মী কি না বলা যায় না। 'বনফুল' আলাপ রচনায় সিদ্ধহস্ত। সত্যকারের নাট্যকারের দৃষ্টি ও শক্তি যে তাঁর আছে তার প্রমাণও তাঁর রচিত নাটকে অনেক রয়েছে। 'দশ-ভাণের' লেখা কয়টিতেও তা প্রত্যক্ষ। আমাদের দেশের ইস্কুলে-কলেজে, অনেক সময়ে নানা আয়োজনে-উপলক্ষে অনেক অভিনয় হয়। মনে হয়, সে সব

ক্ষেত্রে একাঙ্ক নাটিকা অভিনয় করলেই উদ্যোক্তারা সার্থক হতে পারেন। 'বনফুলের' এই ভাণ কয়টি তাঁদের আদর লাভ করবে কি না জানি না—কিন্তু এ গুলোতে খাঁটি নাট্যগুণ তো আছেই, অধিকন্তু 'বনফুলের' আদর্শ গুণগুলো যথেষ্ট ফুটেছে—কথার মিতব্যয়িতা, আলাপ রচনায় কৃতিত্ব, স্বচ্ছ কৌতুকবোধ।

একটা কথা বুঝতে হবে তবু এ গল্প ও নাটকগুলো বিন্দু বিসর্গ। অবশ্য সে হিসাবে তার মানে আছে। আর এগুলো থেকেও বুঝতে দেরী হয় না যে, 'বনফুল' জীবনের বৈচিত্র্যে বিমুগ্ধ। অবশ্য এ শিল্পীসুলভ সাধারণ মনোভাব। জীবনের হাজার ছোট বড় বৈচিত্র্য শিল্পী দেখেন, উপভোগ করতে চান, উপভোগ করেন। সব জিনিসেই তাঁর সমান আনন্দ—সৃষ্টির উপকরণ হিসাবে সবই তাঁর চক্ষে সমমূল্য—কিন্তু জীবনের পক্ষে তা সমমূল্য নয়, তাও সত্য। শিল্পীর এই আনন্দ বনফুলের ক্ষেত্রে আরও বিচিত্র হয়েছে আর একটি কারণে। একই সঙ্গে তাঁর আছে একটি কবি-প্রাণ—তাই প্রধান; আবার আছে একটি বৈজ্ঞানিক মনও, তাও সক্রিয়। দুইই দুয়েকে নানাভাবে প্রভাবান্বিত করে। তাই স্মৃতি বা কল্পনার সাহায্যে যেমন তিনি এক একটি রহস্যঘন বা স্বপ্নময় পরিবেশ সৃষ্টি করেন, অমনি আবার অতি সহজ বাস্তবের একটি আঘাতে সেই স্বপ্নাবেশকে সহজ লঘু হাতে তেমনি ভেঙেও দেন ('বানপ্রস্থ'); ফলে তাঁর সৃষ্টি আরও বিচিত্র হয়ে উঠে। যে দ্বন্দ্ব জীবনের মধ্যে প্রতিদিকে পুঞ্জিত হয়ে আছে, ফেটে পড়ছে, এভাবে তাঁর সৃষ্টিতে সে দ্বন্দ্বের একটি সহজ স্বাক্ষর দেখা যায়। এ দ্বন্দ্ব অবশ্য 'বনফুলে'র মনেও রয়েছে—কারণ, তিনিও জীবনের দ্বন্দ্বক্ষেত্র থেকে বাইরে থাকতে পারেন না;—তবে সাধারণত তাঁর কবিকল্পনার বলে তিনি এ দ্বন্দ্ব কাটিয়ে উঠতে চান—তাঁর সৃষ্টীতে প্রাধান্য পায় রহস্যবোধ, বৈচিত্র্য-বিমুগ্ধতা। কিন্তু সমস্ত দ্বন্দ্ব ও মোহের মধ্য দিয়েও তাঁর জীবন্ত মন আবার স্বীকারও করে যে, বাস্তবও কম সত্য নয়। এই স্বীকৃতি অবশ্য আবার তাঁর কবিপ্রাণ করতে চায় তাঁর নিজের আদর্শবাদী ভাষায়—'বিদ্রোহ' করতে সে ডাক দেয় অন্যায়ের বিরুদ্ধে, ('১০ই শ্রাবণ')—আন্তরিকতার নামে। কিন্তু বিদ্রোহ তো শুধু আন্তরিকতাকে সম্বল করেও দাঁড়াতে পারে না—তার বাস্তব অবলম্বন চাই। আদর্শবাদী বা সেই বাস্তব-রূপ দেখলে আর এই বিদ্রোহী বা বিদ্রোহিণীর উপর তাঁদের রোমান্টিক শ্রদ্ধা রাখতে পারেন না। আবার, বিদ্রোহের ফলে মার খেয়ে অনেক বিদ্রোহীও তাদের আন্তরিকতা খুইয়ে ফেলে, সেই অকুণ্ঠিত আশা হারিয়ে বসে, কিংবা জীবনে হয়ত তারা জিতে, তবু নিজেরাও জানে না জিতেছে। বিদ্রোহের সেই বাস্তব রূপকে—যেখানে মানুষ

আঘাতে কাতর হয়, কাতরায় পথ হাতড়ায়, হয়ত নির্মম নিষ্ঠুর পাত্র হয়ে উঠে—তা দেখে আদর্শবাদী বিদ্রোহকামী কিন্তু বিদ্রোহেই আস্থা হারিয়ে ফেলেন। তখন যদি বাস্তব-বোধ তাঁর থাকে তবেই তিনি বুঝতে পারেন আসলে বিদ্রোহী জীবনের মর্য্যাদা রেখেছে। বিদ্রোহীও হয়ত জানে না সে জিতেছে, কিন্তু জীবন তার মধ্য দিয়ে জয়ী হয়েছে,—যে জীবন এমন বিচিত্র আর এমন গতিমান। এই জীবনবোধ—শুধু জীবনের বৈচিত্র্যবোধ নয়, জীবনের জঙ্গমতা-বোধ—'বনফুলের' লেখার স্থায়ী স্বাক্ষর রেখে যাবে কি না, তাই এখনো দর্শনীয়। কারণ, বাঙলা সাহিত্য জগতে আজ তিনি নিশ্চয়ই সর্বাগ্রদের মধ্যে গণনীয়।

গোপাল হালদার

সংস্কৃতি-সংবাদ

নাট্যকলা: "নবান্ন"

সম্প্রতি ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের বাংলা শাখা কর্তৃক ক'লকাতার 'শ্রীরঙ্গম' রঙ্গালয়ে শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্যের 'নবান্ন' নাটকটি একাধিকবার অভিনীত হয়েছে। এ নাটকখানা ও গণনাট্য সঙ্ঘের এই সার্থক অভিনয় বিশেষ আলোচনার যোগ্য। বারান্তরে আমরা তা করব, আশা করছি।

নাটক হিসাবে 'নবান্ন'কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না। এতে গল্পের অখণ্ডতার চেয়ে ঘটনার ব্যাপ্তি এবং নাটকীয় আবেগের একাগ্রতার চেয়ে বৈচিত্র্যই বেশি লক্ষণীয়। ১৯৪২ খৃষ্টাব্দের আগস্ট-বিশৃঙ্খলার পর থেকে বাংলার চাষী ও গ্রাম্যজীবনের আওতায় দুর্ভিক্ষ, মহামারী থেকে শুরু ক'রে যতগুলি মর্মান্তিক বিপ্লব ঘটে গেছে, সেগুলি, আর সেই সঙ্গে মধ্যবিত্ত জীবনের সংবাদপত্রীয় মন্বন্তরবিলাস, ব্যবসাদারী চাল ও নারী রপ্তানীর হৃদয়হীনতা, কিংবা সরকারী চিকিৎসা রিলিফের অক্ষম প্রহসন—এতগুলি ব্যাপার এই একটি নাটকে বর্ণিত হয়েছে। ঘটনাপরম্পরার এই প্রকাণ্ড তালিকা, যাকে গত দু'বছরের বাংলাদেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায়, একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্যরসাশ্রিত ক'রে তোলা যুগান্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে। সেই প্রতিভার পরিচয় আজও পাওয়া যায় নি। তবে, বিজনবাবু নতুন ধরণের নাটক রচনার চেষ্টা করে বাঙলা-সাহিত্যে ও রঙ্গমঞ্চে এক নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন, এ-কথা স্বীকার করতে হবে।

'নবান্ন' নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে। এই অভিনয়ের বিশেষত্ব এই যে, এর সার্থকতার মূলে রয়েছে ব্যক্তি-বিশেষের প্রতিভা নয়, সমগ্র মণ্ডলীর উৎসাহিত উদ্যম। বাংলাদেশের অনেক লেখক ও শিল্পীদের মধ্যে আজ যে নতুন প্রেরণার পরিচয় পাওয়া যায়, গণনাট্য সঙ্ঘের উদ্যোগে আজ সেই প্রেরণা সঞ্চারিত হয়েছে বাংলার রঙ্গমঞ্চে—তাই সাহিত্যের মত সেখানেও অনেক বেশি মূল্যবান বর্তমানের সামান্য সার্থকতার চেয়ে ভবিষ্যতের বিপুল সম্ভাবনার আশাপ্রদ ইঙ্গিত।

গণনাট্য সঙ্ঘ-ছাড়াও ক'লকাতার রঙ্গমঞ্চে কয়েকটি সৌখীন দল নানা নাটকের অভিনয় করেছেন। তাঁদের সকলের অভিনয় দেখবার আমাদের সুযোগ ঘটে নি। কিন্তু এই সৌখীন দলগুলির অভিনয় অবজ্ঞেয় নয়। বাঙ্গালা দেশে যাঁরা অভিনয় উৎকর্ষ দেখিয়েছেন অধিকাংশ ক্ষেত্রেই তাঁরা এরূপ সৌখীন দলেই প্রথম আত্মপ্রকাশ করেন। পরে অনেক কৃতী অভিনেতা আবার সাধারণ রঙ্গমঞ্চে যোগদান করেন। অভিনয় কলা ও রঙ্গমঞ্চ দুইই এভাবে সৌখীন দলের চেষ্টায় বারে বারে সুপুষ্ট হয়েছে। নতুন শক্তি ও প্রতিভার প্রয়োজন কখনো কমে নি। এখন তো তা আরও বেড়েছে। কারণ, যাঁরা আজ বাঙলা রঙ্গমঞ্চের নেতৃস্থানীয় তাঁরা সকলেই প্রায় প্রৌঢ়ত্বের পারে গিয়ে ঠেকছেন। এজন্য আমরা সৌখীন দলের নাট্যাভিনয়ে উপস্থিত না থাকতে পারলে দুঃখিতই হই। উল্লেখ যোগ্য এই যে, এ সব নানা দল এখন প্রায়ই সাধারণ রঙ্গমঞ্চের অভিনীত নাটক অভিনয় করে না, নিজেদের জন্য অন্যরূপ নাটক বেছে নেয়। সব সময় তাতে যে ভাল হয় তা নয়। কিন্তু এতে নাটক ও নাট্যকলায় মোটের উপর উন্নতির সুযোগ বেশি দেখা দেয়। 'নবান্নের' সমালোচনা আমরা অন্যত্র করেছি। অভিজ্ঞ বন্ধুর মুখে চোরা বালির রচনা ও অভিনয় কলারও সুখ্যাতিও শুনেছি।

শ্রীরঙ্গমে 'বন্দনার' বিয়ে দেখবার অপেক্ষায় আমরা ছিলাম। কিন্তু প্রথম দিনের সুযোগ হারিয়ে এখন দেরী করতে হচ্ছে। কেন, জানি না। সাধারণ রঙ্গালয়ে অবশ্য অনেক নতুন নাটকও চলছে।

ছায়াচিত্র : "গর্কীর শৈশব" ও "সোভিয়েট দাগেস্তান"

সোভিয়েট সুহৃদ সমিতির উদ্যোগে সম্প্রতি কলিকাতায় দু'টি সোভিয়েট ফিল্ম্ দেখানো হয়ে গেল। "পিটার দি গ্রেট" বা "প্রফেসর ম্যাম্লকের" স্বাদে যাদের তৃষ্ণা জেগেছিল তাঁদের কাছে এ উদ্যোগের জন্য 'সমিতি' বিশেষ ধন্যবাদভাজন।

"সোভিয়েট দাগেস্তান" একটি ছোট documentary ছবি। জারের আমলের দাগেস্তানের সঙ্গে লাল দাগেস্তানের তুলনা এখানে পুঁথিগত শিক্ষার চেয়ে অনেক বেশী জোরালোভাবে চোখে দেখা সত্য হিসাবে প্রত্যক্ষ হ'ল। আমাদের সীমান্ত-বাসীদের সঙ্গে দাগেস্তানীদের বাইরেকার সাদৃশ্যের জন্য এ-ছবি আরো বেশী চিত্তাকর্ষক—আমাদের কাছে এর ব্যঞ্জনাও গভীর। আর একটা জিনিস চোখে পড়ল। দাগেস্তানের কারখানায় কর্মব্যস্ত মজুর-মেয়েদের দল বা সোভিয়েটের প্রতিনিধি ১৮ বছরের তরুণী দাগেস্তানবাসিনীর দৃপ্ত আত্মপ্রতিষ্ঠা দেখে সোভিয়েট সংস্কৃতি 'আঙ্গিকের দিক থেকে জাতীয় ও সত্তায় সমাজতান্ত্রিক' এ-সত্যের যাথার্থ্য উপলব্ধি করা গেল। বোঝা গেল পোষাক পরিচ্ছদ প্রভৃতি সভ্যতার বহিরাবরণের দিকে তারা অতীত ঐতিহ্যকে ভোলেনি—অথচ দৃঢ়মুষ্টিতে আয়ত্ত ক'রে চলেছে উজ্জ্বল ভবিষ্যতকে।

"গর্কীর শৈশব" ছবিটির বিষয় নামেই স্বপ্রকাশ। মহান সাহিত্যিকের আত্ম-জীবনী অবলম্বনেই এর রচনা। যে নিষ্করুণ পারিপার্শ্বিকের মধ্যে শিশু গর্কী বেড়ে উঠেছে ছবিতে দেখে তার ভয়াবহতা যেন আরো জীবন্ত বোধ হয় আমাদের কাছে। কিন্তু সেই ভয়াবহতার নিখুঁত বিবরণই ছবির বড় কথা নয়। প্রতিবাদের আভাসই যেখানে আশ্রয়দাতার নিষ্ঠুর শাসনলিপ্সাকে অযথা উত্তেজিত করে সেই দুঃসহ অবস্থার মধ্যে বালক গর্কী একদিন একটা সাঙ্ঘাতিক বেয়াড়া ঘোষণা ক'রে বসল: won't bear it! শৈশবের কোমল দেহমনের পরে জীবন সংগ্রামের নির্মম কষাঘাতে সে বিদ্রোহ অন্ধ সমাজদ্বেষী-পথে যাওয়াই স্বাভাবিক ছিল। কারণ ভীড়ের ঠেলাঠেলিতে মানুষ আত্মরক্ষার সহজ তাগিদেই পিছনকার ধাক্কার টাল সামলায সামনে ঠেলা দিয়ে। তাই যে ঠাকুর্দা গর্কীর পরে চাবুক চালায় সেই দেখি এক অসতর্ক অথচ আন্তরিক মুহূর্তে গর্কীর কাছেই স্বীকার করছে "কি করব?—আমায়ও যে মার খেতে হয়েছিল ছোটবেলায়!" দারিদ্র্যের সর্বনাশ যতই আসন্ন হয়েছে ততই মানুষগুলো ক্ষিপ্ত, মরিয়া, কাণ্ডজ্ঞানহীন হয়ে পড়েছে। স্বল্পপরিসরের মধ্যেও যে সংসার একদিন আনন্দ-উজ্জ্বল ছিল তা'তেও তাই ফাটল ধরল আর তারই মধ্যে দিয়ে অন্তর্দ্ধান করল পারিবারিক শ্রী ও শান্তি। কিন্তু পিছনের ধাক্কা সামনে চালিয়ে দেওয়ার সনাতন Cynical নীতির চক্র বালক গর্কী একদিন ভাঙল। তার বিদ্রোহ গতানুগতিক নয়—মানবতাই তার প্রাণ। সেই প্রাণই এ-ছবিতে দেখি বারবার—

কোথাও সবল বেদে যুবক ও ক্ষীণদৃষ্টি গ্রেগরী খুড়োর প্রতি গভীর মমতায়, কখনও কিশোর দলের হিংস্রতা থেকে পথের অসহায় পাগলকে বাঁচাতে গিয়ে লাঞ্ছনা স্বীকারে, কোথাও-বা পঙ্গু কিশোর বন্ধুর হাতে নিজের প্রিয় পোষ্যটিকে তুলে দেওয়ায়। এই মানবত্বই উত্তর কালে "If the enemy does not surrender destroy him"-এর বলিষ্ঠ সাধনায় পরিণতি লাভ করেছিল। তারই সূত্রপাত হিসেবে এই ছবিতে পাই "নিজের দেশে অপরিচিত অথচ রুশের সেরা মানুষের" মিছিলের একজনা বিপ্লবীর সঙ্গে কিশোর গর্কীর পরিচয়। এঁরই কাছে বালক তারই ঠাকুমার একটি কথা "Do not hide behind the conscience of another"-এর তাৎপর্য অস্পষ্টভাবে বুঝতে শেখে (ঠাকুমার কথা বলতে গিয়ে একটা কথা মনে হ'ল। সবদেশের মা'রাই নিশ্চয় খানিকটা এক ছাঁচে ঢালা কিন্তু এ-ছবি দেখে বোধ হল যে ঠাকুরমাদের ছাঁচ একেবারেই একরকম)

কিন্তু এ-ত হল বক্তব্যের কথা। এই বক্তব্যই সংযত ও সহজ অভিনয় আর সুপরিচালনার ফলে তত্ত্ব থেকে আর্টের পর্যায়ে পৌঁছেচে। যাঁরা সোভিয়েট আর্ট তত্ত্বভারাক্রান্ত বলে ভয় পান বা উপেক্ষা করেন এ-ছবি তাঁদের বিস্মিত করবে, কারণ পরিচালক কোনখানে তাঁর মূল artistic বক্তব্য থেকে দূরে সরেন নি—তত্ত্বের খাতিরেও নয়, খেলো চমক লাগাবার লোভেও নয়।

সর্বশেষে গর্কীর শৈশবও অতিক্রান্ত হবার সময় এলো। যে প্রাণ-প্রাচুর্যের ফলে আত্মজীবনীতে তিনি তাঁর শৈশবকে অসহ্য নির্মমতা সত্ত্বেও বৈচিত্র্যময় ও "full of intense living" বলেছেন তারই অজস্রতা একদিন তাঁকে ঘরছাড়া করল। ছবিতে এখানকার দৃশ্যটি অপূর্ব। পঙ্গু কিশোর বন্ধুকে সবাই মিলে ঠেলাগাড়ীতে নিয়ে এসেছে তার স্বপ্ন-স্বর্গে—অর্থাৎ খোলা মাঠে। সেখানে চারিদিকের উদার ব্যাপ্তির স্পর্শে স্বপ্নাতুর কিশোর উচ্ছল হৃদয়ে মুঠো খুলে মুক্তি দিচ্ছে তার বহু যত্নে সংগৃহীত পোষ্যদের। এমনই একটি বিহ্বল মুহূর্তে কিশোর গর্কী সঙ্গীদের দুর্লভ সঙ্গের আকর্ষণ কাটিয়ে পাড়ি দিল অজানা পথে, যার বাঁকে বাঁকে অপেক্ষা করছে নব নব বিস্ময়, কত আশ্চর্য অভিজ্ঞতা! দর্শকের মনও তখন আপনার অজান্তে জীবনের সুমহৎ বিশ্ববিদ্যালয়ের পথে—তাঁর "University Days"-এর আশ্চর্য সড়কে—কিশোর গর্কীর সঙ্গী।

শিল্প ও সাহিত্য

ডেলি-স্কেচ পত্রের সংবাদদাতাকে প্যারিসে বিখ্যাত লেখক পি. জি. উড্‌হাউস্ বলেছেন যে, সমস্ত ব্যাপারটাই একটা ভয়ঙ্কর ভুল। ব্যাপারটা হচ্ছে, বার্লিন রেডিওতে ইঙ্গ-

মার্কিন শ্রোতাদেব জন্য ১৯৪১ সালে জুন মাসে তাঁর পাঁচটি বক্তৃতা শোনা যায়—বক্তৃতাতে ছিল নাৎসীদেব স্বপক্ষে প্রচাব। এক বছর আগে একবার তিনি বার্লিনেব হোটেল আড্‌লন ছেড়ে প্যাবিসে হোটেল ব্রিষ্টলে আসেন।' সেখানে বসে তিনি সাংবাদিক-টিকে বলেন যে, ১৯৪০-এব মে মাসে ল তুকে-তে জর্মানরা ঢোকে; তাঁকে এক তৃতীয় শ্রেণীর কামবায় কাঠেব বেঞ্চিতে (!) বসিয়ে ধবে নিয়ে যায় আব তাবপরে এক পাগলা-গাবদেব রূপান্তরিত বাড়ীতে তাঁকে রাখে। একচল্লিশেব জুনে নাৎসিবা তাঁকে আবার হোটেলে আনে এবং পাস্‌পোর্ট ফেবত দেয়—তাঁব বয়স ষাট বলে'ই নাকি। উড্‌হাউস্‌ এমন বিস্মিত ও ব্যথিত যে, তাঁর আমেবিকান পাঠকদের প্রশ্নের উত্তব দিতে গিয়ে তিনি ১৯৪১ সনে ফ্যাসিষ্ট ব'নে যান। এ ভুল বোঝার সম্ভাবনা নাকি তিনি তখন ভাবেন নি—I guess all authors must be half-witted. হায়রে জীভ্‌স্‌ আব হায়রে উষ্টাব! না জানি এব পবে রোমান্‌ রেডিও-বক্তা এজরা পাউণ্ড কি কৈফিয়ৎ দেবেন! বা এলিঅটের ধর্মগুরু শার্ল মরা—যাঁব বাড়ী একদা প্যাবিসবাসীদেব হাত থেকে নাৎসিপ্রহরীরক্ষিত থাকত! আর ভালেরি? তিনি কি আগেই দেশত্যাগী হয়েছিলেন?

ফ্রান্স আবাব মুক্ত হয়েছে, এখনো তাব দুঃখ ও দৈন্যের দিন শেষ হয় নি, কিন্তু তাব গ্লানি ও লজ্জাব দিন শেষ হয়েছে। আশ্চর্য এই যে, এত খবব নানা দিক দেশের আসছে, কিন্তু ফ্রান্সের মনস্বী ও লেখকদেব খবর আমরা এখনো পাই না। বেভাব্‌লি নিকল্‌স্‌ আমাদের উপব কি রায় দিলেন, তাব ওপরে বিলিতী কাগজওয়ালাবা কি মন্তব্য করলে, তা শুনে আবাব নিকল্‌স্‌ আব এক দফা কি বাণী ছাড়লেন,—এ-সব ভয়ানক দবকাবী খবব আমবা পাচ্ছি। কিন্তু এ দেশে আমরা নিকল্‌স্‌-এব সুভাষিতাবলী শোনাব অপেক্ষা জানতে চাই রোম্যাঁ রোল্যাঁব খবর, অন্যান্য ফবাসী লেখক ও শিল্পীদেব কথা। রয়টাবেব সেদিকে আশ্চর্য বাক্‌-সংযম। ফরাসী সংস্কৃতিব ধাবক ও বাহকদেব খবব জানতে হয় অন্য খান থেকে—ঘূর্ণা পথে।

গ্লোব এজেন্সিব খবব এসেছে রোল্যাঁব সম্বন্ধে। রোল্যাঁ কোথায় ঠিক নেই—ফ্রান্সে ও সুইজাবল্যাণ্ডে নাকি নেই—সম্ভবত ফবাসী উত্তর আফ্রিকায় থেকে থাক্‌বেন। কারণ সেকানকাব ব্রাজ্জাভিলেব বেডিও-ই সেদিন বোল্যাঁর সম্বন্ধে এ খবরটি দিয়েছে—"চার বৎসরেব স্বেচ্ছাবৃত মৌনব্রতের পব" বোল্যাঁ এবার নতুন গ্রন্থ প্রকাশিত করছেন। এ গ্রন্থ লেখা পেজে'র সম্বন্ধে। তিনি ছিলেন ফরাসী লেখক, যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দেন।

বোঝা যাচ্ছে বোলঁ্যা বেঁচে আছেন, আগের বোলঁ্যাই আছেন ; হয়ত তাঁর আরও সংবাদ পাওয়া যাবে পরে।

রুশ লেখক ইল্যা এহ্রেনবুর্গ জুগিয়েছেন ইউরোপীয় লেখকদের আরও খবর। তিনি নিজে ছিলেন প্যারিসের ভক্ত। তাঁর লেখা থেকে ফরাসী লেখকদের কিছু কিছু খবর পাওয়া গেছে। আবার্গঁর কথা জানতাম। আঁদ্রে মালরো পার্টিজেনের মত যুদ্ধ করেছেন জন্মভূমির জন্য, জানালেন এখন এহ্রেনবুর্গ। কিন্তু আঁদ্রে জিদ্-এর খবরই শোচনীয়। তাঁর পুরণো (১৯৪০) 'ডায়েরীর পাতা' এখন বেরুচ্ছে, আর তাতে জিদ্ বোঝাতে চেষ্টা করছেন—দুর্নিবার শত্রুর কাছে মাথা নোয়ানোই নিয়ম, মানুষের স্বভাবই তা'ই। তাঁর নিজের তো বিদ্রোহের কোনো ইচ্ছাই নেই—সইলেনই বা দুঃখ দুর্দশা। জিদ্-এর এই পরিণতি কৌতুকজনক—লজ্জাজনকও বটে ; কিন্তু অপ্রত্যাশিত নয়। ক্লীবত্ব জিদ্-এর মজ্জাগত ; সেই ক্লৈব্যের সাফাইও তিনি গাইবেন তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। বিকৃতরুচি জিদ্ পৃথিবীতে সভ্যতার বিকৃতিরই এক সাক্ষ্য। বিকৃত পৃথিবী দেখে দেখে তবু চমৎকৃত হলেন প্রথম জিদ্ মস্কো গিয়ে। এ কি নতুন মানুষের দেশ দেখলেন তিনি ? একটা কিছু নিয়ে মাতবার সুযোগ পেলেন সেবার জিদ্। কিন্তু ক বছর পরে আবার মস্কো গিয়ে জিদ্ হতাশ হলেন। তখন সে দেশের চারিদিকে ফ্যাশিস্ত ষড়যন্ত্র জেঁকে বস্‌ছে, দেশের ভেতরেও শত্রুরা সুরঙ্গ খুঁড়তে চায় ; মস্কোর তখনকার সতর্ক দৃষ্টি ও শাসনে জিদ্-এর বিশৃঙ্খল রোমান্টিক স্বপ্ন উবে গেল। স্বপ্ন ভুয়ো হয়ে গেল—জিদ্ বললেন, মস্কোই ভুয়োর দেশ। তারপর—ইতিহাস এগিয়ে গেল। জিদ্ তো স্বপ্ন দেখেন না ; অতএব নাৎসি-শাসকদের কাছে মাথা নোয়ানোই বাস্তবতা, সুবুদ্ধি। জিদ্ বিকৃত সভ্যতার বিষপুষ্প—মহৎ কিছুতেই এরা আশ্বাস ও আনন্দ পায় না। এই বিকৃতিতেই ফ্রান্সের পতন ঘটে, আর এই বিকৃতি কাটিয়ে উঠেই এবার নতুন ফ্রান্স জন্ম নিচ্ছে। লুই আবার্গঁ, আঁদ্রে মালরোর সঙ্গে যোগ দিচ্ছেন ফরাসী সংস্কৃতির পুনর্গঠনে মোরেই ও দুআমেল, বৈজ্ঞানিক জোলিও ক্যুরি ও আঙ্গেবিঁ।

জোলিও ক্যুরি ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিয়েছেন, এ খবর আমরা দেখেছিলাম। কিন্তু বিশ্ববিখ্যাত শিল্পী পিকাসোর খবর আমাদের বিলাতী কাগজ থেকে সংগ্রহ করে জুগিয়েছে 'জনযুদ্ধ'। পিকাসো প্যারিসবাসী ; স্পেনের গুয়ের্নিকায় তিনি জন্মান, বরাবরই তিনি গণতান্ত্রিক। স্পেনীয় গৃহযুদ্ধের বিষয়ে অঙ্কিত তাঁর চিত্র তো সকলকে বিস্মিত করত। শিল্পী হিসাবে তাঁর বৈশিষ্ট্য ও বৈচিত্র্যের অভাব নেই—বোধ হয়

পৃথিবীতে এখন সেরা শিল্পী বলে পিকাসোই সমাদৃত। সেই পিকাসোও নাকি ফ্রান্সের কমিউনিষ্ট পার্টিতে যোগ দিলেন এবার।

প্যারিস পাশ্চাত্যের সভ্যতার, বিশেষত তার শিল্পের রাজধানী। 'যুধ্যমান ফ্রান্সের' দিল্লী আফিস জানাচ্ছে, সেই প্যারিসে এই হেমন্তেই চিত্র প্রদর্শনী হচ্ছে, আর তাতে রাজনীতিক মতামত নির্বিশেষে শিল্পীরা সকলেই তাঁদের সৃষ্টি উপস্থিত করছেন।

কংগ্রেসকে চেপে রাখলেও কংগ্রেস যে চাপা পড়বে না, তারই এক প্রমাণ পাওয়া গেল গত ৪ঠা নবেম্বর, 'কংগ্রেস সাহিত্য সঙ্ঘের' প্রতিষ্ঠায়। সে সভায় নিমন্ত্রিত ও উপস্থিত ছিলেন অনেকেই—অবশ্য যাঁরা বরাবরকার কংগ্রেস-ভক্ত ও সাহিত্যিক তাঁরা অনেকে বাদও পড়েছেন। তা হোক; তবু উপস্থিত যাঁরা ছিলেন তাঁদের মধ্যেও অনেকে সুপরিচিত সাহিত্যিক ও কংগ্রেসভক্ত; আবার কেউ বা সাহিত্যিক কেউ বা কংগ্রেস ভক্ত বলেই সুপরিচিত। তা ছাড়া এমনও ছিলেন কেউ কেউ যাঁরা আগে কংগ্রেস নিয়ে মাথা ঘামান নি, বড় জোর তাকে ব্যঙ্গ করেই খুশী হতেন, কিংবা মনে করতেন সাহিত্যের গায়ে পলিটিক্‌সের আঁচ লাগ্‌লে সাহিত্যের জাত যাবে। যা আনন্দের কথা তা এই যে,—প্রথমত, আজ বাঙালা দেশের সাহিত্যিকরা নিজেদের সামাজিক দায়িত্ব তো স্বীকার করেছেনই, রাজনীতিক দায়িত্বও গ্রহণ করছেন। দ্বিতীয়ত, যে বাঙলা দেশে কংগ্রেস নাকি সবচেয়ে দুর্বল সেখানেও সাভারকারী বা সরকারী কোনো মোহই সাহিত্যিকদের কংগ্রেসের থেকে দূরে রাখতে পারল না। বাঙলা দেশে প্রগতিশীল শক্তি যে কত প্রবল হয়ে উঠছে, তা আজ এর থেকে স্পষ্ট বুঝা যায়।

নিরীক্ষা

নন্দলাল সংখ্যা

শিল্পাচার্য নন্দলাল বসুর জীবনী ও শিল্পপ্রতিভা সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য বিশিষ্ট শিল্পী ও সমালোচকের আলোচনা-সংগ্রহ।

নন্দলাল-অঙ্কিত

প্রায় পঞ্চাশখানি বহুবর্ণ ও রেখাচিত্র ও তাঁহার লেখা দুইটি শিল্পতত্ত্ব বিষয়ে প্রবন্ধ-সহ

বাইশখানি আর্ট-প্লেট

হস্তনির্মিত কাগজে মুদ্রিত * পাঁচ টাকা, সডাক ৫৷৹

ইন্দ্র দুগার ঃ ৪৮, ইণ্ডিয়ান মিরর স্ট্রীট

এম, সি, সরকার এণ্ড সন্স
১৪, কলেজ রো

নিরীক্ষা প্রকাশনী
বহরমপুর, মুর্শিদাবাদ

নিরীক্ষা ঃ শিল্প ও সাহিত্য-বিষয়ক ত্রৈমাসিক পত্র।

আগামী পৌষে চতুর্থ বর্ষ আরম্ভ হইবে।

বার্ষিক মূল্য দু' টাকা। প্রতি সংখ্যা আট আনা

সম্পাদক ঃ

উমানাথ সিংহ রবীন্দ্র মজুমদার

চিন্তাশীল সমাজ, দেশকর্মী ও প্রগতিপন্থীদের জন্য—**সমবায় পাব্‌লিশার্সের** অপূর্ব সাহিত্যসংগ্রহ

স্থশীলকুমার বস্থর

হিন্দু না মুস্‌লিম ? ২॥০

সাম্প্রদায়িকতার বাস্তব ব্যাখ্যা—পাকিস্তানের স্বরূপ ও পরিণতি—কংগ্রেস লীগ ঐক্য ও স্বাধীনতা আন্দোলন ইত্যাদি বিষয়ের সমাধান-পন্থী সহজবোধ্য আলোচনাগ্রন্থ।

শিবশঙ্কর মিত্রের

গরিলা যুদ্ধ ও বঙ্গদেশ ২।০

যুদ্ধে জনগণের সহযোগিতায় কী উপায়ে আক্রমণ-কারী শত্রুকে প্রতিহত করা যায়—তার সম্বন্ধে জ্ঞান ও শিক্ষা লাভের একমাত্র প্রামাণিক গ্রন্থ।

শিবরাম চক্রবর্তীর

মস্কো বনাম পণ্ডিচেরী ২৲

সমাজ ও ব্যক্তি, আধ্যাত্মিক সাধনা ও রাষ্ট্রনীতিক বিপ্লব, ব্রাহ্মণ ও শূদ্রের শক্তি, সমাজ ও সাহিত্যের সম্পর্ক ইত্যাদি বিষয়ে সরস স্থখপাঠ্য রচনা গ্রন্থ।

শুভেন্দু ঘোষের

শিল্পদর্শনের ভূমিকা ১৲

বাস্তব জীবনের ভিত্তিতে শিল্প ও দর্শনের ব্যাখ্যা ও স্বরূপ বিশ্লেষণ—আধুনিক চিন্তাধারা ও বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গী-সম্মত রচনা।

চীনা গণনাটিকা ॥০

লেনিনের বক্তৃতা ৸০

হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের

ভারতবর্ষ ও মার্ক্‌সবাদ ১৸০

মার্ক্‌সবাদী দৃষ্টিভঙ্গীতে ভারতের রাষ্ট্র-সমাজ-অর্থনীতিক সমস্যার বিশ্লেষণ ও সমাধানের নির্দেশপূর্ণ রচনাবলী এবং রুষীয়বিপ্লব ও রাষ্ট্র-ব্যবস্থা সম্পর্কে প্রামাণ্য তথ্যপূর্ণ আলোচনাগ্রন্থ।

মণীন্দ্রনারায়ণ রায়ের

রুশিয়ার নৈতিক জীবন ৸০

বিনয় ঘোষের

সোভিয়েট সভ্যতা (২য়) ৩।০

সংস্কৃতির দুর্দিন ।৴০

অজিত মুখোপাধ্যায়ের

এ যুদ্ধ বাধলো কেন ? ॥০

V. Molotov's

THIRD FIVE-YEAR PLAN—USSR
[Ed. *by* Saroj Acharyya] Rs. 4/-

S. Rout Roy's

BOATMAN BOY (Peoples' Poems)
[Trd. *by* Harindranath Chattopadhaya] Rs. 1/8

প্রকাশ অপেক্ষায় :

যতীন্দ্রনাথ সেনগুপ্তের যাবতীয় কাব্য-সম্ভারের আনুপূর্বিক সঞ্চয়ন গ্রন্থ, **অনুপূর্বা**

বিমলচন্দ্র ঘোষের নূতন ও পুরাতন কবিতাবলীর নির্বাচনগ্রন্থ, **দ্বিপ্রহর**।

অনিল চক্রবর্তীর **প্রবাহ** (কবিতা) ১॥০

বৈদ্যনাথ ঘোষের **ঘূর্ণীহাওয়া** (কবিতা)॥০

প্রাপ্তিস্থান : **বুক ফোরাম** ৭২, হ্যারিসন রোড (কলেজ স্কোয়ার ইষ্ট) কলিকাতা।

চতুর্দশ বর্ষ—৫ম সংখ্যা।

অগ্রহায়ণ, ১৩৫১

পরিচয়

আমাদের সাহিত্য ও স্বাধীনতা আন্দোলন

রাজনীতি আব সাহিত্য—এ দুয়ে তফাৎ আছে। এক সময়ে কবি মোহিতলাল মজুমদাবের মত কেউ কেউ মনে কবতেন, বাঙালীব পক্ষে রাজনীতি চর্চা একটা নেশা এবং বাঙালীর স্বভাব-বিবোধী নেশা ;—বাঙালীর স্বভাব ফুটতে পারছে তার সাহিত্যে। দেখা যাচ্ছে আজ বাঙলা সাহিত্যিকরা আব রাজনীতিকে তাদের উপেক্ষার বস্তু মনে কবেন না ; এমন কি, তাব সঙ্গে সংযুক্ত হওয়াটাই "স্বধর্ম" বলে মনে করেন। আসলে বাঙলার অনেক সাহিত্যিক আজ যে রাজনীতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ স্থাপন করতে অগ্রসর হয়ে আসছেন এটা আকস্মিক নয়। নিশ্চয়ই তার স্থূল ও প্রত্যক্ষ কারণও যথেষ্ট আছে ; সে কারণ বৈষয়িক। যুদ্ধ ও মন্বন্তরেব মধ্য দিয়ে আজ ভাবতবর্ষে এবং বাঙলা দেশে দেশীয় মালিকশ্রেণী দাঁড়িয়ে যাচ্ছে। ভারতবর্ষের রাজনীতিতে তাঁদের স্বভাবতই প্রভাব রয়েছে। দেশ যত স্বাধীন হতে যাবে 'স্বদেশী' শিল্প বাণিজ্যও তত বাড়বে। সংবাদ-ব্যবসায়ী ও সাহিত্য-ব্যবসায়ীরাও জানেন যে, এই মালিকশ্রেণীও 'স্বদেশীব' সঙ্গে যোগ না রাখলে ব্যবসায়ী হিসাবে তাঁরাও উন্নতি করতে পারবেন না। অতএব, রাজনীতিব দিকে সাহিত্যের চোখ বাখতে হবে। দ্বিতীয়ত, সাহিত্যিকরা দেখছেন বেকাব, যুদ্ধ ও মন্বন্তর এ-সবের ফলে পাঠক সাধারণের রাজনীতিক ঝোঁক বেড়ে গেছে ; তাবা দেশের কথা বুঝতে চায়, বিদেশের খবর জানতে চায়। এ সময়ে রাজনীতিব বিষয়ে যে সাহিত্য উদাসীন বাজারে তার কাট্‌তি কমছে। এই দুই বৈষয়িক কারণে বহু সাহিত্যিক ও সাহিত্য-ব্যবসায়ী রাজনীতির চর্চা করবেন, তা ঠিক। তবু কারণ আরও আছে। পৃথিবী-জোড়া যে রাজনীতিক ভাঙা-গড়া চলেছে, তাতে কোনো মানুষের পক্ষে রাজনীতিকে সঙ্কীর্ণ অর্থে গ্রহণ করা আর সম্ভব নয়। বৃদ্ধ এ্যারিষ্টোটেলের কথা সবাই বুঝতে পারছে—'মানুষ রাজনীতিক জীব'—এমন কি, কবি শ্রেণীর মানুষও

তা'ই। দ্বিতীয় কারণ, আমাদের দেশেব অবস্থা। পৃথিবীতে আগুনে বারুদে স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রের পরীক্ষা চল্‌ছে; অথচ আমাদের দেশে সেই স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রই ধূলোয় লুটোচ্ছে। অন্যদিকে মন্বন্তরে মহামারীতে আমাদের চোখের উপরেও অনেক বেশি ভয়াবহ এক খেলা চলছে। তা দেখেও যাঁরা দেখতে পান না তাঁরা মায়ামুক্ত জীব; সাহিত্যিক নন। একটা সামাজিক ও রাজনীতিক জিজ্ঞাসা এই সব প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতায় সাহিত্যিকদেব মনেও জন্মেছে। ছোট-বড় সকলের মনেই এই সূত্রে আরও পরিষ্কাব হয়েছে একটা কথা—আমাদেব জাতি স্বাধীন না হলে এ মৃত্যু রোধ করবার ক্ষমতাও আমবা লাভ করব না। অবশ্য এই অনুভূতিব সঙ্গে নানা রকম সহজ-জটিল অনুভূতিও জড়িত থাকে। যেমন, কেউ মনে কবে, স্বাধীনতা না লাভ করতে পাবলে বাঁচবাব কোনো চেষ্টা করা একেবাবে নিষ্ফল, আব তাই নিষ্প্রয়োজন। আবাব কেউ মনে কবে, বাঁচবার চেষ্টা ও স্বাধীনতাব চেষ্টা একই সূত্রে গ্রথিত করে নেওয়াই প্রয়োজন, দুটোই পবস্পর সংযুক্ত থাকা উচিত। এমনি নানা রূপে নানা মানুষ ভাবে। তেমনি নানা দিকে তাদের কাজ তাবা স্থির কবে নেয়;—অথবা স্থিব কবে বসে নিজেব নিষ্ক্রিয়তাব সমর্থনে সক্রিয় যুক্তি। মোটের উপর, বুদ্ধি ও স্বার্থেব তাগিদে সবাই জানেন—সাহিত্য স্বাধীনতাব আন্দোলন থেকে দূরে থাকৃতে পাববে না।

এই কথার প্রমাণই রয়েছে বাঙলা সাহিত্যেবও ঐতিহ্যে। সম্প্রতি তা'ও কেউ কেউ আবিষ্কাব কবেছেন! অধ্যাপক বিনয় সবকাবেব মত তাঁদেব আজ এই সূত্রে মনে পড়েছে—বাঙলায় "১৯০৫" এসেছিল। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গেব পরে "বাঙলা দেশের চিন্তাশীল স্রষ্টা সাহিত্যিক ও কবি-সমাজেব চিত্ত ও পবাধীনতার বেদনায় গ্লানিবোধ করিয়া উদ্‌বুদ্ধ হইয়াছিল। এই নিগূঢ় ও নিবিড় বেদনাকে তাঁহাবা রূপ দিয়াছিলেন তাঁহাদেব কাব্যে, গল্পে, উপন্যাসে, প্রবন্ধে।" (শনিবাবের চিঠি, কার্ত্তিক, ১৩৫১)। হঠাৎ-স্বাধীনতা-বাদী এই সাহিত্যিকদের যা প্রতিপাদ্য তা বোধহয় এই যে, বাঙালীব স্বাধীনতা-আন্দোলন ও বাঙালীর সাহিত্যিক সৃষ্টিব মিলন ঘটেছিল ১৯০৫-এ। তাবপর ১৯২০-ব পরে যে 'মুক্তিব আহ্বান' আসে—অবশ্য তাতেও বাঙালী কর্মীরা সাড়া দিয়েছে, কিন্তু "তাহাকে জয়যুক্ত করিয়া বাংলা সাহিত্য আজও পর্যন্ত ধন্য হইয়া উঠিতে পারে নাই। আব বাঙালী সাধক ও কবিদেব এই পরস্পর অপরিচয়ের ফাটল দিয়া অবাঞ্ছিত বৈদেশিক বহু ভাববাদ বাংলা দেশে প্রবেশ করিয়া বাংলা দেশেব তরুণ মনকে বিক্ষিপ্ত বিভ্রান্ত কবিয়া আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনকে যে পিছাইয়া দিয়াছে, তাহাতে সন্দেহ নাই।"

কথাটার মানে বোধ হয় এই যে, ১৯২০-র পর থেকে "অবাঞ্ছিত বৈদেশিক ভাববাদ" বাংলা দেশে আসছে, তার আসার কারণ বাঙলার সাহিত্যিকরা স্বাধীনতা-আন্দোলনের সঙ্গে চলতে পারেন নি। তার মানে, 'অবাঞ্ছিত বৈদেশিক ভাববাদ' (১) এসব সাহিত্যিক-দেরই পেয়ে বসেছিল, কারণ তাঁরা স্বাধীনতা আন্দোলন থেকে বিচ্ছিন্ন ছিলেন; কিংবা (২) 'অবাঞ্ছিত বৈদেশিক ভাববাদ' রাজনীতিক কর্মীদের পেয়ে বসেছিল, কারণ তাঁরা সাহিত্যস্রষ্টাদের সাহায্য থেকে বঞ্চিত ছিলেন; অথবা (৩) 'অবাঞ্ছিত বৈদেশিক ভাববাদ' এ দুইকেই কবলিত করেছিল, আর দুই দুয়ের অধোগতির কারণ হয়েছে—তাতেই স্বাধীনতা আন্দোলন পিছিয়ে গিয়েছে।

কথাটা সত্য না মিথ্যা, কি অর্থে সত্য আর কি অর্থে মিথ্যা, তা ভেবে দেখবার আগেও কিন্তু একটা কথা পরিষ্কার রূপেই আমরা জানি, বাঙলার বা ভারতবর্ষের স্বাধীনতা আন্দোলন ১৯০৫ সালেই শুরু হয় নি, এই সাহিত্য ও এই স্বাধীনতা-আন্দোলনের সম্পর্ক এত অর্বাচীন নয়। সাময়িক ভাববাদে অনেক কথাই অনেক সময়ে চেপে যেতে হয়, নইলে স্বাধীনতার আহ্বান মাত্র ১৯০৫-এ দেখা দিয়েছে—এমন কথা, যিনি ১৯৪৪-এও ১৯০৫—সেই অধ্যাপক বিনয় সরকারও বলবেন না।

স্বাধীনতা আন্দোলন দেখা দেবার কথা তখনি, যখনি আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছি, অথবা যখন আমরা বুঝলাম যে, আমরা স্বাধীনতা হারিয়েছি। ১৭৫৭-তে বাঙালী একথা স্পষ্ট করে বুঝেছিল কি না সন্দেহ। বুঝলে তার প্রমাণ পাওয়া যেত; পলাশীই শেষ যুদ্ধক্ষেত্র হত না। যাই হোক্, স্বাধীনতা যে আমরা খুইয়েছি, আর স্বাধীনতার যে একটা মূল্য আছে, এ সত্য যে, বাঙালী, দেখতে পাই, প্রথম বুঝেছেন—তিনি রাজা রামমোহন রায়। পলাশীর পরে তখন পঞ্চাশ বছর হয়ে গিয়েছে,—মীর জাফর, মীর কাশেমের খেলা চুকে গিয়েছে, ছিয়াত্তরের মন্বন্তর গিয়েছে, চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের ফলে পুরনো অভিজাত গোষ্ঠী লোপ পেয়েছে, বেনিয়ন মুৎসুদ্দিরা নতুন অভিজাত হয়েছে, দেশের শিল্প ও ব্যবসা-বাণিজ্য দুইই নতুন শাসকদের আক্রমণে লোপ পেতে বসেছে। মানে, দেশের রাজা যে এক বিদেশী সম্প্রদায়, আর রাজত্ব যে পুরনো নবাব ও তার সেনাপতি-সামন্তের হাত থেকে এসে পড়েছে বণিকতন্ত্রের হাতে,—এ সত্য তখন কম বেশি সকলের কাছে স্পষ্ট হয়েছে। তবে কতজন এই বুঝে স্বাধীনতার জন্য বেদনা বোধ করেছেন, তা বলা শক্ত। রামমোহনকেই প্রথম দেখি, তিনি নতুন যুগের পথের ইঙ্গিত যেন লাভ করেছেন—তাতে আশ্চর্য হবার কারণ নেই। কারণ, সেকালের যাঁরা বিত্তবান্ ও বুদ্ধিমান্

তাঁরা অনেকেই ছিলেন এই নতুন শাসন-তন্ত্রের দ্বারা উপকৃত। বিদেশীর শাসন যদি বা তাঁদের আত্ম-মর্যাদায় আঘাত দিত, তাঁরা দেখতেন যে, প্রথমত, এ বিদেশীরা বুঝেই হোক্ আর না বুঝেই হোক্, সত্যই একটা শক্তিশালী সভ্যতার মালিক। দ্বিতীয়ত, এরা মোটামুটি একটা শান্তিময় শাসন পদ্ধতিও প্রতিষ্ঠা করেছে—যা নবাবী আমলের শেষ দিকে দুর্লভ হয়ে উঠছিল। আর তৃতীয়ত, এই শাসনতন্ত্রের সহায়ক হিসাবে মোটামুটি দেশের বিত্তবান্ ও বুদ্ধিমানরাও বেশ ভাগ্যবান্ হয়ে উঠ্‌তে পেরেছেন—হয়েছেন সমাজের অভিজাত। রামমোহন নিজেও ছিলেন এ দলেরই এক মাথা, যেমন তখনকার দিনে তাঁর প্রতিপক্ষ রাজা রাধাকান্ত দেব প্রভৃতিও ছিলেন এ দলেরই কর্তা। এরূপ সামাজিক অবস্থা থেকেও যে ক্রমে ক্রমে স্বাধীনতা আন্দোলন গড়ে উঠ্‌ল তার কারণ—প্রথম এল এক "নতুন চেতনা"—যাকে বল্‌তে পারি আমাদের 'রিনেইসেন্স'। তা'তে শিক্ষা-দীক্ষা ও সাহিত্যে একটা নতুন সৃষ্টিশক্তির উদ্বোধন হল। আর এই 'রিনেইসেন্স' ক্রমে রূপ নিলে অন্যদিকে আবার এক 'রিফর্মেশনে'—মানে, ধর্ম সংস্কারে, আর সমাজ-সংস্কারে। আবার 'রিনেইসেন্স' ও 'রিফর্মেশন,'—বিশেষ করে আমাদের সাহিত্যিক সৃষ্টিতে ও ব্যক্তি স্বাধীনতার প্রয়াসে পুষ্ট হয়ে,—ক্রমে রূপ নিলে এক জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধে, এক জাতীয় উদ্বোধনে (যার প্রমাণ, 'হিন্দু-মেলা') এবং শেষে তা দানা বেঁধে উঠ্‌ল (ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান এসোসিয়েশন, ইণ্ডিয়ান এসোসিয়শন ও ইণ্ডিয়ান ন্যাশেনাল কংগ্রেসের মধ্যে) এক সচেতন রাজনীতিক আন্দোলনে। স্বাধীনতার বেদনা এ ভাবেই জেগেছে, আর সে বেদনা আবার এ ভাবেই আমাদের শিক্ষা-দীক্ষা, সাহিত্য-সৃষ্টি, এমন কি ধর্ম ও সমাজ সংস্কারের পিছনেও প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ ভাবে প্রেরণা জাগিয়েছে। এই তো উনবিংশ শতাব্দের বাঙলার ইতিহাস, তার সত্য।

এই যে সত্য উনবিংশ শতাব্দে ক্রমে প্রকাশিত হয় তার প্রথম সুস্পষ্ট আভাস আমরা পাই রামমোহনের মধ্যে। কিন্তু উনবিংশ শতাব্দে বাঙালী মন কেমন করে এই সুবৃহৎ সত্য সম্বন্ধে ক্রমে সচেতন হয়ে উঠল এখানে তার ইতিহাস বলা সম্ভব নয়, দুই একটি তার স্মরণীয় বৈশিষ্ট্য কিন্তু উল্লেখ করা দরকার।

প্রথম বৈশিষ্ট্যটা এত বড় যে, তা সকলেই জানি, আর জানি বলেই তা আর আমরা ধর্তব্যের মধ্যে বিবেচনা করি না। সেই কথাটি এই—উনবিংশ শতাব্দের এই রিনেইসেন্স, এই রিফর্মেশন, এই রাজনীতিক চেতনা সবই বাঙলা দেশের হিন্দুদের মধ্যে সীমাবদ্ধ রইল। বাঙালী মুসলমান তাতে প্রায় কোনো অংশই নিতে পারেন নি। কেন

তাঁরা পারলেন না, সে প্রশ্ন এখানে আলোচ্য নয়। এখানে বড় কথাটি এই যে—সেই হিন্দু রিনেইসেন্স, হিন্দু রিফর্মেশন ও হিন্দু রাজনীতিক চেতনার ফলে একটা হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ সৃষ্টি হল, এবং '১৯০৫-এর' রাজনীতিক আন্দোলনের রূপটা বিশেষ রকম হিন্দুরীতির হল। ১৯২০-র রাজনীতিক আন্দোলনেই প্রথম সেই হিন্দু মধ্যবিত্ত সমাজ দেখল, একটা মুসলমান মধ্যবিত্ত রাজনীতিক সমাজ ও তার আন্দোলন জন্ম নিয়েছে (১৯০৭-২১)। সে আন্দোলনেরও পিছনে আছে মুসলিম রিনেইসেন্স, রিফর্মেশন্—কিন্তু তা জন্মে উত্তর ভারতে, স্যর সৈয়দ আহমদের সঙ্গে। তার বাহন উর্দু; তাই বাঙালী মুসলমান সেই মুস্‌লিম রিনেইসেন্স-রিফর্মেশনেরও প্রত্যক্ষ অংশীদার হল না। অথচ ঘটনা-পরম্পরার আঘাতে বাঙালী মুসলমানও বল্‌কান্ যুদ্ধ (১৯১২) ও মহাযুদ্ধের (১৯১৪-১৮) পরে এসে গেল রাজনীতি-ক্ষেত্রে শক্তি হিসাবে। ভারতবর্ষের, বিশেষত বাঙলার মুসলমানের বিলম্বিত রিনেইসেন্স ও বিলম্বিত রিফর্মেশন তার নতুন জাগ্রত রাজনীতিক বোধের সঙ্গে মিশে তাকেও স্বস্তি দিলে না, ভারতবর্ষের ও বাঙলার রাজনীতি-ক্ষেত্রেও হিন্দু স্বাধীনতা-বাদীদের থেকেও ১৯২০-৪০-এর মধ্যে স্বীকৃতি আদায় করে নিতে পারল না (স্মরণীয় ১৯২৮-এর '১৪ দফা,' প্রাদেশিক স্বাতন্ত্র্য বনাম এক-ভারত প্রভৃতির তর্ক ; বাঙালীর স্মরণীয় দেশবন্ধুর 'প্যাক্‌টের' ব্যর্থতা)। সেইদিক থেকেই আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলনের যে ত্রুটি জম্‌ল, সে ত্রুটি জন্মেছিল উনবিংশ শতাব্দের রিনেইসেন্স, রিফর্মেশন ও রাজনীতি শুধু হিন্দুর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকায়।

দ্বিতীয় কথা, রামমোহনের মৃত্যুর পূর্বেই ভারতীয় রিনেইসেন্সের অন্তত গোড়াপত্তন হয়ে গেছল। একদিকে তা হয়েছিল ফোর্ট উইলিয়াম কলেজে বাঙ্গালা, হিন্দী, উর্দু প্রভৃতি ভাষায় গ্রন্থ রচনার চেষ্টায়, শ্রীরামপুরে কেরি, মার্শম্যান প্রমুখদের বাঙলার অনুশীলনে ; আর রামমোহন, খ্রীষ্টিয়ান্ পাদ্রী ও দেশীয় রক্ষণশীলদের বিচার-বিতর্কে,—সংবাদপত্র, শাস্ত্র-চর্চা, পুস্তিকা-রচনা প্রভৃতিতে ; এবং স্যর উইলিয়ম জোন্‌স্, কোলব্রুক প্রভৃতিদের সংস্কৃতের জ্ঞানভাণ্ডার আবিষ্কারে। এ সবের মধ্য দিয়ে দেশীয় জ্ঞান ও চিন্তার উদ্বোধন শুরু হয়। কিন্তু আসলে, আমাদের 'রিনেইসেন্সের' প্রধান আশ্রয় হয় সেদিন হিন্দু কলেজ ; আর কতকাংশে ডেভিড হেয়ারের শিক্ষা-প্রয়াস ও ডফ্ সাহেব প্রমুখ পাদ্রীদের শিক্ষাবিস্তারের চেষ্টা। এদিকের বনিয়াদ পাকা হয়ে গেল যখন এ যুগের বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হল—পলাশীর এক শ' বছর পরে, সিপাহী বিদ্রোহে ভারতীয় সামন্ত শ্রেণীর শেষ পরাজয়ের মুখে। এক কথায় রিনেইসেন্সের এই অবলম্বনকে

বলতে পারি পাশ্চাত্য শিক্ষা দীক্ষা, মানে, তখনকার 'বিদেশীয় ভাববাদ'। এইটি মনে রাখাও দরকার।

সেই শিক্ষার মূল রূপটি মনে রাখাও তারপর দরকার। এ-শিক্ষা আসছিল প্রধানত ইংরেজি ভাষার মারফতে, তাতে স্বভাবতই ইংরেজি সাহিত্যের ঐশ্বর্যভাণ্ডার আমাদের তখনকার বিদ্যার্থীদের সামনে উন্মুক্ত হল; সেক্সপীয়র, মিল্টন থেকে বায়রন্ পর্যন্ত এই অমর স্রষ্টাদের রস আস্বাদন করে যে কোন মানুষের পক্ষে মাতাল হওয়া সম্ভব। কিন্তু এ-শিক্ষা শুধু এই সাহিত্যের সংবাদই দিল না, দিল আরও অন্যান্য পাশ্চাত্য সাহিত্যের সংবাদ, দিল গ্রীস-রোম ও কতকাংশে হিব্রু চিন্তাধারা ও ঐশ্বর্যেরও খোঁজ। কিন্তু শুধু তাও এই শিক্ষানীতি নয়—এ শিক্ষানীতি পাশ্চাত্য জগতে পাশ্চাত্য জীবনযাত্রার বিকাশে উদ্ভাবিত হয়েছে, ইংরেজ তার বাস্তব ও মানসিক অভিজ্ঞতা এই শিক্ষাপদ্ধতির মধ্য দিয়ে এদেশে জেনে না-জেনে পরিবেশন করছিল। তার মানে, এই শিক্ষাপদ্ধতি শুধু ইংরেজি ভাষা শিক্ষা নয়—'খ্রীষ্টানি' শিক্ষাও নয়; এই শিক্ষার মধ্যে ছিল ইউরোপীয় রিনেইসেন্স, রিফর্মেশন এবং ব্রিটিশ গণবিপ্লব, আমেরিকান স্বাধীনতাযুদ্ধ ও ফরাসী বিপ্লব প্রভৃতির অভিজ্ঞতা; তার মধ্যে ছিল 'মানুষের অধিকারের' ('Rights of Man') বাণী; তার মারফৎ আমাদের দেশের শিক্ষার্থীরা শুনতে পেল 'গণতান্ত্রিক অধিকারের কথা, ব্যক্তিগত অধিকারের কথা, জাতীয় স্বাধীনতার কথা';—মানে, যাকে আমরা সে যুগের সভ্যতার শ্রেষ্ঠ নীতি বলে জানি—democracy, individualism ও nationalism-তার মন্ত্র। তাই এ শিক্ষায় শুধু 'ইয়ং বেঙ্গল' মাতাল হল না, 'ইয়ং বেঙ্গল' বিদ্রোহী হল। যে সমাজে তারা পরিবর্ধিত তাতে পুরনো দিনের সমাজ-নিয়ম অচল হলেও চলছে; মানুষের মত বা পথের স্বাধীনতার প্রশ্ন নেই। কাজেই এই শিক্ষাদীক্ষার বিরুদ্ধে তখন পুরনো সমাজপতিদের কাছ থেকে ঘোরতর বাধা আসবার কথা। সে বাধা এসেছিলও। সেদিনকার সেই পুরাতন ভাববাদী ও নূতন ভাববাদীদের সংগ্রাম শিক্ষাক্ষেত্রে ওরিয়েণ্টালিষ্ট ও এ্যাংগ্লিসিষ্টদের সংগ্রাম নামে পরিচিত হয়। সমাজ ও ধর্মের ক্ষেত্রে এই তর্কে রাজা রামমোহন রায় ও তাঁর আত্মীয় সভার প্রতিপক্ষ হয়ে দাঁড়ান রাজা রাধাকান্ত দেব ও তাঁর ধর্মসভা। বলা বাহুল্য, যাঁরা সেদিন নিজেদের 'প্রাচ্যপন্থী' বলতেন, তাঁরাও ইংরেজি লেখাপড়ায় কম তুখোড় ছিলেন না। রাজা রাধাকান্ত বহু বৎসর 'হিন্দু কলেজের' কর্মকর্তাও ছিলেন। কিন্তু তাঁদের আশঙ্কাও অমূলক ছিল না, তা আমরা জানি। 'ন্যাশেনালিষ্ট' কথাটা তখনো জন্মে নি, নইলে রাজা রাধাকান্ত হয়ত নিজেদের 'ওরিয়েণ্টালিষ্ট' না বলে

বলতেন একালের ভাষায় 'ন্যাশেনালিষ্ট'। কারণ 'জাতীয় ঐতিহ্য' বলতে তো একালের ন্যাশেনালিষ্টদের মত তখনকার ওরিয়েণ্টালিষ্টরাও বুঝতেন, তখনকার প্রচলিত হিন্দুধর্ম, হিন্দু আচার-অনুষ্ঠান। নতুন শিক্ষার ফলে এই প্রচলিত ধর্ম, আচার-বিচার যে ভেসে যাবে, ধর্মে, সমাজে শেষে রাষ্ট্রেও যে বিপ্লব অনিবার্য হয়ে পড়বে, শিক্ষানুরাগী ও বিচক্ষণ রাধাকান্ত দেব প্রমুখদের তা বুঝতে বাকী ছিল না। বাস্তব চক্ষেও তাঁরা দেখ্‌তে পেলেন 'ইয়ং বেঙ্গলের' বিদ্রোহ—অবস্থাপন্ন ও মধ্যবিত্ত ঘরের সন্তান-সন্ততিরা পিতৃপুরুষের সব আচার-ব্যবস্থা উড়িয়ে দিচ্ছে। এই পিতৃপুরুষেরাও সবাই ভূদেব বাবুর পিতার মত ব্রাহ্মণ পণ্ডিত, আচার-নিষ্ঠ ছিলেন তেমন নয়। রাধাকান্তের ধর্ম সভার নেতারাও সবাই তেমন ছিলেন না। বরং তাঁরা সাহেবদেরই প্রসাদে ভাগ্যবান্ হয়েছেন, ইংরেজদেরই তল্পীদার উমেদার শ্রেণীর লোক, সাহেব সুবাদের আফিসে-হৌসে যান, নিজেদের বাড়িতেও সাহেব-সুবাদের খানাপিনা দেন;—একটা আহেলি সাহেবি ধরণও তাঁরা এজন্য গ্রহণ করেছেন, আবার তার সঙ্গে টিকিয়ে রাখছেন পুরনো 'ধম্ম-কম্ম', আভিজাত্য। মানে বৈদেশিক ধরণ-ধারণ বৈষয়িক জীবনযাত্রায় তাঁরা অগ্রাহ্য করেন না, তবে বৈদেশিক ভাববাদ তাঁদের কাছে অবাঞ্ছিত। কারণ, তাঁরা বুঝছেন—এ ভাববাদ এলে ইংরেজের প্রসাদ-পুষ্ট তাঁদের নিজেদের সেই আধা-সামন্ত জীবনযাত্রা বাতিল হয়ে যাবে, তাই তাঁরা স্বার্থ-বুদ্ধি ও ধর্ম-বুদ্ধি দু-এর দ্বারা প্রবুদ্ধ হয়েই তখনকার 'রিনেইসেন্সের' মুখে পাথর-চাপা দিতে চেয়েছিলেন। তখনকার কাগজপত্রের পাতা খুললেই দেখতে পাব, তখনকার "হিন্দু জাতীয়তাবাদী" রাজা রাধাকান্ত প্রমুখদের তখনকার 'অবাঞ্ছিত বৈদেশিক ভাববাদের' বিরুদ্ধে ধর্ম-যুদ্ধ। সে স্তরে যুদ্ধটা হয়েছিল আধা-সামন্ত অভিজাতদের পক্ষ থেকে ধনতান্ত্রিক নতুন শিক্ষাদীক্ষার বিরুদ্ধে, মানে—democracy, individualism ও nationalism-এর বিরুদ্ধে; রিনেইসেন্সের বিরুদ্ধে, রিফর্মেশনের বিরুদ্ধে এবং রিভোল্যুশানের বিরুদ্ধে;—এইটাই এক্ষেত্রে স্মরণীয়। রাজা রাধাকান্ত প্রমুখেরা ইংরেজি লেখাপড়া, ইংরেজি বোল-চাল নিজেরা আয়ত্ত করেছিলেন—ওরিয়েণ্টালিষ্ট রামকমল সেনের পুত্র ছিলেন কেশবচন্দ্র,—তাঁরা ইংরেজি আদব কায়দাও জান্‌তেন। তাঁদের প্রাচ্যানুরাগের পিছনে কতটা জাতীয় আত্মমর্যাদা বোধ ছিল, বুঝা যায় না। কিন্তু রাজনীতিক বোধ ছিল না। সিপাহী বিদ্রোহের পর রাজা রাধাকান্ত ডিপুটেশন নিয়ে গিয়ে ইংরেজ শাসকদের জানিয়েছিলেন—ইংরেজ রাজার তাঁরা খাঁটি ভক্ত। তাঁদের আপত্তি ছিল শুধু এই—ইউরোপের শিক্ষানীতি,

সাহিত্য, বিজ্ঞান পাছে সমাজেব অন্তস্তরেও প্রবেশ করে, আব সমাজেব মধ্যস্তবেব লোকদেব সেই "স্বাধীনতাব" মন্ত্র মাথা গুলিয়ে দেয়।)

রাজা বাধাকান্ত দেব পবাজিত হলেন। কিন্তু আজ বোধ হয় তাঁর মুখে কৌতুকেব হাসি ফুটে উঠ্ত, যখন দেখ্তেন—সেই মধ্যবিত্ত স্তবের সন্তান-সন্ততিরা যাঁরা ইংরাজি শিক্ষা-দীক্ষা প্রায় এক শতাব্দ ধরে অমন দু'হাতে গ্রহণ করেছেন, ইংরেজের দেওয়া সাহিত্য-রাজনীতি অমন গোগ্রাসে গিলেছেন, এবং সেই হিন্দুধর্ম বা আচার কোনটাই আব কার্যত মানেন না, তাঁরাই আজ ওরিয়েণ্টালিষ্টদের সুবে সুব মিলিয়ে 'অবাঞ্ছিত বৈদেশিক ভাববাদের' বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কবছেন! কৌতুকেব দৃশ্য বটে, কিন্তু দৃশ্যটির মানে তবু দু'কথায় বুঝে নেওয়া সম্ভব—অবশ্য বিশদ কবে বুঝে নিলে কোনোরূপ গোলমালের কাবণ থাকে না।

সমস্ত উনবিংশ শতাব্দেব বাঙ্গালীসাধনা—আমাদেব হিন্দু রিনেইসেন্স, আমাদের হিন্দু রিফর্মেশন্, আমাদের হিন্দু রাজনীতিক চেতনা—ফুটে উঠ্ল আমাদেব "স্বদেশীতে" ১৯০৫-এ। হিন্দু মধ্যবিত্ত বাঙালীব সমস্ত জীবনে বঙ্ ধরল। ব্যবসা-বাণিজ্য, শিক্ষা ও শিক্ষা প্রতিষ্ঠান, কাব্য, গান, সাহিত্য, নাট্যচিত্র, কোনো কিছু বাদ গেল না। কিন্তু তবু আমাদেব জীবনে ফুল ধরল না, ফল ফল্‌ল না। কারণটা কি? ওবিয়েণ্টালিষ্টবা বল্‌তে পাবতেন,—কাবণটা সেই 'এ্যাংগ্লিসিষ্টদের' ভুল। মানে, আমাদের রিনেইসেন্স, রিফর্মেশন, রাজনীতিক চেতনা সবই আমাদেব জনসাধাবণেব জীবন থেকে ক্রমে ক্রমে দূবে সরিয়ে নিয়ে এসেছে, 'স্বদেশী সমাজ' থেকে আমাদেব ব্যবধান বচনা কবেছে ('হিন্দুমেলা'র ও বঙ্কিম বিবেকানন্দের সাধনাব হয়ত চেষ্টা ছিল সে সমস্ত ব্যবধানই দূর কববাব, কিন্তু তা সম্ভব হয় নি। হলেও তাতে শুধু 'হিন্দু জাতীয়তা বোধ" সুদৃঢ় হত; বাঙালী বা ভারতীয় জাতীয়তাবোধ তা পুষ্ট কবত না।) আমাদের স্বাধীনতা আন্দোলন আমাদের শিক্ষিত-মধ্যবিত্তদেব আন্দোলন হয়ে উঠ্ল, তাও আবাব হিন্দু মধ্যবিত্তের আন্দোলন হয়ে বইল। দেশের সকল জাতি না জাগ্‌লে, জনশক্তিব উদ্বোধন না হলে স্বাধীনতা আন্দোলন সার্থক হবার আশা কই? এই বোধ যখন জন্মাল তখন আমবা মধ্যবিত্ত স্বদেশীবা তাল সাম্‌লাবাব চেষ্টা করলাম ভিন্ন পথে—"প্রভূত লোকের সাধনা যখন পাচ্ছি না, তখন জনকয় লোকেব সর্বস্ব পণ দিয়ে স্বাধীনতা লাভ কবা যায় না?" সেরূপ আত্মদানে মহিমা ও সান্ত্বনা আছে,—তা আমাদের সকলেই স্বীকার কববেন। যাঁরা নিজেদের ও নিজেব পুত্রকন্যাদের

সেদিনকার এই বিপ্লববাদীদেব প্রভাব থেকে সযত্নে বক্ষা করছিলেন, তাঁরাও গান্ধীবাদী ও কংগ্রেস আন্দোলনেব অপেক্ষা এই বিপ্লববাদীদের বেশী গুণগ্রাহী ছিলেন। অবশ্য এই গুণ গ্রহণ অনেকেই করতেন গোপনে, এবং করতেন্ একটু দূরে থেকে—দ্ব্যর্থবোধক কবিতায়, গল্পে। কিন্তু স্বাধীনতার আন্দোলন তাঁদেব সেই প্রশংসায় অগ্রসব হয় নি। ১৯২১-২২-এ অসহযোগেব আন্দোলনে তাই বিপ্লববাদীদেরই যেন চোখ খুলে গেল, সাধাবণকে বাজনীতিব দিকে টানবাব সুযোগ এল, হিন্দু-মুসলমানের বিভিন্ন জাতীয় চেতনা এবার একযোগে চলবে, মনে হল। তবু সেই ঐক্যের পথ আবিষ্কৃত হল না ; আবাব জনতাব অভাব-অভিযোগ তাব দাবী-দাওয়া, এ সবকে কেন্দ্র কবেই যে জনতাব আন্দোলন গডতে হবে, কংগ্রেসও তা বুঝতে পারল না। বিশেষত মুসলমানের বিনেইসেন্স ও রিফর্মেশন্ (যা উত্তরাপথেব উর্দু ভাষাকে আশ্রয় করে স্যর সৈয়দ আহম্মদের পবে উন্মেষিত হয়, বাঙলায় যা খেলাফত আন্দোলনেব পর পথ খুঁজে পায়) আব মুসলমানের রাজনীতিক চেতনা একইকালে তাঁদেব ও আমাদেব মাথা গুলিয়ে দেয়।

১৯৩০-এ আব একটি আন্দোলন তবু এল—সাধারণেব মন তা ছুঁয়েও ছুঁতে পারছে না বোঝা গেল। তা বুঝেই করাচীতে কংগ্রেস জনস্বার্থকে স্বীকার করতে অগ্রসব হয়ে এল। এই ১৯০৫, ১৯২১-২২, আব ১৯৩০—৩১, তিন-তিনটি বাজনীতিক আয়োজনের মধ্য দিয়ে বিপ্লবী-স্বাধীনতাকামীবও চোখে একটা মূল রাজনীতিক সত্য পরিষ্কাবহয়ে উঠ্ল ; তা এই যে, স্বাধীনতা আন্দোলনেব পিছনে বিপুল জনশক্তিকে সংগঠিত কবতে হবে। কিন্তু তা কববাব পথ কি ?—বিপ্লবী চেতনা নিজেব ব্যর্থতা ও অভিজ্ঞতা থেকেই তার উত্তব খুঁজে পেল—জনস্বার্থকে কেন্দ্র কবেই সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী স্বাধীনতা আন্দোলনকে সংগঠিত কবতে হবে। বিপ্লবীর দৃষ্টিতে তাব সমস্ত প্রশ্নেব একমাত্র উত্তব : জনশক্তি, জনমত। সেই উত্তর অনুসবণ কবেই আবাব বুঝ্ল সে—মুসলমান জনশক্তিব সঙ্গে হিন্দু জনশক্তিব ঐক্য চাই ; বুঝ্ল, আমাদের জাতীয়তা 'হিন্দু জাতীয়তা'রূপে গড়ে ওঠায় 'মুসলিম জাতীয়তাকে' তা সময় মত (১৯২০-৪০-এ) বুঝে নিয়ে স্বাধীনতা অন্দোলনে নিজেব সহযোগী করে নিতে পাবে নি ; সেই স্বাধীনতা আন্দোলনেব তাগিদেই আজ ১৯০৫-এর স্বাধীনতা-কামীদেরও তাই মুস্লিম স্বাধীনতা আন্দোলনেব, মানে পাকিস্তানেবই স্বরূপ বুঝ্তে হবে, তাকেও যথাসত্য স্বীকার করতে হবে, আব গড়তে হবে যুক্ত জনশক্তিব আন্দোলন। এই উত্তব অবশ্য বিপ্লবী তাব তিন তিনটি আন্দোলনেব অভিজ্ঞতা ও জন-সংযোগ থেকেই সঞ্চয় করেছে ; এই উত্তবই

জোগাল তাকে পৃথিবীর চলন্তকালের ইতিহাস। ১৯১৭-র পরে পৃথিবীতে সোশ্যালিষ্ট বিপ্লবের যুগ দেখা দিল, তার আঘাতে বাঙলার বিপ্লবীদের কাছে—এবং পণ্ডিত জওহরলালের কাছেও—ক্রমে ক্রমে পরিষ্কার হয়ে গেল এই সত্য যে, স্বাধীনতার পক্ষে আসল শক্তি জনগণ, আর স্বাধীনতার পক্ষে আসল সংগঠন-পদ্ধতি এ দেশের বহুজাতিক ঐক্য এবং জনস্বার্থকে ভিত্তি করে জনশক্তির সংগঠন।

কিন্তু ঠিক এইখানেই এসে বিপদে পড়ে গেল শিক্ষিত মধ্যবিত্তের জাতীয়তাবাদ। যারা রাধাকান্ত দেবের সমস্ত গোঁড়ামি ভেঙে এসেছে, উনবিংশ শতাব্দের সাধনার যারা সৃষ্টি, বাঙলা দেশে তারা "১৯০৫-এর" পরেও ১৯২০-তে স্বাধীনতা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিল। কিন্তু তারা মনে মনে চরকা ও অহিংসাকে স্বীকার করতে পারে নি। আর তখনকার হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত জন-বিক্ষোভ দেখে কেমনতর অস্বস্তি বোধ করেছে—জনশক্তির সঙ্গে নিজেদের ব্যবধান তারা দূর করতে পারে নি। ১৯২০-র পরে এই মধ্যবিত্তদের পক্ষ থেকে তাদের সাহিত্যিকরা (১) আত্মগোপন করতে চান ধার-করা সিনিসিজমে ও যৌনচিত্রে, মানে বৈদেশিক ভাববাদে নয়, জীবন-বিরোধী ভাববাদে; কিংবা (২) 'পথের দাবীর' মত দিশাহারা বিদ্রোহবাদে। কিন্তু (৩) খাঁটি বিপ্লববাদ পথ খোঁজে নজরুলের অপরিস্ফুট বিদ্রোহ ও বিপ্লবী প্রেরণায়। স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে সেদিন নজরুলই ছিলেন প্রধান কবি—দেশবন্ধু ও সুভাষচন্দ্র তাঁকে তাই সম্বর্ধিত করছিলেন; কিন্তু "সাহিত্যিকরা" তাঁর রাজনীতিক উৎসাহের জন্য করছিলেন তাঁকে পরিহাস। তাঁরা বুঝেছিলেন, নজরুলের বিপ্লবী উদ্দামতা মধ্যবিত্তের চিন্তা ও স্বার্থের খাত ছাড়িয়ে বন্যার বেগে ছুট্‌ছে; কাজেই তার বিরোধিতা করাই মধ্যবিত্তের প্রয়োজন। সেই প্রয়োজনেই আজ ১৯০৫-এর বৈপ্লবিক প্রেরণা প্রয়াস এই কালে যখন সম্পূর্ণতা লাভ করতে যাচ্ছে—হিন্দু-মুসলিম জনস্বার্থকে অবলম্বন করে, জনশক্তিকে উদ্বুদ্ধ করে,—তখন ঝিমিয়ে-পড়া মধ্যবিত্ত শিক্ষিত ও সেই তাদের পিছিয়ে-পড়া মুখপাত্র লেখকরা নিজ নিজ বৈষয়িক ও শ্রেণীগত স্বার্থে চমকিত হয়ে চিরকালের প্রতিক্রিয়ার ধুয়া তুলছেন—"অবাঞ্ছিত বৈদেশিক ভাববাদ" দেশে এসে গেল।

কিন্তু ঠিক এই কালেও স্বাধীনতা আন্দোলনের সঙ্গে যাঁরা 'নিগূঢ় ও নিবিড়' যোগ রেখেছেন সেই সাহিত্যিকরাই 'ধাত্রীদেবতার' পরে লিখ্‌ছেন 'গণদেবতা', লিখ্‌ছেন 'পঞ্চগ্রাম', লিখ্‌ছেন 'মন্বন্তর',-লিখ্‌ছেন 'কবি',—মানে লোক-জীবন,লোক-সংস্কৃতি, তার অবজ্ঞাত রূপ ও স্রষ্টারা তাঁদের চোখে অপাংক্তেয় নয়। এমন কি 'শুভ্র-বংশেও' তেমনি

'শুভ্র' আবির্ভূত হচ্ছে—যে 'অবাঞ্ছিত বৈদেশিক ভাববাদে' দেখছে শুভ্রতার সম্পূর্ণতা। আপত্তিটা তাই 'বৈদেশিক ভাববাদ' নিয়ে নয়—দেশের জনশক্তির জাগরণে, নিজের দেশের জনতার বিরুদ্ধে। তাই এ-আপত্তির যারা প্রবক্তা তারা জন-সংস্কৃতির, মানে, খাঁটি বাঙালী সংস্কৃতির—তার পল্লীগীতির, যাত্রা, কথকতার, লোকশিল্পের উদ্বোধনেও অস্বস্তি বোধ করে—পাছে জন-সংস্কৃতির মধ্য দিয়ে জনমন ও জনশক্তি জাগ্রত হয়। ওকালতি তাদের ঊনবিংশ ও বিংশ শতাব্দের মধ্যবিত্ত স্বাধীনতাবাদীদের জন্যও নয়, বিংশ শতাব্দের হিন্দু মধ্যবিত্ত জাতীয়তাবাদের স্বপক্ষে। কি করে দেশের সচেতন মনকে বিক্ষিপ্ত ও বিভ্রান্ত করবেন, তাই তাঁদের চিন্তা; কারণ, দেশ ও বিদেশের জীবন-ধারা ও ভাবধারা আজ জনতাকেই যে দিনে দিনে সচেতন করে তুলছে। তাই কখনো তাঁদের যুক্তি বাঙালী 'ব্লাড থিওরি', কখনো 'হিন্দু জাতীয়তা', কখনো বা 'বিদেশীয় ভাববাদ'।

তবু এই 'অবাঞ্ছিত বৈদেশিক ভাববাদটা' কি?—বোধ হয়, সমাজতন্ত্রবাদ বা সাম্য-বাদ। তা অবশ্য ভাববাদ নয়, বস্তুবাদ। তার দেশ নেই; তবু তা 'বৈদেশিক'; একটি দেশে তার বিকাশ চলেছে। 'অবাঞ্ছিত' তা নিশ্চয়ই—কেননা, তাতে ব্যক্তিস্বার্থের ক্ষতি হয়; শ্রেণী বৈষম্য ও ধন বৈষম্যের বিলোপ তাতে অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এক কালে যে কারণে রাজা রাধাকান্তদেব ও অভিজাতবর্গ ইংরেজি শিক্ষাদীক্ষাকে প্রতিরোধ করতে চেয়েছিলেন, আজ সেই ইংরেজি শিক্ষিত মধ্যবর্গই আবার সেই কারণে নতুন কালের অমোঘ সত্যকে বাধা দিতে চাইছে। সে কারণ—এই মধ্যবিত্ত লেখকের স্বশ্রেণীর স্বার্থ, এমন কি, অনেকাংশে ব্যক্তিগত স্বার্থও। তফাৎ যে দু' যুগে আছে তাও স্পষ্ট। প্রথমত, রাজা রাধাকান্ত ইংরেজি শিক্ষারীতির বিরোধী ছিলেন; একালের প্রতিক্রিয়াবাদীরাও ইংরেজির বিরোধী নয় (কারণ তাঁরাও সে দিনের রাধাকান্ত দেবাদির মত ইংরেজি শিক্ষিত, এবং কথায় কথায় ইংরেজি নজিরই উদ্ধৃত করেন)। এঁরা বিরোধী ইংরাজ ভিন্ন অন্য বিদেশী জাতির সাহিত্যের, অভিজ্ঞতার, ইতিহাসের। ব্যাপার এই, এক শ' বছর আগে ইংরেজই ছিল ধনিকতন্ত্রের অগ্রগণ্য জাত। আজ এক শ' বছর পরে ইংরেজরা সাম্রাজ্যবাদী হিসাবে সভ্যতার এক বড় বাধা; আর সভ্যতার নেতৃত্ব চলে গেছে এশিয়া সীমান্তের আধা-প্রাচ্য জাতিদের হাতে—কেউ বা তারা ইউক্রেনের অধিবাসী, কেউ বা অধিবাসী উজবেগিস্তানের। এক শ' বছর ধরে ইংরেজ সাম্রাজ্যবাদ ও তার শিক্ষাদীক্ষায় আমাদের মধ্যবিত্ত সমাজ পুষ্ট হয়েছে, আজ তারা স্বভাবতই Anglophil; ইংরেজের মারফৎ না পেলে কোনো

সাহিত্য কোনো চিন্তা, কোনো সমাজনীতিক সত্যই স্বীকার করতে পারে না। অথচ গত যুদ্ধের সময় থেকে,—রবীন্দ্রনাথের নোবেল প্রাইজ পাওয়ার পর থেকেই রবীন্দ্রনাথ ও অন্যান্য মনস্বীদের আশ্রয় করে পৃথিবীর অন্যান্য জাতির জীবন ও সাহিত্যের খবর আমরা অনেক বেশি পাচ্ছি। ফ্রান্স, নরওয়ে সুইডেন ও শেষে রুশ সাহিত্য আমাদের নতুন করে রসতৃষ্ণা জাগিয়ে তোলে। ব্রিটিশ সাম্রাজ্য-দাসদের পক্ষে এটাও বড়ই আপত্তিকর, এইরূপ 'বৈদেশিক ভাববাদ' তাদের নিকট প্রথমত এ জন্যই অবাঞ্ছিত। দ্বিতীয় কারণটি আরও মৌলিক, তা আমরা দেখেছি। রাজা রাধাকান্তদের দেখছিলেন বৈদেশিক ভাববাদে তাঁদের অভিজাত শাসিত আধা-সামন্ত সমাজ ভেঙে যাবে। একালের শিক্ষিতরা দেখছে—জনশক্তির উদ্বোধন হলে,—পরে সমাজতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা হলে,—তাদের মধ্যবিত্ত স্বার্থ, চাকরি, সম্পত্তি, আরাম, বিলাস, সাম্রাজ্যবাদের প্রসাদে পাওয়া সমস্ত সম্পদ—উবে যাবে। যাবে কি, তাঁরা দেখছেন, তা যেতে বসেছে। এখনি তো মানুষ জানতে চায়, পৃথিবী কোন পথে যাচ্ছে, অবাঞ্ছিত বৈদেশিক কোন 'ভাববাদের' বলে বাঞ্ছিত বৈদেশিক ধনিকতন্ত্রের উচ্ছেদ করছে। ভারতীয় স্বাধীনতা আন্দোলনকে জয়যুক্ত করতে হবে কি করে—সাধারণ লোক তা জানতে এত উদগ্রীব যে, অনুরূপ বইএর পর্যন্ত বাজারে কাটতি হয় কম।

গোপাল হালদার

প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলন

"প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের দ্বাবিংশতিতম অধিবেশন এবার কাণপুরে ২৪শে, ২৫শে ও ২৬শে ডিসেম্বর হইবে। ডাঃ শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্র নাথ সেন মহাশয় অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতি, রায় সাহেব শ্রীযুক্ত কালিচরণ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় প্রধান কর্ম-সচিব নির্বাচিত হইয়াছেন।

সম্মেলনের সময় বাংলা সাময়িক পত্রিকাগুলির একটি প্রদর্শনী হইবে। সমস্ত বাংলা দৈনিক, সাপ্তাহিক, পাক্ষিক, মাসিক ও অন্যান্য পত্রিকার পরিচালকবর্গের নিকট নিবেদন, তাঁহারা যেন নিজেদের পত্রিকার একটি সংখ্যা শ্রীযুক্ত দীপেন্দ্রনাথ সরকার, বিহার হেরাল্ড, প্রভাতী অফিস, পোঃ কদম কুঁয়া, পাটনা, এই ঠিকানায় পাঠান।

গাঁতা

কঠিন শোকার্ত মাঠে কোথা সেই ফসলিয়া ঢেউ!
উপবাসী মাঠ এই, এখানে কে দিল দ্বীপান্তর?
এদের জানিনা কিছু, আমাকেও চেনে না তো কেউ।
কথার বেসাতি করি, এ যে দেখি কাজের বন্দর।

এখানে লাঙলমুখে বিদীর্ণ যে ভাষার যন্ত্রণা
যাচে এই বন্ধ্যা মাটি, সে চাওয়ার তর্জমা কোথায়?
কী তুচ্ছ এখানে লাগে সাধা-স্বরে প্রাণের বন্দনা!
খামারে তো প্রাণ কাজে, গানে প্রাণ শহুরে কোঠায়।

তবু তো আপন স্বার্থ ক্যাঙ্গারুর উদর-কোটরে
চকিত ভয়ের শব্দে নিরাপদে দিল না আশ্রয়।
শয্যার সমুদ্রে ভেসে নাবিকের আমগ্ন প্রহরে
সুরভি দ্বীপের অঙ্গে মেলে কোথা প্রাণের সঞ্চয়!

দ্বীপ থেকে দ্বীপান্তরে কালের কয়েদী আমি ঘুরি।
সাবেকী আয়েস নেই গিলে-করা পাঞ্জাবীতে, পানে;
বেপরোয়া শান্তি গেছে, জমে না সে হাই-তোলা তুড়ি।
অথচ শিকড় সরু, আঁটে না কঠিন বর্তমানে।

খুঁজেছি সাহস তাই, যেন এই হারানো জগতে
কাজের গাঁতায় মিশে ভরে দেই কঠিন খামার
জীবনের খুশি নাচে ধানঢেউ সবুজের স্রোতে।
সবুজে অবুঝ মন! কথাকাজে খেয়া-পারাপার
রেখে যাবে এ জীবনে ভারমুক্ত যা কিছু আমার।

মণীন্দ্র রায়

ঘুম নেই

নির্জন অন্ধকারে পথ-চলার শেষ নেই,
নেই নেই। নেই তো দিন—অন্ধ, দিক্‌ভ্রান্ত।
সন্ধ্যার মরীচিকাও রুক্ষ দিবা-স্বপ্নেই
শ্রান্ত। এখন সে-ও শ্রান্ত।

তূর্যের দিগন্তের ডানা-নাড়ার শব্দ—
কান নেই। তবু তো মন অন্ধকারে চল্‌বেই।
ঠিক্ ঠিক্ পথ-চলায় দূরের কোন্ অব্দ
টিক্ টিক্—মিল্‌বে সে, মিল্‌বেই।

স্তব্ধ। কখন সেই দিগন্তের চিহ্ন
জ্বল্‌ছে—আগুন এক, আর্তরব সাম্‌নেই।
ঘুম নেই ঃ দিঙ্‌নাগের গর্ব হোক্ ছিন্ন।
ঘুম নেই, সূর্যদেব, ঘুম নেই।

মঙ্গলাচরণ চট্টোপাধ্যায়

যতীন্দ্র সম্বর্ধনা

গত ৩রা ডিসেম্বর, কলিকাতার বঙ্গ সাহিত্য প্রতিষ্ঠানের পক্ষ থেকে কবি যতীন্দ্রমোহন বাগ্‌চী মহাশয়কে সম্বর্ধিত করা হয়। রবীন্দ্রযুগের প্রধান কবিদের মধ্যে যাঁরা জীবিত, যতীন্দ্রমোহনই তাঁদের মধ্যে এখন বয়োজ্যেষ্ঠ। তাঁর বয়স ৬৬ বৎসর। মানপত্রের উত্তরে কবি সেদিন সকলকে অন্তরের কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, 'যে স্নেহ প্রেম করুণা, যে দেশপ্রীতি আমার অধিকাংশ রচনার বিষয়বস্তু, তা আমার মেকি বা ফাঁকি ভাব-বিলাস নয়; তা আমার অন্তরের বস্তু। দেশের দুঃখ দৈন্য দুর্দশা ও মানুষের প্রতি ভালোবাসা আমি অন্তরের মধ্যে গভীরভাবেই উপলব্ধি করেছি—প্রকাশ সম্বন্ধে যতই অক্ষমতা থাক্।" কবির আন্তরিকতাই তাঁকে প্রকাশের ক্ষমতাও জুগিয়েছে। আর আমরা তাই কবি যতীন্দ্রমোহনকে দেশবাসীর সঙ্গে জানাচ্ছি আমাদের প্রীতি ও শ্রদ্ধা।

কুকুর

রাত শেষ হ'য়ে এসেছে—তবু অন্ধকার কাটে নি। শেষ বর্ষার ছেঁড়া টুকরো মেঘে অন্ধকার ঘন হ'য়ে আছে আকাশে। সেই ক্ষান্তবর্ষণ অন্ধকারে মহকুমার সদর থানা থেকে বেরিয়ে এল গুটিকয়েক অস্পষ্ট মূর্তি নিঃশব্দে—ঘাড়ে বন্দুক।

ইসমাইল আসছিল আগে আগে। কয়েক পা এসে হুড়মুড় ক'রে হুমড়ি খেয়ে পড়ল মাটিতে।

—হুঁশিয়ার।...

বিশ্রী গালাগালি দিয়ে ইসমাইল উঠে দাঁড়াল।

পেছন থেকে টর্চের আলো এসে পড়েছে তিন জনের। কয়েকটা কুকুর সরে গেল আলো থেকে অন্ধকারে। স্ত্রীলোকের আধখাওয়া মৃতদেহ একটা পড়ে আছে ইসমাইলের পায়ের কাছে। তিনটে টর্চের আলো ঝলকে ওঠে তার ওপরে। সেই আলোয় চিনতে পারে সকলে: বোবা বুড়ীটা মরেছে এত দিনে—থানার সুমুখে নিঃশব্দে বসে থাকতো যে রাস্তার পাশে—আর মাঝে মাঝে চেঁচাত দুর্বোধ্য ভাষায়।

—মাগী মরেছে এইখেনে এসে। ক্রুদ্ধ ইসমাইল বুটের ঠোক্করে সরিয়ে দিল সেটাকে রাস্তার ওপর থেকে।

তারপর আবার চলতে শুরু ক'রল ওরা।

পেছন থেকে, একজন ঠাট্টা করে ইসমাইলকে: থানা থেকে বেরিয়েই মাটি নিল ইসমাইল—তাই বোধ হয় ভেবে চিন্তে দূরে কোথাও আর পাঠানো হ'লো না তাকে।...

—সকলকে এবার মাটি নিতে হবে।—বিকৃত কণ্ঠে জবাব দিল ইসমাইল, মেয়েছেলেরা মরছে এখেনে—ওদিকে কিন্তু তাল ঠুকছে মরদেরা গাঁয়ে গাঁয়ে। ধান নেই—চাল নেই, বারুদ হ'য়ে আছে সব, ক্ষেপে ছুটে আসবে যেদিন—দেখবি। মনে পড়ে আর বছরের কথা—ঠিক এমনি দিনে?—

ইসমাইলের কথার জবাব দেয় না কেউ। নিঃশব্দে ওরা এগিয়ে চলে, আর মনে পড়ে সকলের: এমনি দিনে বিগত বছরের কয়েকটা দিন। পিঁপড়ের সারির মত গ্রামের ভেতর থেকে বেরিয়ে এল চাষাভুষোর দল—ঘিরে ফেলল যত থানা-আর সরকারী কর্মশালা। তারপর আগুন জ্বলে ওঠে। সে আগুন এবারও জ্বলে উঠতে পারে আবার দুর্ভিক্ষের শূন্যতায়—বিগত বছরের উদ্‌যাপন দিনকে স্মরণ ক'রে। ধান নেই, চাল

নেই, বিত্ত নেই, সম্পদ নেই—নিরন্নের দল ছুটে আসতে পারে ব্যর্থ কর্মশালাগুলির দিকে। তারই সম্ভাবনায় প্রতিরোধ প্রস্তুতির জন্যে সদর থেকে ছোট ছোট দলে চলেছে সেপাই-শাস্ত্রীর দল গ্রাম-গ্রামান্তরের ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে। নিঃশব্দে হেঁটে চলেছে ওরা। উৎসুক ইসমাইলের কিন্তু যাওয়া হ'লো না কোথাও শহর ছেড়ে। ক্ষুব্ধ ইসমাইল চলেছে ওদের সঙ্গে সঙ্গে দুঃখ ক'রতে ক'রতে।

··· কি আছে এই শহরে !···

— আবার একটা।···থম্‌কে দাঁড়াল ইসমাইল—ব'লল, জ্বালতো টর্চটা।

— একটা নয়—দুটো।

আধখাওয়া দুটো মৃতদেহ পড়ে আছে ইসমাইলের পায়ের কাছে। তীব্র টর্চের আলোয় একটা কুকুর খেঁকিয়ে উঠল বীভৎস ভাবে।

— শালার কুকুর — দেতো বন্দুকটা।

— শহরে তো রইলিই কুকুর মারার জন্যে। পেছন থেকে একজন ঠাট্টা করে ইসমাইলকে, আমাদের টোটা আর বাজে খরচ ক'রে লাভ কী।···

— হুঁ, নিয়ে যা—যাদের ওরা খাচ্ছে, তাদের জন্যে লাগবে সেখানে। ইসমাইল বলে—কণ্ঠে তার বিদ্রূপ আর ক্ষোভ, কাল থেকে এখানে আমার কুকুর মারার পালা —হুকুম হ'য়ে গেছে আজ।

মৃতদেহ দুটোর পাশ কাটিয়ে আবার এগিয়ে চল্‌ল ওরা।

শহরের শেষ প্রান্ত পর্যন্ত ইসমাইল এল ওদের সঙ্গে সঙ্গে। তারপর ওদের ছোট দলটি চলে গেল গ্রামমুখো পথ ধরে। ইসমাইল দাঁড়িয়ে রইল সেইখানে। কান পেতে শুনতে লাগল তাদের অস্পষ্ট কণ্ঠস্বর—হাসি আর কথা। প্রতিষ্ঠা···প্রতিপত্তি··· সুযোগ···গণেশপ্রসাদ—এলোমেলো অসংখ্য চিন্তা তোলপাড় করে ইসমাইলের মনের মধ্যে। ওরা চলে গেল অনেক দূরে ইসমাইলের চেনা এক গ্রামে—যে-গ্রাম পচা ঘায়ের মত কুৎসিত হ'য়ে আছে ইসমাইলের মনের মধ্যে, যে-গ্রাম থেকে সতীর্থ গণেশপ্রসাদ অফিসার হ'য়েছে গত বছরের বিক্ষোভের সুযোগে। মনে পড়েঃ সন্ধ্যার অন্ধকার লাল হ'য়ে উঠেছে আগুনে, দম বন্ধ হ'য়ে আসে ধোঁয়ায়—জনতার আকাশ ভাঙা চীৎকারে বুক কাঁপে—হাত কাঁপে। পাশে গণেশপ্রসাদ শুধু নির্মম লক্ষ্যভেদ ক'রে চলেছে।···

ভোর হ'য়ে গিয়েছে। অদূরে ছিটে বেড়ার বিরাট চালা ঘরটার দিকে তাকাল ইসমাইল। শহরের এক পাশে ওই দুর্ভিক্ষের সরকারী খাদ্য-ভাণ্ডারে রাত্রির পর রাত্রি,

ধরে পাহারা দিতে হবে তাকে। ওখানে ক্ষিপ্ত জনতা ভেঙে পড়বে না কোনো দিনই। আর শ্মশানের মত এই শহর। সোজা সড়কের এখানে ওখানে মৃতদেহ ঘিরে কুকুরের জটলা। রাত্রির অন্ধকারে কুকুরগুলো ঝাঁপিয়ে পড়ে নিরন্নদের অবসন্ন দেহগুলোর ওপরে—ছিঁড়ে ছিঁড়ে খায় সারারাত। ওই কুকুরগুলোকে গুলি ক'রে মারতে হবে—মনে মনে বলে ইসমাইল, আর তারা চলে গেল দলের পর দল··· প্রতিষ্ঠা···সুযোগ···সতীর্থ গণেশপ্রসাদ।

ক্ষুব্ধ মনে যাওয়ার জন্যে পা বাড়াল ইসমাইল।

এমন সময়ে একটা লোক সুমুখে এসে দাঁড়াল তার, মুখ ভরা খোঁচা খোঁচা দাড়ি—দৃষ্টিতে তার উদ্‌ভ্রান্ত আকুতি।

—সেলাম সিপাইজী।

ইসমাইল তাকাল সন্দিগ্ধ দৃষ্টিতে।

লোকটা ভয়ে দু'পা পেছিয়ে গেল। আমতা আমতা ক'রে যা ব'লল, তার অর্থ: সে একটা কাজ চায়। সরকারী খাদ্যভাণ্ডারের গুদামে অনেক কুলি কাজ করে—সারাদিন ধান-চাল বয়। ইসমাইলকে দেখেছে সে সেখানে পাহারা দিতে। যদি একটা কাজ ক'রে দেয় সেখানে···স্ত্রী-ছেলেমেয়ে তার না খেতে পেয়ে মরছে।···

ব'লতে ব'লতে লোকটা ইসমাইলের পা চেপে ধরে মাটিতে বসে পড়ল।

—দয়া করো সিপাইজী। কুলিদের হেডম্যানকে শুধু একটু বলে দিলেই হবে।

লোকটার দিকে তাকিয়ে সমস্ত রক্ত যেন মাথায় গিয়ে ওঠে ইসমাইলের। সবল পা দিয়ে ছুঁড়ে দেয় সে রুগ্ন লোকটাকে রাস্তার এক পাশে। মনে মনে বলে: এরা—এরাই অসংখ্য জীবনের বিনিময়ে গণেশপ্রসাদকে জীবনের একধাপ উঁচুতে তুলে দিয়েছে। সে-জীবন ইসমাইলের আজ নাগালের বাইরে। শুধু তার সঙ্কীর্ণ জীবনের মধ্যে একটা পশু অন্ধ আবেগে ছট্‌পট্ করে। লোকটাকে মেরে ফেলতে ইচ্ছে হয় ইসমাইলের।

···লোকটা ঝাঁপিয়ে পড়ছে না কেন তার ওপর!···

ইসমাইল চলে গেল শহরের দিকে। লোকটা সেই দিকে চেয়ে রইল কিছুক্ষণ—তারপর খোঁড়াতে খোঁড়াতে অদূরের সরকারী গুদামের দিকে এগিয়ে গেল। ধান আর চাল বোঝাই ট্রাকের সারি এসে দাঁড়িয়েছে সেখানে। কাজ সুরু হ'য়েছে

দিনেব। কুড়ি-বাইশজন কুলি মাল খালাস ক'রছে গাড়ী থেকে। একটি বৃদ্ধ কর্মচারী দরজার সুমুখে বসে বসে বস্তার ওজন লিখ্‌ছে।

সেই কর্মচারীটির দিকে তাকিয়ে বসে রইল লোকটি, অপেক্ষা ক'রতে লাগল— হেডম্যান হবিব খাঁ কখন ভেতরে গিয়ে ঢোকে।

সে সুযোগ এল। খোঁড়াতে খোঁড়াতে গিয়ে দাঁড়াল সে কর্মচারীটির সুমুখে। তারপর এক নিঃশ্বাসে ব'লে ফেল্‌ল তার সব কথা—তার অনশন—তার স্ত্রী-ছেলেমেয়ের কথা।

—নাম কি তোর ?

—মাধব।

—আচ্ছা—আসিস্ তবে কাল থেকে। হবিবকে বলে দেবো আমি। রোজের ভাগ কিন্তু দিতে হবে আমাকে দু'আনা করে। তুই পাবি আট আনা।

—তাই হবে বাবু।

আনন্দে মাধবের মুখটা অদ্ভুত এক রকমের দেখায়।

তারপর হবিব এসে ঝাঁপিয়ে পড়ল দমকা হাওয়ার মত। ব'লল, ওকি এই জুলুমের কাজ পারবে ?

—কেন ?

—ওতো খোঁড়া।

—চিনিস্ ওকে ?

—একই গাঁয়ের লোক—চিনি বৈ কি। আর বছর স্বদেশী হাঙ্গামের সময় থানা ভাঙতে গিয়ে গুলি এসে লেগেছিল পায়ে। তারপর পালিয়েছিল কোথায়।...

—পুলিশে ধরে নি ?

তারা ধরে নি মাধবকে—মাধবের মত চাষাভুষোকে। কেন ধরে নি—জানে না মাধব। শুধু জানে—গ্রামে খাদ্য নেই, অর্থ নেই—বিশ্বসংসারজুড়ে শুধু নেই নেই, আর জীবনজুড়ে নেমে এসেছে আদি-অন্তহীন একটা হতাশা! এই একটা বছরের মধ্যে সংসার তছ্‌নছ্ হ'য়ে গিয়েছে তার—বলদ গিয়েছে, জমি গিয়েছে—খোঁড়া হ'য়ে গিয়েছে একটা পা। কোনো দাম আজ আর নেই তার। দু'হাতে বৃদ্ধ কর্মচারীটির পা জড়িয়ে ধরল মাধব ব্যাকুল ভাবে :

—বাঁচান বাবু।...

—আরে···খোঁড়াকে নিয়ে ক'রবো কি! বের ক'রে দে···বের ক'রে দে—এই হুবির।···

কুলিরা ঠেলে ফটকের বাইরে বার ক'রে দিল মাধবকে।

রাস্তার ওপরে মাধব দাঁড়িয়ে রইল কিছুক্ষণ বিহ্বল হ'য়ে। এর পর কোথায় যাবে সে—ভেবে পেল না। মনে পড়ল না তার গ্রামের কথা, মনে পড়ল না তার ঘরের কথা—মনে পড়ল না একবার, তার ফেরার জন্যে ব্যাকুলভাবে কেউ প্রতীক্ষা ক'রছে। আজ দু'দিন কেটে গেল তার শহরে।

তারপর হঠাৎ চমকে উঠল সে বন্দুকের আওয়াজে। তাকিয়ে দেখল, কুকুরগুলো একে একে লুটিয়ে পড়ছে আধখাওয়া মৃতদেহগুলোর পাশে—আর সকালের সেই সেপাইটা বন্দুক হাতে এগিয়ে আসছে যেন তারই দিকে। ইসমাইল আসছে—সঙ্গে আরও কয়েকজন সেপাই। হঠাৎ কেমন ভয় হয় মাধবের। সে-ও যেন মরে যাবে ওই কুকুরগুলোর মত এখ্খুনি। কয়েকমুহূর্ত সে চেয়ে রইল হতাশ ভাবে—যেন নিজেকে বাঁচাবার কোনো ক্ষমতা নেই আর তার।

তারপর হঠাৎ খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে ছুটতে আরম্ভ করল মাধব—জীবনের অন্ধ তাড়নায়—যে-জীবন মরেও মরে না।

ছুটে গিয়ে কোথাও লুকোতে চায় সে।

বৌকে দেখেও অমনি লুকোবার চেষ্টা করে মাধব। কিন্তু লুকিয়ে থাকার জায়গা নেই তার। ওই ছোট একটু শহর মাঠের পাশে—সোজা একটি সড়কের দু'ধারে তার ব্যবসা, বাণিজ্য আর সমৃদ্ধি। সেই ভিড়ের মাঝখানে দেখা হয় ময়নার সঙ্গে মাধবের—যেমন ক'রে দেখা হয় সারা দিন অসংখ্য বুনো পশু আর পাখীর।

এড়িয়ে চলে মাধব। আর মাধবের বৌ বছর চারেকের একটা চামচিকের মত ছেলেকে কোলে ক'রে অসংখ্য ক্ষুধার্তের ভিড়ে এসে মিশে গেল।

তারা ভিড় করে গুদামঘরের সুমুখে। ধান-চাল বোঝাই ট্রাকগুলো ভোর থেকে এসে সার বেঁধে দাঁড়ায়। মাল খালাসের সময় ছেঁড়া-ফুটো বস্তা দিয়ে ধান-চাল যা পড়ে মাটিতে—তাই নিয়ে কাড়াকাড়ি করে সকলে সারাদিন। আর রাত্রির অন্ধকারে কুকুরের দল ঝাঁপিয়ে পড়ে প্রতিবাদহীন ঘুমন্ত অবসন্ন দেহগুলোর ওপরে। গুলি খেয়ে মরে—তবু আসে, গ্রাম-গ্রামান্তর থেকে ছুটে আসে মানুষের সঙ্গে দিনের পর দিন—মানুষের মত, আর মরে।

মাধব আশে-পাশে ঘোরে গুদাম ঘরের, আর কি যেন ভাবে—অসংখ্য এলো মেলো ভাবনা। পাঁজরের হাড়গুলো ক্রমশ সুস্পষ্ট হ'য়ে ওঠে, মুখের দাঁড়ি-গোঁফে কেমন জন্তুর মত দেখায় থাকে।

তারপর একদিন রাত্রির গভীর অন্ধকারে হঠাৎ চোখ দুটো জ্বলে উঠল সেই জন্তুটার। নিঃশব্দ অন্ধকারে ভূতের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে দেখল সে—ইসমাইলের টর্চের আলো ময়নার মুখে ঝলকে উঠে নিভে গেল। হাসছে ময়না, এসে দাঁড়িয়েছে গুদামঘরের ফটকের সুমুখে। কোলের ছেলেটা ঘুমে ঢুলে আছে কাঁধের ওপরে।

তারপর পাশের একটা দোকানের চালার মধ্যে ছেলেটাকে সন্তর্পনে শুইয়ে দিয়ে ময়না ফটকের ভেতরে গিয়ে ঢুকল—মিশে গেল গভীর অন্ধকারে।

মাধব দাঁড়িয়ে রইল একভাবে। তারপর হঠাৎ সে চমকে উঠল একটা ক্ষীণ আর্তনাদে। গোটা তিনেক কুকুরের চাপা গোঙানিতে সে আর্তনাদ চাপা পড়ে গেল। অন্ধকারে দেখা যায় না—তবু তার মনে হয়, ময়নার শুইয়ে আসা ঘুমন্ত ছেলেটার ওপরে মারামারি ক'রছে কুকুরগুলো। অসহায় ভাবে মাধব দাঁড়িয়ে রইল ঠায়। যেন কিছু একটা ক'রতে গেলে সে শান্তিভঙ্গ ক'রবে নিঃশব্দ নিবিড় এই প্রশান্ত রাত্রির।

কিছুক্ষণ পরে ময়নার অস্পষ্ট ছায়ামূর্তি বেরিয়ে এল গুদামঘরের ফটকের ভেতর থেকে। ছেলেটাকে যেখানে শুইয়ে রেখে এসেছিল—সেখানে গিয়ে হঠাৎ একটা অস্ফুট আর্তনাদ ক'রে উঠল সে। কুকুরগুলো গ্রাস ভরা মুখে দাঁতে দাঁত চেপে গোঁ গোঁ ক'রে উঠল তাকে দেখে।

তারপর সেই সুগভীর অন্ধকারে কান পেতে শুনল মাধব—যেন একটা কান্না—খুব অস্পষ্ট চাপা একটা কান্নার সুর। বুকের মধ্যে কেমন যেন শির্‌শির্‌ ক'রে উঠল তার—কেমন যেন ভয় পায়।

ইসমাইলও শুনল সেই কান্না কয়েক মুহূর্ত উৎকর্ণ হ'য়ে—তারপর তার ভারী বুটের শব্দে চাপা পড়ে যায় সব। পায়চারী করে ইসমাইল আর ভাবে: শুধু মৃত্যু···ক্ষুধা···মৃত্যু—কি আছে আর এই শহরে! তারা চলে গিয়েছে দলের পর দল ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে ···অর্থ···প্রতিপত্তি···গণেশপ্রসাদ···যেমন ক'রে একটা বেগবান রাঙা বন্যার জল-স্রোত হঠাৎ নদীর বাঁকে বাধা পেয়ে প্রচণ্ড বেগে ঘুরতে থাকে—তেমনি ক'রে ঘোরে ইসমাইল।···এই নিঃশব্দ শহরের প্রান্তে···এই খাদ্য-ভাণ্ডারের দিকে কোনোদিন ছুটে আসবে না কেউ। হতভাগা ইসমাইল— কোথাও যাওয়া হ'লো না তার। নিজেকে

ধিক্কার দেয় ইসমাইল।…আর গণেশপ্রসাদ…আর বছরের সতীর্থ গণেশপ্রসাদ…অর্থ… প্রতিপত্তি…পুরস্কার।…

॰

পর দিন সন্ধ্যার অন্ধকারে ময়নাকে খুঁজে বের ক'রল মাধব। তারপর অনেকক্ষণ ধরে চাপা গলায় ওরা কি যেন আলোচনা করে। ময়না কাঁদে—ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদে।

ওরা বসে রইল দু'জনে গভীর রাত্রির অপেক্ষায়।

তারপর রাত্রি গভীর হ'ল। ওরা দু'জনে এগিয়ে চল্‌ল গুদাম ঘরের দিকে। কাছাকাছি এসে থম্‌কে দাঁড়াল মাধব। চাপা গলায় ব'লল ঃ

এবার তুই যা। যতক্ষণ পারিস্—দেরি করিস্।

মাধব দাঁড়িয়ে রইল। ময়না এগিয়ে গেল। গিয়ে দাঁড়াল ফটকের সুমুখে। ইসমাইলের টর্চের আলো ঝল্‌কে উঠল ময়নার মুখে। তারপর ময়না ফটক ঠেলে ভেতরে ঢুকে অদৃশ্য হ'য়ে গেল।

দুই হাতে চোখ ঘষে জানোয়ারের মত দেখে মাধব। তারপর পথ ছেড়ে খানিকটা ঘুরে সে এসে দাঁড়াল গুদামঘরের পেছনে। হাতে শুধু একটা কাস্তে।

সেই কাস্তে ঘষে ঘষে সন্তর্পণে মাধব গুদাম ঘরের ছিটেবেড়া কাটে। কিছুটা ফাঁক হ'লো কিছুক্ষণ পরে। তারপর সেই ফাঁক দিয়ে ঢুকে পড়ল সে ঘরের মধ্যে।

চালের ভ্যাপ্‌সা গন্ধ নাকে এসে লাগে মাধবের। কিন্তু দম যেন বন্ধ হ'য়ে আসছে তার, আর বুকের মধ্যে কে যেন হাতুড়ি পিট্‌ছে।

বিরাট একটা চালের বস্তা নিয়ে টানিটানি করে মাধব—যেন সেটা একটা পাহাড়। এতটুকু নড়াবার শক্তি নেই তার।

বস্তার মুখ কেটে কিছুটা চাল ফেলে দিয়ে আবার টানাটানি করে মাধব আর ব্যর্থ হ'য়ে হাঁপায়। আরও কিছুটা চাল ফেলে দিল সে।

…এত অপচয়, আঃ—এই সমস্ত চাল যদি নিয়ে যেতে পারতো সে! …

তারপর বস্তাটাকে কোনো রকমে টানা হেঁচড়া করে বাইরে নিয়ে এলো মাধব। বার কয়েক চেষ্টার পর মাথায় তুল্‌ল সেটাকে। তারপর সন্তর্পণে কোনো রকমে এগিয়ে চল্‌ল বালির ওপর দিয়ে।

কিছুটা এসে পা টলে—মাথা ঝিম্ ঝিম্ করে। দম বন্ধ হয়ে আসছে তার— পায়ের তলায় মাটি যেন নাচছে—সুমুখের অন্ধকার পথ হারিয়ে যাচ্ছে গভীরতর অন্ধকারে।

তারপর মাথার বোঝা ছিটকে পড়ল একদিকে—আর মাধব টলতে টলতে পড়ে গেল মাটিতে। অন্ধকার আকাশ আর পৃথিবী ধীরে ধীরে নিশ্চিহ্ন হ'য়ে গেল আর এক অন্ধকারে। বহু দূর থেকে যেন কুকুরের ডাক শোনা যায়, আর তাদের দ্রুত পদধ্বনি।

অন্তিম মৌসুমী রাত। অশ্রান্ত ঝিঁঝিঁ আর ব্যাঙের ডাক। মেয়েটা চলে গিয়েছে। ইসমাইল বিড়ি টানতে টানতে বন্দুকটা নিয়ে উঠে দাঁড়াল। কতকগুলো কুকুর চীৎকার ক'রতে ক'রতে ছুটে গেল গুদামঘরের পেছনের দিকে। ইসমাইল টর্চ জেলে বন্দুক ঘাড়ে এগিয়ে চলল সেই দিকে।

...কুকুর মারতে হবে তাকে...আর তারা চলে গেল দলে দলে...

মাধবের সিঁধ কাটা জায়গাটায় ইসমাইলের টর্চের আলো ঝল্‌কে উঠল, আর ছ্যাঁৎ ক'রে উঠল তার বুকটা। গণেশপ্রসাদের কঠোর মুখটা ভেসে উঠল তার চোখের সুমুখে।

...অনেক নয়...তারা আসবে না এখানে কোনোদিন...শুধু একটা...অন্তত একটাকে গুলি ক'রবে সে...এবার আর হাত কাঁপবে না—বুক কাঁপবে না।...

একটা অতিকায় যন্ত্র যেন বিদ্যুতের স্পর্শে হঠাৎ গর্জন ক'রে উঠল তার বুকের মধ্যে। টর্চের আলো ফেলল চারিদিকে ইসমাইল। কিছু দূরে কয়েকটা কুকুর জটলা ক'রছে। টর্চের আলো ফেলে শক্ত মুঠিতে বন্দুক ধরে সেই দিকে এগিয়ে গেল সে।

চালের বস্তাটা পড়ে আছে একটু দূরে। কয়েকটা কুকুরের গোঙানি আর ধারালো দাঁতের মাঝখানে ছটপট ক'রছে একটা লোক।

সেই নিঃশব্দ নিবিড় অন্ধকারে পাশাপাশি দুটি আদেশ—কুকুর আর মানুষ ...আর মৃত্যু, সব যেন এক নিমেষে গোলমাল হ'য়ে যায়। কঠিন হাতে বন্দুক ধরে কয়েক মুহূর্তের জন্যে স্তব্ধ আর বিব্রত হ'য়ে দাঁড়িয়ে রইল ইসমাইল: কাকে গুলি ক'রবে সে?—মানুষ না কুকুর? ...

—সুশীল জানা

সাধনা ও সিদ্ধি

রবীন্দ্রনাথ "পরশ পাথর" নামক রূপক কবিতাটিতে যে তত্ত্বকে বিশেষভাবে রস-মূর্ত্ত করবার চেষ্টা করেছেন তা হ'ল এই যে, সাধনা যেখানে একান্ত ও সর্ব্বস্ব হয়ে ওঠে সিদ্ধির সাক্ষাৎ সেখানে পাওয়া দুরূহ। এ বাণী রবীন্দ্রনাথের একটি বিচ্ছিন্ন উপলব্ধি নয়—কেন না এ কবির জীবনাদর্শের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে সংশ্লিষ্ট। রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদ ষোল আনা একান্তধর্ম্মী; ভিতর হ'তে যা' উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে না, তার যাথার্থ্য সম্বন্ধে কবি গভীরভাবে সন্দিহান, 'হওয়া'টাই জীবনে বড, 'করাটা' নয়। যান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে কবির অভিযোগ এই জন্য যে, যন্ত্র আত্মাকে আচ্ছন্ন করে ফেলে, ভিতরকে উপবাসী রাখে। তাই 'পরশ পাথর খুঁজে খুঁজে মরার মত আদর্শ-জীবনের আর কোন বৃহত্তর ট্র্যাজেডি হ'তে পারে না।

রবীন্দ্রনাথের আদর্শবাদে বাহ্য সাধনার প্রতি যতই কটাক্ষপাত থাক, তিনি সাধনা ও সিদ্ধিকে বিভিন্ন বলেই প্রচার করেছেন। শুধু রবীন্দ্রনাথ কেন, প্রাক্-আধুনিক মানুষের চিন্তার সমগ্র ইতিহাসের মধ্যেই পথ ও লক্ষ্য, উপায় ও আদর্শ, সাধনা ও সিদ্ধি এই সকলেরই দ্বৈতসত্য স্বীকৃত হয়ে এসেছে। আদর্শ বিশুদ্ধ হলেই উপায় শুদ্ধাশুদ্ধ বিচার হ'তে বিমুক্ত, না আদর্শের সঙ্গে উপায়কে ও ভাল-মন্দের কষ্টিপাথরে বিচার করতে হবে, এই নিয়ে মানুষের চিন্তার আজও অবধি নাই। কিন্তু আধুনিক যে জড়বাদী তাঁর কাছে এ সমস্যাই নাই—কেন না তাঁর যে জীবন-বেদ, তা'তে কোন সিদ্ধি-পরিচায়ক স্থিতিশীলতার প্রশ্নই উঠতে পারে না। বিশ্ববিধানে গতিই একমাত্র সত্য। এই গতির একটা ধারা-বৈশিষ্ট্য আছে এবং এই বিশিষ্ট গতি-ধারার সঙ্গে অভিন্ন হওয়াই মানুষ মাত্রের সাধনা। কাজেই মানুষের যা' সাধনা তা'ই তার সিদ্ধি: সাধনার বাইরে সিদ্ধির কোন রূপ নাই বা রূপ হ'তে পারে না। মানুষ এতকাল যে সিদ্ধির পরিকল্পনা করে এসেছে তা নিতান্তই যুক্তিগত। কিন্তু যুক্তির দৃষ্টি সম্পূর্ণ মায়িক দৃষ্টি, তা প্রামাণ্য হ'তে পারে না; কেননা এই দৃষ্টিতে বিশ্বব্যাপারের যে প্রকৃত মর্ম্ম—গতিশীল বিবর্ত্তন—তা'কে অস্বীকার করেই বিচার করা হয়; জড়বাদীর কাছে তাই সাধনা ও সিদ্ধি এক।

প্রশ্ন এই নয় যে, বিশ্ব-ব্যাপারে একটা প্রচণ্ড গতিশীলতা আছে কি না? আধুনিক বিজ্ঞান, আধুনিক দর্শন, আধুনিক জীবন-চিন্তা সকলেই এক বাক্যে এ তত্ত্ব গ্রহণ করবে

যে, মানব সমাজের একটা গতিশীলতা আছে—যার পরিমাণ শুধু কালের সংজ্ঞায় কিংবা জীবন-যাত্রার পরিবর্ত্তিত অবস্থার সংজ্ঞায় করা চলে না। এই ঐতিহাসিক গতিশীলতা কি আরও ব্যাপক ও অনেকখানি গভীরভাবে অর্থবান? ধরা যাক, এ কথা যাঁরা মনে করেন যে বাঙ্গালী লেখক আজও রবীন্দ্র-যুগের ফেলা নোঙরের চারদিকে জল ছিটিয়ে সাহিত্যসেবা করবেন, কিংবা এ কথা যাঁরা ধরে আছেন যে, বাংলার ঐতিহ্য-ইতিহাসে যার সন্ধান নাই তা'ই বিদেশী এবং তাই বাঙ্গালী সাহিত্যিকের পরিহার্য্য, তাঁরা সবাই যে মানবসমাজের গতিশীল বিবর্ত্তনের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করেন না, তা বলাই বাহুল্য। চিন্তার জগতে এ প্রকার ভ্রান্ত রক্ষণশীলতাকে আজ পরিহাস করা ছাড়া উপায় নেই। কিন্তু জড়বাদীর দাবী তো এখানেই শেষ হ'ল না। তিনি মানব-সমাজের বিবর্ত্তন ধারাকে প্রতিপন্ন করেই ক্ষান্ত হ'ন না, তাকে একান্ত বলে প্রচার ক'রতে চান। অর্থাৎ যেহেতু জগত ও সমাজ গতিশীল, কাজেই চিন্তার ক্ষেত্রে কোন আদর্শকে তিনি স্বীকার করেন না। সমস্যা এখানেই জটিল হয়ে দাঁড়ায়।

সমাজ ও পৃথিবী গতিশীল বলে তখনই আদর্শের প্রামাণ্য নষ্ট হয় যখন সকল পরিবর্ত্তনের মর্ম্ম গ্রহণ করা হয় একমাত্র জড়-সংজ্ঞায়। বিবর্ত্তনবাদ বা dialectic-এর সঙ্গে জড়-দর্শনের কোন সম্বন্ধ নেই এবং আদর্শের কোন বিশিষ্ট স্থিতিশীল জড়-রূপ আছে, এমন মনে করবার কোনও ন্যায্য কারণ আছে বলে মনে হয় না। আমাদের যে জীবন-দর্শন, তা'তে জড়ের প্রামাণ্য স্বীকার করি, কিন্তু সর্ব্বস্বতা স্বীকার করি না। বিশ্ব-চেতনা নিরাশ্রয় কিংবা নিরালম্ব নয়, জড়বিশ্বকে আশ্রয় করেই তার প্রকাশ, এমন কি তার সত্তাও। সমাজের একান্ত গতিশীলতা স্বীকার করেও আমরা বলি ইতিহাস ইতিহাসই, দর্শন নয়; সমাজ তত্ত্বের মূল্য স্বীকার করেও বলি, এতে যুক্তির প্রামাণ্য বিনষ্ট হয় না; জড়ের একান্ত-চঞ্চলতা মেনেও বলি, তা চেতনার রূপায়ণ মাত্র। সমগ্র বিশ্বব্যাপারের মধ্যে আছে এক অখণ্ডের সীমাহীন খণ্ডন প্রকাশ: এই কোটি কোটি খণ্ডপ্রকাশকে অখণ্ডের সূত্রে গাঁথা আছে জান্‌লেই বিশ্ব-সৃষ্টির নিত্য-রূপায়ণের প্রকৃত মর্ম্ম গ্রহণ করা চলে এবং তা' করলে মানুষের যুক্তিকে পঙ্গু হয়ে তার চিরন্তন আসন হ'তে বিদায় নিতে হয় না, কিংবা আদর্শের জড়-বিবর্ত্তন আছে বলেই তার চৈতন্য-রূপকে অস্বীকার করার মত বাতুলতার আবশ্যক হয় না; সর্ব্বোপরি সাধনা ও সিদ্ধি এক বলে প্রচার করার মত প্রোপাগ্যাণ্ডার অভিনব দার্শনিক ভিত্তি সন্ধান করে ফিরতে হয় না।

কথাটা আরও একটু পরিষ্কার করে বল্‌লেই বোধ হয় ভাল হয়। জড়বাদী আদর্শ মানে না—এই জন্য যে, সকল আদর্শের পশ্চাতেই ধরা আছে মানব সভ্যতার এমন কি বিশ্ব-বিবর্ত্তনের একটি চিরন্তন রূপ। একথা সত্য যে, যুক্তি একটা নিত্য জগৎকে মেনে চলে। যদি একথা একবার মেনে নেওয়া না যায় যে, প্রসূতি-সন্ততির পরস্পর সম্বন্ধের মধ্যে একটা চিরন্তনতা আছে তবে মাতৃস্নেহের আদর্শ-প্রচার নিতান্তই বাতুলতা। জড়বাদী ইতিহাসের সাহায্যে প্রমাণ করবার চেষ্টা করেন যে, প্রসূতি-সন্ততির সম্বন্ধের মধ্যে ঐরূপ কোন নিত্যতা নেই—বর্ব্বর সমাজে সন্তানের মাতার প্রতি যে সম্বন্ধ ঐতিহাসিক যুগে তা অন্যরূপ, সামন্ত-যুগে ঐ সম্বন্ধের যেরূপ প্রকাশ ব্যক্তিবাদী ধনিক যুগে তার আবার বিপর্য্যয়। কাজেই মাতৃস্নেহ বলে যে যুক্তি-নির্ভর আদর্শ এতকাল আমরা খাড়া করে এসেছি তা একেবারেই অবাস্তব এবং কাজেই অসত্য। উনিশ-শতকের মাঝামাঝি হ'তে বিবর্ত্তন-বাদের প্রভাবে জড-চিন্তার বাইরেও বাস্তব-চিন্তা অনেকখানি শিকড় গজিয়েছে, যার ফলে আদর্শ-বাদ জড়-দর্শনের কুঠারাঘাত ছাড়াও অনেকখানি হতবল হয়ে এসেছিল। কিন্তু জড়বাদী বাজী মাৎ করেছেন এই বলে যে, অনেক আদর্শই যে শুদ্ধ ভুল তা নয়, সর্ব্বপ্রকারের আদর্শের পরিকল্পনাই ভ্রান্ত—কেন না, আদর্শ স্থবির, কিন্তু জগৎ ও জীবন চঞ্চল।

আমাদের জবাব এই যে, সকল আদর্শের জাড়িক বা বাহ্য প্রকাশের পরিবর্ত্তন আছে কিন্তু তাই বলে আদর্শের বা আদর্শবাদের অসারতা বা অসত্যতা প্রমাণ হয় না। আদর্শের প্রকৃত সত্যতা সাম্বন্ধিক (relational), অর্থাৎ যদি স্বীকার করা যায় যে কোনও জননী ও সন্তানের মধ্যে, বা কোন বিশেষ আশ্রিত ও আশ্রয়দাতার মধ্যে, বা কোনও এক বন্ধু-যুগলের, বা কোনও স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে, কোনও দুই বিশেষ বস্তু ও ব্যক্তির মধ্যে এমন এক সম্বন্ধ আছে বা থাকা সম্ভব, যা' নির্ব্বিশেষ, যা স্থান-কাল-পাত্রের সঙ্কীর্ণতা হ'তে বিমুক্ত, তা হ'লেই আদর্শের প্রামাণ্য প্রতিষ্ঠিত হ'ল, তার বাহ্য কিংবা যুক্তিগত রূপের পরিবর্ত্তনে সে সাম্বন্ধিক চিরন্তনতা ক্ষুন্ন হয় না। বীজগণিতের অঙ্ক ভুল হ'লে কিংবা ছাপার ভুলের দরুণ সে অঙ্কের ফল বীজগণিত-প্রণেতার ফলের সঙ্গে বিভিন্ন হ'লেও যেমন বীজগণিতের "ফর্ম্‌লা"র মাহাত্ম্যহানি হয় না, তেমনি সকল সাম্বন্ধিক আদর্শ জড-প্রকাশ-নিরপেক্ষ। সঙ্গে সঙ্গে এ'ও বক্তব্য যে, জড়ের মধ্যেই সকল সম্বন্ধ নিহিত এবং এই সম্বন্ধেরও আপেক্ষিকতা আছে। ধরা যাক্ রবীন্দ্রনাথের মধ্যযুগীয় সামন্ততান্ত্রিক সমাজের প্রশস্তি-বাণী—

নির্ম্মল বৈরাগ্যে দৈন্য করেছ উজ্জ্বল
সম্পদেরে পুণ্যকর্ম্মে করেছ মঙ্গল ;

বর্ত্তমান জগতের ধনিক বৈষয়িক ব্যবস্থার সাফাই গাইতে গিয়ে আজ যদি কোন চিন্তাশীল ব্যক্তি এই মঙ্গল বুদ্ধিকে একান্ত বলে প্রচার করে ধনিক শোষণের ধ্বজা তুলতে চেষ্টা করেন, তবে যে তাঁর জীবন-দর্শন নিতান্তই ভ্রান্ত তা' বলতে আমরা কিছুমাত্র দ্বিধা করব না। প্রভু-ভৃত্যের মধ্যে যে চিরন্তন সম্বন্ধ তা কোন সমাজে কোন যুগে মঙ্গলবুদ্ধিতে গৌরবময় হ'লেও, বর্ত্তমান রাষ্ট্রের বৈষয়িক বিধানে তার উপর নির্ভর করা নিতান্তই মূঢ়তা—কেন না, মধ্যযুগীয় প্রভু-ভৃত্যের যে সম্বন্ধ, এ যুগে তা' নূতন রূপ ধারণ করতে বাধ্য। এখানে সম্বন্ধের নিত্যতা রয়েছে—বাহ্য প্রকাশের বৈচিত্র্য সত্ত্বেও।

জড়দর্শনের সঘন নির্ঘোষে নিনাদিত আকাশের তলে দাঁড়িয়ে আদর্শবাদীর এই তীব্র প্রতিবাদের দিন এসেছে, তাই অতখানি লিখলাম। এ প্রতিবাদ বৈষয়িক সঙ্ঘবাদের বিরুদ্ধে নয়, একান্তভাবে দ্বান্দ্বিক জড়দর্শনেরই বিরুদ্ধে। *

শ্রীক্ষেত্রমোহন পুরকায়স্থ

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

পূজার গল্প ও উপন্যাস

পূজা সংখ্যার চারখানি কাগজের (আনন্দবাজার, যুগান্তর, দেশ ও শনিবারের চিঠি) প্রকাশিত গল্প ও উপন্যাসের উপর আমার এ আলোচনা। এ আলোচনার উদ্দেশ্য, এর থেকে বাঙলা সাহিত্যের গতিধারা বুঝবার চেষ্টা। এ-জন্য বিভিন্ন লেখকের লেখার উপর যে মন্তব্য আমি করব সেগুলি নিতান্তই আমার ব্যক্তিগত মন্তব্য। এমন কি, আমার ব্যক্তিগত মন্তব্যও সংশোধনের অপেক্ষা রাখে। প্রায় চল্লিশটি রচনা দ্রুত পড়ে তার সমালোচনা করার মধ্যে যে ভুল ত্রুটির সম্ভাবনা আছে—তা আমিও জানি। এই কথাটি সকলকে স্মরণ রাখতে অনুরোধ জানাচ্ছি।

---

* এই প্রবন্ধের সঙ্গে যে আমরা একমত নই, তা বলাই বাহুল্য। 'দ্বান্দ্বিক জড়বাদ' কাকে বলে বলা শক্ত ; তবে আমরা 'দ্বান্দ্বিক বস্তুবাদে' মোটেই আস্থা হারালাম না। তাতে বিশ্বাস না করেও 'বৈষয়িক সঙ্ঘবাদ' সমর্থন করার মানে কি ফ্যাশিস্ত টোটেলিটেরিয়ানিজমেরই সমর্থন করা নয়? যাক্, 'পরিচয়ে' যথাসম্ভব ভিন্ন মতবাদের স্থান আছে—সীমা লঙ্ঘন না করলে। এমন কি এই মতের প্রতিবাদেরও স্থান হতে পারে—সেই একই শর্তে। সঃ, পঃ।

সমস্ত লেখাগুলিকে আমি আমার সুবিধামত তিন ভাগে ভাগ করে নিয়েছি। এক ভাগের লেখাগুলি "art for art'sake"—এই নীতি অনুযায়ী লেখা বলা যেতে পারে। আর একটি ভাগ হচ্ছে—সামাজিক সমস্যা সম্বলিত।' বৈষম্যমূলক সমাজ-ব্যবস্থায় সব সময়ে বর্ত্তমান থাকে যে সব অর্থনৈতিক, সমাজিক ও মানসিক সমস্যা, তাই নিয়ে লেখা। তৃতীয় ভাগের লেখাগুলি আমাদের দেশের বর্ত্তমান অর্থনৈতিক ও সামাজিক দুরবস্থা ভিত্তিক। এই লেখাগুলিতে লেখকদের যে তীব্র আবেগ প্রকাশ পেয়েছে—তাকেই বোধ হয় বর্ত্তমান কালের সমালোচকেরা social realism প্রভৃত বলেন।

প্রথমেই "art for art's sake" নীতি অনুযায়ী লেখাগুলি ধরা যাক। এখানে প্রথম বিচার্য্য "বনফুল"। এঁর সাহিত্যিক প্রতিষ্ঠা, শক্তি ও লিপিকুশলতা পাঠক সমাজে সুবিদিত। দুটি গল্প এঁর পড়েছি—"হিসাব" ও "একব্যক্তি"। খুব ছোট গল্প—ডবল ক্রাউন কাগজের এক পাতা বা দেড় পাতার বেশী নয়। "এক ব্যক্তি-"র মধ্যে আছে স্বামী-স্ত্রীর যৌবনে লেখা পত্রের সঙ্গে বার্দ্ধক্যের মানসিক অবস্থার পার্থক্য বর্ণনা—প্রেম খুব বেশী না থাকলেও কেবল দীর্ঘকাল একত্র বাসের ফলে যে Companionship গড়ে ওঠে এই উক্তির সাফাই। পরে স্বামী মারা গেলে স্ত্রী স্বামীকে মিডিয়ম্-এর মারফত আনিয়ে দেখলেন, স্বামী তাঁকে একদম চিনতে পারছেন না। গল্পের মানে বোধ হয় এই যে, সাধারণভাবে যাকে মানুষ আপনার বলে জানে, ও মেনে নেয়, হয়ত অন্তরের অন্তরে সে-মানুষকে সে না চাইতেও পারে, না চিনতেও পারে। তাই প্রমাণিত হত মৃত্যুর পরে দু'জনার দেখা হলে, হয়ত একজনের খুব মনে পড়ত আগেকার পরিচয় আর জনের কিছুতেই মনে পড়ত না সে-সব। এতই তা ছিল তার বাইরের পোষাকী জিনিস। দ্বিতীয়, 'হিসাবে' আছেঃ গরীবের বয়স্কা মেয়ে যার পিছনে পাড়ার ছেলেরা ঘুরে বেড়াতো—তাকে এক বিপত্নীক বড় সরকারী চাকুরে বিয়ে করেছে। শ্বশুরবাড়ী যাওয়ার দিন ট্রেনের কামরায় উঠতে বোধ করি ভূত দেখে চীৎকার করে উঠল, "না, না আমি নিজে বিয়ে করি নি—জোর করে বিয়ে করেছে" ইত্যাদি। এর পরে তাকে একটা মাদুলী দেওয়ায় রোগ সেরে গেল। বনফুল ডাক্তার; হয়ত তিনি দেখে থাকবেন, Psycho-pathological case—যাকে hysteria বলা হয়। তাই নিয়ে গল্প লেখার তাগিদ বোধ করেছেন তিনি। যাই হোক—plot, element of surprise ও বর্ণনাবিন্যাস বিচার করে এই গল্প দুটিকে কিছুতেই 'বনফুল্-এর' প্রথম শ্রেণীর রচনা বলা চলে না—

বরং ছোট ছোট ছেলেমেয়েদেব জন্য সুলিখিত ভূতের গল্পের পর্য্যায়ে ফেলা যায়। এই ধবণেব case history—psycho-analyst-দের বই-এ বহু পাওয়া যাবে। কিন্তু তাই বলে কি এ-গুলি বস-সাহিত্য বলা চলে? কারণ art for art's sake নীতি মেনেও সুখপাঠ্য রস-সাহিত্য সৃষ্টি হয়, একথা আমি জানি। এর পরে শ্রীযুক্ত জগদীশ গুপ্তের 'মাধব' গল্পেব উল্লেখ কবা যেতে পারে। গাঁয়ে বাঘ এসেছে—ঠাকুব ঘবে বিধবা মায়েব ঘাড় ভেঙ্গে দিয়ে গেল। মা মৃত্যুর আগে বলে গেলেন—তাঁব বহুকাল আগে মৃত সন্তান মাধব দেখা দিতে এসেছিল। এমনি ধরণেব গল্প ছোট বেলায় ঠাকুবমাদেব কাছে অনেক শোনা যায়। বনফুল ও জগদীশ গুপ্তেব এই গল্প ক'টি পড়তে পড়তে মনে হয়—একটি অদৃশ্য উৎপাত, তা ভূত-প্রেত হোক আব হিষ্টিবিয়া হোক—মানুষের জীবনে অনর্থ ঘটাচ্ছে; তত্ব হিসাবে এই কথাটি এই তুই লেখকের মনে চেপে বসেছে। অন্যান্য দেশেব লেখকদেব ক্রমপবিণতি দেখে বলা যায়, এই ধরণেব ঝোঁক অর্থাৎ সুস্থ ও সবল মানুষেব বাজ্য ছেড়ে অসুস্থ ও বিকাব-গ্রস্থ মানুষের অবচেতনালব্ধ বিষয়বস্তু নিয়ে কাববাব কবতে কবতে লেখকেরা মারাত্মক রকমে obscuritanism-এ চলে যেতে পাবেন। এবং এই মতবাদ প্রগতিশীল সাহিত্যেব জীবনধর্ম্ম নয়।

এব পরে এই দফায় আরো যে-কটা গল্প পড়েছি তা আমার কাছে সব দিক থেকেই বৈচিত্র্যহীন বলে মনে হয়েছে। তবু নাম কবে যাই : অচিন্ত সেনগুপ্তের "লাইনবাবু ও মালদিদি," বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের 'নিরুদ্দেশ', আর বিভূতি বন্দোপাধ্যায়েব 'বুধোর মায়ের মৃত্যু'। লাইনবাবু ও মালদিদি—অল্প বয়সে প্রেমে পড়া—প্রেম জমছে না বলে সন্ন্যাসীব কাছ থেকে মেয়ে মন্ত্র নিল—দূবে সবে যেতে হবে আকর্ষণ বাডাবাব জন্য। শেষ পর্য্যন্ত মেয়েটিব বিয়ে হল বেলের মালগুদামেব বাবুব সঙ্গে এবং ছেলেটি চাকুরী পেয়ে হল সেই ষ্টেশনেব পুলিশেব লাইনেব দাবোগা। এতে অচিন্ত্য-সুলভ ভাষা ও বর্ণনাব প্যাঁচ বেশ আছে, কিন্তু গল্প অত্যন্ত জলো। তবু ঐ সব প্যাঁচের জন্য লোকে পড়বে। কিন্তু বিভূতি মুখোপাধ্যায়ের "নিরুদ্দেশ" আমি পড়তে এত ধৈর্য্য হাবিয়েছি যে, আমি অবাক হই। বিভূতিবাবুর লেখায় সাধাবণত একটি মিষ্টি কৌতুক বস থাকে, তাতে পাঠকেব আকর্ষণ বাডবারই কথা। আমি এতগুলি লেখা পড়তে পেবেছি কিন্তু এবাব ওঠালেন। তাঁব লেখা 'নিরুদ্দেশ' আব শেষই হয় না। অর্থাৎ একে তো বেশ বড লেখা, তার উপব কোন বকমে interest পাচ্ছিলাম না। তবু শেষ

করবার তাগিদেই আমি শেষ করেছিলাম। হয়তো আমার গল্প বোধ কম—সেইজন্য আমি লেখকের কাছে মাফ চাইতে প্রস্তুত। বিভূতি বন্দোপাধ্যায়ের "বুধোর মায়ের মৃত্যু"-তে আছে: বুধো নামে 'নিম্নশ্রেণীর' একটি লোকের মা পুরী তীর্থ করতে গেল, সেখানে মৃত্যু হল। দেশের লোকেরা খবর পেয়ে বললে, "মাগীটা খারাপ ছিল;—তবু বরাৎ ভাল, তীর্থে মরতে পেলে।" কিন্তু বুধোর মা মরার সময় তার আঁচলে বাঁধা সাতকুড়ি টাকার হিসাব চেয়েছিল, বোধ করি পাণ্ডারা সেগুলি মেরে দেয়। এও অতি সাধারণ গল্প। অন্য কোন দিক দিয়েও প্রতিভার কোন লক্ষণ দেখা যায় না। তবে গল্প বড় নয় বলে শেষ করা যায়। দেবীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর 'পিণ্ডিতত্ত্ব'-ও এই ভাগে আসছে। লেখাটাকে রসরচনা বলা হয়েছে। কতকগুলি পাঁড় মাতাল, তাদের একজন আর একজনের বাড়ী নিজের ছেলের জন্য মেয়ে দেখতে এসেছে, মদের ঘোরে মেয়ের সঙ্গে অসভ্য ইয়ারকী করছে এবং নিজেই তাকে বিয়ে করতে চাইছে, এই হল গল্প। নিছক মাতলামীর হল্লা ও বেলেল্লাপণা দেখানোই যদি রসরচনা সৃষ্টি হয় তা হলে সে রস থেকে আমরা অনেকেই বঞ্চিত। অপর পক্ষে সুবোধ বসুর "কথামন্ত্রী" রসরচনা হিসাবে বেশি কিছু না হলেও এর থেকে সুরুচিকর এবং সুখপাঠ্যও বটে। যুদ্ধ সংবাদ নিয়ে বহু দেশের প্রচার বিভাগগুলি যে সব মিথ্যা ও 'মনোবল রক্ষক' সংবাদ পরিবেশন করে তাকে ব্যঙ্গ করে লেখা। তবে "সাফল্যের সহিত পশ্চাদপসরণ" প্রভৃতি কথাগুলি লেখক যে ভাবে ব্যবহার করেছেন তা' দৈনিক কাগজ পড়ার সময় ঐগুলি দেখে যত মজা পাওয়া যেত তা'র বেশী দিতে সক্ষম হন নি। দশাননের "কুপোকাৎ" ও এই ধরণের গল্প। যুদ্ধ, রেশনিং, কন্ট্রোল, মাছের চড়াদাম, বাড়ী ভাড়া না পাওয়ার অসুবিধা নিয়ে রসরচনা করা হয়েছে। সত্যি এ সব রস রচনার জিনিস—যে বসে হাসি পায়, আবার চোখে ও জল আসে। কিন্তু তেমন রসিকতার সার্টিফিকেটই বা কই?

এরপর দ্বিতীয় দফার লেখায় আসছি। বরাবরকার সামাজিক সমস্যা নিয়ে লেখা ভালবাসার সমস্যা, দেহগত যৌবনের সমস্যা, সাধারণ অভাব-অভিযোগের সমস্যা নিয়ে বর্তমান বৈষম্যমূলক সমাজে যে সব ছোট ছোট "pin pricks" বহু মানুষের জীবনে বেদনার সঞ্চার করে রয়েছে, ব্যর্থতার সোপান হয়ে দাঁড়িয়েছে এইগুলি তাই নিয়ে লেখা। অথচ যা লেখা হয়েছে তা গত ৫০ বছরের যে-কোন সময়ে লেখা যেত, এবং বলাও যেত সামাজিক সমস্যামূলক

সাহিত্য। অন্যদেশের সাহিত্যে এমনি লেখা ভূরি ভূরি আছে। আমাদের দেশেও আছে।

এখানে সর্ব্বপ্রথম উল্লেখযোগ্য শ্রীযুক্ত প্রেমেন্দ্র মিত্রের "জ্বর"। একজন বিবাহিত বেকার লোক—চাকুরী খুঁজতে বেরিয়েছেন—পথে পুরানো প্রেমিকার সঙ্গে সাক্ষাৎ। মহিলাটি বর্ত্তমানে বড় সরকারী চাকুরের স্ত্রী; আদর করে ষ্টিমারে কেবিনে বসিয়ে খাওয়ালেন; পুরানোদিনের গল্পও বোধ করি করলেন। জানা গেল যে, মহিলাটি ষ্টিমার থেকে নামবার আগে কি একটা জিনিসের দাম দেবার জন্য তাঁর মনিব্যাগটি ভদ্রলোকের হাতে দিয়েছিলেন এবং ভদ্রলোকটি শেষ মুহূর্ত্তে সেটা ফিরিয়ে দেওয়ার সময় নিজের মনিব্যাগটি (যাতে অল্প কয়েকটি টাকা আছে) ফেরৎ দিলেন। পরে চাকুরী না পেয়ে জ্বর হয়ে ভদ্রলোক শ্বশুর বাড়ী ফিরে এসেছেন। ঔষধপত্রের দাম দিতে গিয়ে যখন ১০০৲ টাকার করে কটা নোট বার করা হ'ল—তখন শ্বশুর বেকার জামাইকে গালি গালাজ দিতে সাহস করে নি। মহিলাটি ষ্টিমার ছাড়ার সময় ভাবমুগ্ধস্বরে বলেছিলেন—"আর যেন দেখা না হয়"। যৌবনের প্রেমের পুরানো স্মৃতি থেকে বর্ত্তমানের দারিদ্র্যময় জীবনে এই কয়েকটি টাকার দাম যে বেশী—এটা লেখা থেকে বেরিয়ে আসছে। তবু এই গল্প একটি নিখুঁত ছোট গল্প—এবং তার বেশী বলা উচিত নয়। বর্ত্তমান অর্থ নৈতিক সংকট বোঝাবার জন্য গল্পের গোড়ায় কয়েকটি কথা আছে বটে—কিন্তু সমস্ত গল্পের মধ্যে তা অবাস্তব। তবে একটা কথা বলা দরকার। প্রেমেন বাবু প্রথম শ্রেণীর লেখক—তাই তাঁর কাছে পাঠকের দাবী অনেক! কিন্তু সে দাবী তিনি মেটান নি। বরং, পূজা সংখ্যায় লিখতে হয়, নাহলে সম্পাদক মানে না—এমনি একটা ভার এই লেখার মধ্যে আছে। এর পরে আছে অচিন্ত্য সেনগুপ্তের 'বাঁশবাজি'। এরও প্রথমে বর্ত্তমান অর্থনৈতিক সংকটের কথার আভাস দেওয়া হয়েছে। গল্পটি হচ্ছে। একটি মুসলমান বাঁশবাজী খেলোয়াড় তার দুটি ছেলেকে বাঁশের মাথায় ঘুরিয়ে খেলা দেখায়। ছেলে দুটি না খেতে পেয়ে দুর্ব্বল হয়ে যাওয়াতে খেলতে চায় না—বড়টার পেটে ঘা হয়ে গিয়েছিল; কিন্তু ছোটটা ভয়ে কাঁদতে লাগলো—খেলবে না। বড়টা শেষ পর্য্যন্ত খেলতে গেল। কিন্তু দুর্ব্বলতার ফলে খেলার মাঝে নিজে হুমড়ি খেয়ে পড়ল—ক্ষতশরীর আরো ক্ষতবিক্ষত হয়ে গেল। তখন ছোট ছেলেটা ভয় পেয়ে কাঁদে "এবার আমাকে খেলাবে"। কারণ খেলা না দেখে কেউ পয়সা দেয় না। তাই খাওয়া জোটে না। দরিদ্র ও অভুক্তের

প্রতি সমবেদনা নিয়ে নিষ্ক্রিয় দর্শকদের উপর প্রচ্ছন্ন অভিশাপ দেওয়ার চেষ্টা অচিন্ত্য বাবু করেছেন, এতে হৃদয়হীনতার কথাও প্রমাণ করেছেন। কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার সঙ্গে কোন সম্পর্ক না স্থাপন করতে পারাতে গল্প দুর্ব্বল হয়ে পড়েছে। এবং খানিকটা অস্বাভাবিক হয়েছে। যেমন দর্শকেরা জানে, বুড়ো ভাল খেলা করে অথচ ছেলে দুটি অভুক্ত বলে খেলতে সাহস পাচ্ছে না; তবু তারা আগে পয়সা দিতে চায় না কেন? তারা যেন স্থিরসংকল্প নিয়ে বসে আছে, দেখবে কেমন করে বুড়ো হুমড়ি খেয়ে পড়ে যায় আর ছেলেটা আঘাত পায়। হৃদয়হীনতার এত বড় কারণ দেখাবার মত পরিবেশ সৃষ্টি করা উচিৎ ছিল। এই গল্পটি যে খারাপ তা বলছি না, কিন্তু অচিন্ত্যবাবুর আর একটি গল্প "বৃত্তশেষ" আরো ভাল হয়েছে। সাধারণ লোক থেকে সাধারণ পেয়াদা, নাজির, মুনসেফ, হাকিম, ম্যাজিষ্ট্রেট থেকে মন্ত্রীদের ঘুষ দেওয়ার যে বিষাক্ত চক্র আছে এবং শেষ পর্য্যন্ত মন্ত্রীরা জনসাধারণের ভোট নেওয়ার জন্য যে ঘুষ নিয়ে আসেন—এই বিষয়ের উপর গল্পটি লেখা। লেখাটা একটু sketchy বটে;—হয় তো বাঁশবাজীর মত ঠাস বুনোনি নয়,—তবু পড়তে রসভঙ্গ হয় না।

অমলা দেবীর "চাওয়া ও পাওয়া" লেখাটা এই দফায় ফেলেছি। এটি 'আনন্দ বাজারের' অনেকগুলি পাতা জুড়ে আছে। অথচ আমার মনে হয়েছে লেখাটি অত্যন্ত সাধারণ। একটি তরুণ ডাক্তার—গ্রামে গিয়ে প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তারের অশিক্ষিত মেয়ে, গ্রামের মাস্টারের অর্দ্ধশিক্ষিতা মেয়ে, আর হেডমাস্টারের সুশিক্ষিতা বি-এ পাশ করা শালীর সঙ্গে প্রায় একই সঙ্গে প্রেম করার চেষ্টা করছে, এবং শেষ পর্য্যন্ত বি-এ পাশ করা মেয়েটিকে নিয়ে কলকাতায় পালিয়ে এসে বিয়ে করল। লেখাটির মধ্যে গ্রামের কতকগুলি 'টাইপ্' বেশ ফুটেছে—যেমন প্রতিদ্বন্দ্বী ডাক্তার—তার মোসাহেব এবং গ্রামের এক ধরণের প্রৌঢ়া বিধবা, যারা প্রতিবেশী বড় লোকের বাড়ীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে, তার ছেলে মেয়েদের বিয়ের ঘটকালী করে; এর ওর বাড়ীর হাঁড়ির খবর রাখে এবং পরের কুৎসারটনা করে জীবিকা অর্জ্জন করে। কিন্তু এ-সমস্ত বাদ দিলে আসলে ঐ গল্পের নায়ককে বহুবল্লভ সাজাতে গিয়ে, এবং আধুনিক শিক্ষিতা মেয়েছেলে ধরার বিশেষজ্ঞ, এই প্রমাণ করতে গিয়ে গল্প জলো হয়েছে। প্লটের কোন বিশেষত্ব নেই, কোনো আকর্ষণে টেনে নিয়ে যেতে চায় না—এবং প্লটের কোন সমস্যাও নেই। তবে অন্য দুটি মেয়ের

একজন দ্বিতীয় পক্ষ ও অপরটি ফাজিল স্বামী খেয়ে যে ভুগলো এব জন্য পাঠকের মনে বেদনা সৃষ্টি করার একটা চেষ্টা আছে। গরীব ও অর্দ্ধ শিক্ষিতা মেয়ের দুর্গতির জন্য এবং মেয়ের বাপেদের জন্য খুব সাদাসিদে ভাবে দুঃখ প্রকাশ করা হয়েছে—এই মাত্র। ভাল গল্প হয় নি। এক ধরণেব চবিত্র-জ্ঞান ও চবিত্র চিত্রই উপন্যাসটিব আসল জোর।

এইভাগে সুশীল জানার 'বন্দেমাতরম্' লেখাটিও আসে। লেখক এই গল্পে গত আগষ্ট আন্দোলনেব কথা উল্লেখ করেছেন, কিন্তু আসলে গল্প হল দুটি বেশ্যার জীবন নিয়ে। একজন দারোগাবাবুব রক্ষিতা ও সন্তানসম্ভবা। আন্দোলনের সময় দারাগা বাবুকে আশ্রয় দিয়েছিল বলে ঘর পুড়িয়ে দেয় স্বদেশীরা। তাই স্বদেশীর উপর তার রাগ। আর একজন একটি তরুণ স্বদেশীকে পুলিশেব হাত থেকে লুকিয়ে আশ্রয় দিয়েছিল বলে তার উপর তাব এক রাতের মায়া জন্মে গেছে। কিন্তু গল্পের সমস্যা হল— দারোগা বাবু চম্পট দিয়েছেন, রক্ষিতাটি ভাবছে, ছেলে নষ্ট কবে ব্যবসা শুরু করবে, না মা হবার সুযোগ নেবে। এই হল সঙ্কট। আমার মনে হয়, সমাজচ্যুত মেয়ের সন্তান নিয়ে এই গল্পে অনর্থক 'বন্দেমাতবম' আব 'স্বদেশী ব্যাপার' টেনে আনা হয়েছে। বরং এই জায়গাতে পুবা সমস্যাটাকে ধরে গল্প জমানোর চেষ্টা করা উচিত ছিল। এরপব প্রবোধ সান্যালের 'ব্যর্থ'—খুব ছোট গল্প। আমাব মতে প্রবোধ বাবু এখানে অত্যন্ত দুর্ব্বলতাব পরিচয় দিয়েছেন—লেখক হিসাবে। একটি মেয়ে তাব ত্রিশ বছর পার হবাব পরে দেখছে, তার প্রেমপ্রার্থীরা একে একে তাকে ছেড়ে চলে যাচ্ছে। তাই বার বাব তার প্রশ্ন: ত্রিশেব পর কি মানুষের যৌবন থাকে না যাতে কবে লোকে তাকে ভাল বাসতে চাইবে না—তাকে নিয়ে বেড়াতে চাইবে না, ইত্যাদি। শেষ পর্য্যন্ত তিনি বৈরাগী হযে গেলেন এবং যাওয়ার দিন এক পুরানো প্রেমার্থীকে হাওড়া ষ্টেশনে আনিয়ে বলে গেলেন দুঃখের কথা। অর্থসর্ব্বস্ব সমাজেব নানা বাধা-বিপত্তিব জন্য অল্পবয়সে যাবা বিয়ে করতে পাবে না—তাদের মনে এই ধবণের সমস্যা আসে সত্যি কিন্তু একে গল্পে রূপায়িত কববাব জন্য যে সমস্ত অবস্থা ও পারিপার্শ্বিক তৈবী করা দরকাব, তা না থাকাতে সমস্ত ব্যাপারটা একটা স্থূল যৌনসমস্যা হয়ে দাঁড়িয়েছে—সেই "একদিন যখন আমি নারী ছিলাম" গোছের এবং তাও দেড় পাতার মধ্যে। ডাক্তাব অঘোবনাথ ঘোষের 'অব্যাহতি' বলে একটা গল্পেব কথায় এবার আসছি। নর্ত্তকীর সঙ্গে বড় লোকের ছেলেব প্রেম ও বড় লোকেব ম্যানেজাব এই উৎপাতে শঙ্কিত হয়ে কর্ত্তার সন্তানের মঙ্গল কামনায় নর্ত্তকীর দুয়ারে ধর্ণা দিয়ে বোঝালেন তাব প্রেমাস্পদকে,

ভালবেসে সে কি সর্ব্বনাশ করেছে। কাজেই তার ভবিষ্যতের জন্য নর্ত্তকী ভালবাসায় ত্যাগধর্ম্মই শ্রেষ্ঠ মেনে নিয়ে ভাল একটা নাচের মাথায় "প্রিয় তুমি এলে না—এখনো এলে না" বলতে বলতে বিষ খেয়ে মারা গেল। যেমন মোটা প্লট, তেমনি লেখা, এর বেশী বলার দরকার নেই। কাগজের দুষ্প্রাপ্যতার দিনেও অনেক পূজা-সাহিত্যের ব্যবসায়ী এত কাগজ পেয়েছেন যে, কি করে পাতা পোরাবেন তা ঠিক পান নি, এই মনে হচ্ছে। এর পর নন্দদুলাল সেন-গুপ্তের 'বন বিড়াল' (বালীগঞ্জের বড় লোকের বাড়ীর মেয়ের সঙ্গে 'বন বিড়াল' প্রাইভেট টিউটরের লুকিয়ে বিয়ে) এবং আশাপূর্ণা দেবীর 'প্রস্তাব' (ত্রিশ বছর বয়সে বিগত যৌবনা অবিবাহিতা পিসিমার কাছে যে প্রেম নিবেদন করতে এল—দেখা গেল তা পিসিমার জন্য নয়—পিসিমার ফ্রকপরা ভাইঝির জন্য): প্রথমটি পড়ে বালীগঞ্জের হুঁসিয়ার মেয়ের মায়েরা আরো সতর্ক হবেন, এবং শেষেরটায় বুড়ো ঠাকুরমারা খুশী হবেন। মানে গল্প হিসাবে এঁদের স্বপক্ষে এই বলা চলে। আমার এক বন্ধু প্রায়ই বলেন, "দেখ, এমন গল্প লিখবে যা অল্প শিক্ষিতা সেকেলে ঠাকুরমা দিদিমারা পর্য্যন্ত বেলা তিনটার সময় হেঁসেলের কাজ সেরে নাকে চসমা এঁটে পড়বেন এবং আনন্দ পাবেন; অথচ তোমার উদ্দেশ্যে ভিড়বেন।" যাঁদের ঠাকুরমা দিদিমা আছেন, আমি তাঁদের অনুরোধ করছি, তাঁরা যেন কথাটা একবার এই সব গল্প দিয়ে পরখ করে দেখেন।

এবার আমি শেষ দফায় আসছি। এই দফায় আমি ১৪।১৫টি গল্প পড়েছি। সবগুলির বিস্তৃত বর্ণনা করব না। যদিও আমি মনে করি এই গল্পগুলি সকলের পড়া উচিত বাংলা সাহিত্যের বর্ত্তমান ঝোঁক বোঝবার জন্য। এইগুলির লেখক হলেন তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, মাণিক বন্দ্যোপাধ্যায়, মনোজ বসু, নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়, অমলা দেবী, সরোজকুমার রায় চৌধুরী, আবুল কালাম শামসুদ্দিন, নরেন্দু ঘোষ ও রবীন্দ্রবিনোদ সিংহ। একটা কথা আমার খুব গর্ব্বের সঙ্গে স্মরণ করিয়ে দেওয়ার আছে। তা'হচ্ছে এই যে, এঁরা প্রায় সকলেই প্রগতিমূলক সাহিত্য ও জীবনে আস্থাবান, প্রথম চারজন তো সেরূপ প্রতিষ্ঠানের (ফ্যাসিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ) সক্রিয় সভ্য। বাংলার সাহিত্যের একটি বলিষ্ঠ ও গঠনমূলক সাহিত্য সৃষ্টির সচেতন চেষ্টায় এঁরা যে রকম ভাবে এগিয়েছেন তাতে শুধু আমরা নয়, সমস্ত পাঠক শ্রেণী আনন্দিত হবেন এবং নিজেদের সাহিত্যের ভবিষ্যতের জন্য আশান্বিত হবেন।

আমার মতে এবারকার পূজার লেখায় অবিসংবাদিভাবে নেতৃত্ব করছেন তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়। কারণ হল এই যে, বাংলা সাহিত্যিকের জীবনে আজ যে যোগাযোগ ঘটেছে তাঁর সদ্ব্যবহারের সমস্যা এখনো মিটে নি। বাংলার সাহিত্যিকরা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই টাইপ সৃষ্টি করে নিঃশেষিত হয়ে যান। ঘটনার সাক্ষাৎ কদাচিত ঘটে, ঘটনার মধ্য দিয়ে সে সব টাইপ কি বিশেষ রূপ নিচ্ছে তা দেখেন না—জীবনেই নেই ঘটনা তা তাঁরা কি করবেন? ধীরে ধীরে সাধারণের অলক্ষিতে জীবনের ভিত্তি যে খসে পড়ছে তা দেখে ফুটিয়ে তোলা কষ্টসাধ্য। তবু এই ধরণের সমাজবোধ সাহিত্যে আসবার জন্য কিছুদিন হল চেষ্টাও করছিল। কিন্তু ইতিমধ্যে এল যুদ্ধ—গ্রাম ছাড়ানো denial policy, জাপানী আক্রমণ, রাজনৈতিক সংকট, বন্যা ও দুর্ভিক্ষ ইত্যাদি। এত অল্প সময়ের মধ্যে এত বড় বড় ঘটনা পৃথিবীর খুব কম জায়গায় ঘটেছে। সাহিত্যিকদের জীবনেও এত বড় সুযোগ আর কখনো আসে নি। ঘটনা এবং চরিত্র সৃষ্টি একত্রে যিনি করতে পারবেন তিনিই কেবল এই মহা-ইতিহাসকে লিপিবদ্ধ করতে পারবেন—এই ছিল সাহিত্যিকদের সামনে সমস্যা। এই সমস্যাকে যাঁরা সচেতনভাবে মেনে নিয়ে কাজে নেমেছেন এবং সফল হয়েছেন তাঁদের মধ্যে তারাশঙ্কর, আমার মতে, শ্রেষ্ঠ এবং অনেকখানি সার্থক। তাঁর লেখায় ঘটনার ও চরিত্রের যে ব্যাপ্তি আছে সেই পরিমাণে তাঁর সমধর্মী লেখকদের নেই। মাণিকবাবু, মনোজবাবু প্রভৃতি ভাল গল্প লিখেছেন কিন্তু অল্প পরিসরের মধ্যে। হয় তো তারই ফলে তাঁরা প্রচলিত লেখার মাপকাঠিতে নিখুঁত লিখেছেন কিন্তু তারাশঙ্কর বড় জিনিস নিয়ে পরীক্ষা করেছেন এবং তাতে যে পরিমাণে সাফল্য লাভ করেছেন—তাতে আধুনিক standard-এ না মিললেও তার জন্য নতুন করে বিচার করতে হবে। কেউ কেউ বলছিলেন diffused হয়ে গেছে কিন্তু সেটা বড় কথা নয়। সাফল্য অনেক বড়। তারা-শঙ্করের লেখায় আর একটি জিনিস ধরা পড়ে। তাঁর তীব্র আবেগ, বাংলার দুঃখ কষ্টে তাঁর মর্মান্তিক বেদনাবোধ এবং তার মধ্যে তাঁকে যেন কে সবসময়েই কণ্ঠরোধ করচে এমনি একটা সতর্ক দৃষ্টি। তবু তিনি বলবেন মানুষের এই দুর্গতির কথা, যথাসাধ্য প্রচার করবেন তার কারণ, এবং দুঃখী মানুষের কান্নার সঙ্গে মিশিয়ে দেবেন তাঁর নিজের আত্মার কান্না। "বোবা কান্নায়" তো এটা পরিষ্কার। "বোবা কান্না" বাংলা দেশের কান্না—যাকে বোবা করে রাখা হয়েছিল; বোবা কান্না তারাশঙ্করেরও বটে—এতগুলি পাতা লিখেও। "বোবা কান্না" ও "শেষ কথাতে" তারাশঙ্কর খানিকটা প্রতীকধর্মী

হয়েছেন। তার কারণ সুস্পষ্ট—প্রেস আইন। "বোবা কান্নায়" আছে একটি গ্রামস্থ ইনফরমারের অপরূপ সুন্দরী স্ত্রী, গ্রামের ডাক্তার, একটি সিঁদেল চোর, একটি পুরোহিত। যুদ্ধ এনেছে—অনাহার এবং আজকের ব্যাধিপীড়িত বাংলা। ইনফরমারটি অসুখে মারা গেল, তার একমাত্র সন্তান সেই দিন-ই অসুখে পড়ল। সুন্দরী বিধবার সেই সন্তানকে রক্ষার জন্য বিজ্ঞানধর্ম্মী ডাক্তার, ঈশ্বর বিশ্বাসী পুরোহিত এবং রবিনহুড-ধর্ম্মী চোর তিনজনে লেগে গেল যে যার মত করে। তিনজনেই পরস্পর বিরোধী। মেয়েটির সৌন্দর্য্যের জন্য যে তারা আকৃষ্ট হয়েছে তা বলা যায় না, মোটের উপর একটা সাধারণ মমতায় তারা একত্র চেষ্টা করলে। মেয়েটি বোবা জানা গেল—সন্তান মারা গেল। পরাজয়ে ডাক্তার বিষ খেতে যায়, পুরোহিত বলির খড়্গ নিজের গলায় তুলতে উদ্যত হয় আর চোর গলায় দড়ি দেয়। বাংলার বিরাট বিপর্য্যয়ে বিজ্ঞানীর বিজ্ঞান, ধার্ম্মিকের ঈশ্বর বিশ্বাস, সাধারণ দোষ গুণে গড়া মানুষের কল্যাণবোধ কিছুই কাজে এল না। কিন্তু মানুষের গড়া এই বিপর্য্যয়ে যুদ্ধ আসছে কেবল এরোপ্লেনের শব্দের মধ্য দিয়ে—আপদে ঔষধের চোরাবাজারের মধ্য দিয়ে, কুইনিনের আম্পুলে জল থাকে এই সব ঘটনার মধ্য দিয়ে। কান্নায় লেখকের ঘৃণা চাপা পড়ে যায়। কিন্তু কেন? তারাশঙ্করবাবু নিজের আদর্শের জন্য লাঞ্ছনা ভোগ করতে কসুর করেন নি, আজ তাই তাঁর মত নেতৃস্থানীয় লেখকের কাছ থেকে সেই মহান ঘৃণার আঘাত বেরিয়ে আসার প্রয়োজন ছিল—যারা আঘাত পাওয়ার যোগ্য তাদের উপর সে আঘাত দেওয়ারও প্রয়োজন ছিল। "শেষ কথা"তে জমিদার ও কৃষকের মধ্যে দিয়ে গান্ধীজীর কারাগারে উপবাস এবং কস্তুরবার মৃত্যু ব্যাপারটিকে প্রকাশ করা হয়েছে। এও এক নতুন ধরণের চেষ্টা এবং এই চেষ্টায় কংগ্রেসের বিরুদ্ধে মিথ্যা অপবাদের খণ্ডনকল্পে গান্ধীজীর উপবাসকে কৃষক আন্দোলনের মধ্যে রূপ দেওয়াটাও বেশ তাৎপর্য্যপূর্ণ। "পৌষ লক্ষ্মী"তে মাঠ ভরা ধান অথচ রোগাক্রান্ত অনাহারক্লিষ্ট চাষীর ধান তোলার প্রাণান্ত চেষ্টা, নবান্নের দিনে মৃত্যু। এবং "ইস্কাপনে"র মধ্যে চোর জেল থেকে গ্রামে ফিরে দেখে, জমিদার ঘর দুয়ার অধিকার করেছে, চার আনার পয়সায় এক পেট খাবার তো দূরের কথা এক গাল খাবার পাওয়া যায় না। লঙ্গর খানা—সেখানে তার সহকর্ম্মীর ছেলেমেয়েও যায়। নানা দুঃখে গ্রামের উপর বীতশ্রদ্ধ হয়ে সে কাশী গেল—সেখানে তীর্থ যাত্রীদের লুটপাট করে খায় যারা তাদের দলে। শেষ পর্য্যন্ত এক বিধবা বাঙ্গালী মহিলার সান্নিধ্যে এসে আবার তার স্মরণে পড়ে বাংলার গ্রামের অসংখ্য মনোরম স্মৃতি। সে আবার বাংলায় ফিরে যেতে চায়।

এর পরে মাণিকবাবুর "নমুনা" গল্পটি উল্লেখযোগ্য। গল্পটিতে আছে—গ্রাম থেকে শহরে মেয়ে ধরে এনে বিক্রী করার কাহিনী। অবশ্য এই দুর্ভিক্ষের পটভূমিকায় যে লোকটি ধরে আনতো এবারে তাকে মেয়ের বাপের তাগিদে ঠাকুর ঘরে দাঁড়িয়ে ধর্ম্মপত্নী বলে মেয়েকে গ্রহণ করতে হল। মেয়েটির জন্য শহরে এসে মায়াও একটু তার জন্মেছিল ও অন্য লোককে তার ঘরে যেতে দিত না। তারপর আর একটি bussiness trip দিয়ে যখন শহরে ফিরলো, দেখে বাড়ীওয়ালী মেয়েটির ঘরে লোক পুরেছে। "ধর্ম্মপত্নীর ঘরে" লোক? পরিবর্ত্তে বিরাট একতাড়া নোট এল চালের কারবারীর হাত থেকে। স্বামিত্ব-বোধ চুপ করে গেল। ছোট ব্যাপার। কিন্তু এর মধ্যে মানুষের বহুকালের অভ্যাস ও সংস্কার কি ভাবে ভেঙ্গে গুঁড়ো হয়ে যাচ্ছে অভাবের তাড়নায় মাণিকবাবু তা সুন্দর দেখিয়েছেন। এটি নিখুঁত গল্প এবং বেশ ভাল গল্প। মনোজবাবুর "নিমন্ত্রণ", "নৌকা" ও "ধান পেকেছে" গল্পে আছে শহরে দুঃস্থদের ভিড়, denial policy-র জন্য নৌকা নিয়ে নেওয়া এবং তার মধ্যে শহরের বাবুদের গেরিলা যুদ্ধ শিখতে বলার মুখে কৃষকের স্বদেশ প্রেমের ব্যঞ্জনা ইত্যাদি। মনোজ বাবুর লেখার মধ্যে আবেগ আছে যথেষ্ট কিন্তু তারা-শঙ্করের মত ব্যাপ্তি নাই বা মাণিকের মত precision-ও নাই। বেশী আবেগ প্রকাশ পাওয়ায় খানিকটা তরল হয়ে পড়েছে।

নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের 'কালো জল' ও 'খড়্গ': এই দুটি গল্পের প্রথমটিতে আছে অনাচার পীড়িত বাংলার এক পরিবারের ধ্বংসের ছবি ও সঙ্গে মজুতদারের কাণ্ড—দুই-এরই দর্শক এক নৌকার মাঝি। দ্বিতীয়টিতে আছে—অভাবের তাড়নায় বন্ধু (চামড়া ব্যবসায়ী মুচী) অন্য এক বন্ধুর (গাড়োয়ান) গরু বিষ খাইয়ে মারছে—আর শেষোক্ত লোকটির যুবতী স্ত্রীর কাছে যাচ্ছে গ্রামের পয়সাওয়ালা ব্যবসাদার। নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়ের লেখায় একটি জিনিস খুব দেখা যায়। অন্যায়ের প্রতি hatred তাঁর লেখায় বেশ বেরিয়ে আসে। এবং মাঝে মাঝে তা এমনি হয় যে, গল্প ছেড়ে প্রচার হয়ে যাওয়ার মত হয়। নারায়ণবাবুর তীব্র বিদ্বেষ প্রকাশ করার চেষ্টাকে প্রশংসা করি; এবং এ কথা বলি যে, তিনি বেশ গভীরভাবে বোধ করেছেন বলেই এমনি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হয়ে লিখেছেন। কিন্তু তারাশঙ্করের বেদনাবোধ যেখানে গল্পের মধ্যে ফল্গু নদীর মত বয়ে চলেছে, গল্প ছাড়িয়ে প্রকাশ হয় নি—নারায়ণবাবু সে ক্ষেত্রে অনেক জায়গায় গল্প থামিয়ে বেশ কিছু গাল দিয়ে নিয়েছেন।

অমলা দেবীর "হারাধন"ও বিশেষ উল্লেখযোগ্য। "হারাধন" চরিত্রের প্রকাশের

মধ্য দিয়ে বাংলার দুর্ভিক্ষের বিভিন্ন অবস্থা নানাভাবে দেখানো হয়েছে। 'হারাধন প্রজাদের চাল মেরে অনেক বড় লোক হলেন। কিন্তু তার অসুস্থ পুত্রের ভাত খাওয়া বারণ। এই গল্পটিতে একত্রে অনেক পুঙ্খানুপুঙ্খ ঘটনা দেওয়া আছে যাতে দুর্ভিক্ষের ছবি স্পষ্ট হয়ে উঠতে পারে। কিন্তু শিল্পকুশলতা তত বেশী লক্ষ্য করা যায় না।

এর পরে আবুল কালাম শামসুদ্দিনের 'কেরায়া নায়ের মাঝি,' সরোজকুমার রায় চৌধুরীর 'আগুন,' রবীন্দ্রবিনোদ সিংহের "মেঘনা চরের চাষী" এবং নরেন্দ্র ঘোষের 'বাঁকা তলোয়ার" এই দফায় পড়ে। প্রথম তিনটি দুর্ভিক্ষের প্রকোপে বিভিন্ন অবস্থার লোকের ছবি—অবস্থা প্রকাশ পেয়েছে বটে, তবে খুব উচ্চশ্রেণীর সাহিত্য হয় নি। নরেন্দ্র ঘোষের বাঁকা তলোয়ারও অনুরূপ গল্প; কিন্তু নায়িকা দুঃস্থা একটি নারীকে লেখক কিসের জোরে ভরসা দিলেন "তলোয়ার শানানো হচ্ছে—ভয় নেই" এটা বোঝা গেল না। অনেকটা যেন আকাশ-বাণী হল।

মোটের উপর এই হল আমার বক্তব্য। এতগুলি লেখা সম্পর্কে খুব সঠিক মতামত দিতে হলে আরো সময় এবং আরো স্থান লাগে। সেগুলি না হওয়ার ফলে কিছু অবিচারও হওয়ার সম্ভবনা থাকে। সে সবই মানি—এবং সেই জন্য লেখকদের কাছে আমার বক্তব্য এই যে তাঁদের লেখা পড়ে আমার মত সাধারণ পাঠকের মনে প্রথমে যা এসেছে তাই বললাম—তাঁদের ক্ষমতার উপর কোন কটাক্ষ করার আমার ইচ্ছা নেই। এবং আমি বিশেষজ্ঞের সম্মানও দাবী করি না।

সুধী প্রধান

পুস্তক-পরিচয়

শিল্পকথা, শ্রীনন্দলাল বসু (বিশ্ববিদ্যাসংগ্রহ, বিশ্বভারতী, ॥০) নিরীক্ষা, নন্দলাল সংখ্যা, (ত্রৈমাসিক পত্র, এই সংখ্যার মূল্য ৫৲)

"এখন এক পণ্ডিত এসে জুটে গেলেন—চাকরি চাই। আমি বললুম, 'বেশ লেগে যান, রোজ আমাদের মহাভারত-রামায়ণ পড়ে শোনাবেন।' আমাদের বাল্যকালের পণ্ডিত মশায়, নাম রজনী পণ্ডিত, সেই পণ্ডিত রোজ এসে রামায়ণ মহাভারত শোনাতেন। আর তাই থেকে ছবি আঁকতুম।

"নন্দলাল বল্‌লে, 'কি আঁকব ?' আমি বল্‌লুম্ 'আঁকো কর্ণের সূর্যস্তব।' ও বিষয়টা আমি চেষ্টা করেছিলুম, ঠিক হয় নি। নন্দলাল এঁকে নিয়ে এল। আমি তার ওপর দু' তিনটে ওয়াশ দিয়ে দিলুম ছেড়ে—হাতে ধরে দেখিয়ে আমি কখনও ওকে শেখাই নি। ছবি করে নিয়ে আসত, আমি শুধু কয়েকটি ওয়াশ দিয়ে মোলায়েম করে দিতুম, কিংবা একটু আধটু রঙের টাচ্ করে দিতুম, যেমন ফুলের উপর সূর্যের আলো বুলিয়ে দেওয়া—সূর্য নয় ঠিক, আমি তো আর রবি নই, নানা রঙের মাটির প্রলেপ দিতেম। তখন আমাদের আঁকার কাজ তেজে চলেছে। নন্দলাল সূর্যের স্তব আঁকল তো সুরেন্ এদিকে রাম চন্দ্রের সমুদ্র শাসন আঁকল, এই তীর ধনুক বাঁকিয়ে রামচন্দ্র উঠে রুখে দাঁড়িয়েছেন। নন্দলাল্ এঁকে আন্‌ল একটি মেয়ের ছবি, বেশ গড়নপিটন, টানা টানা চোখ ভুরু। আমি বল্‌লুম, 'এ তো কৈকেয়ী, পিছনে মন্থরা বুড়ি এঁকে দাও।' হয়ে গেল কৈকেয়ী ও মন্থরা। ছবির পর ছবি বের হতে লাগ্‌ল। চার দিকে তখন খুব সাড়া পড়ে গেল, হৈ হৈ রৈ রৈ কাণ্ড। ইণ্ডিয়ান্ আর্ট শব্দ অভিধান ছেড়ে সেই প্রথম লোকের মুখে ফুট্‌ল।"

উদ্ধৃতিটি দীর্ঘ হল, কিন্তু সমস্ত 'জোড়া সাঁকোর ধারে' (অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর-রানী চন্দ) উদ্ধৃত করবার লোভ হবে তাঁরই যিনি অবনীন্দ্রনাথের সেই অপূর্ব কাহিনী পড়েছেন। এখানে তার একটি আশ্চর্য অধ্যায়ের কথাই উদ্ধৃত হয়েছে—ইণ্ডিয়ান আর্টের আবির্ভাবের কথা ; তাও উদ্ধৃত হয়েছে তার শ্রেষ্ঠ কৃতীর আবির্ভাবের কথা বলে। বাঙলা দেশের ইতিহাসে সে এক শুভ মুহূর্ত—যখন অবনীন্দ্রনাথ নন্দলালকে পেলেন। তারপরে বছর ত্রিশ পঁয়ত্রিশ হয়ে গেছে, ভারতীয় শিল্পের বয়সও চল্লিশ হতে যাচ্ছে—আজ তার পরিচয়ের জন্য অভিধান খুঁজতে হয় না, আমাদের মত সাধারণের কাছেও তা প্রায় স্বতঃসিদ্ধ। আমরা জানি, বর্তমান পৃথিবীর শিল্প-জগতে যাঁরা ভারতবর্ষকে প্রতিষ্ঠিত করেছেন তাঁদের মধ্যে অগ্রগণ্য এঁরা দু'জন—অবনীন্দ্রনাথ ও নন্দলাল।

কিন্তু আমাদের চোখে ও বিবেচনায় সাধারণত 'নব্য ভারতীয় শিল্পকে' আমরা কি বলে জানি ? অনেকেই তা জানি এই বলে যে, একটা বিশেষ ভঙ্গীর তা পুনরাবৃত্তি। তার সঙ্গে মানুষের স্বাভাবিক দেহরূপের মিল বড় নেই,—আঙুল হবে সরু সরু, হাত-পা হবে লম্বা-লম্বা, চোখগুলো হবে টানা-টানা। দ্বিতীয়ত এ শিল্পের বিষয় হবে রোমান্টিক—মানে পৌরাণিক কিংবা পুরাতন ; নইলেও এ কালের যে জীবন-যাত্রা অপরিচিত ;—ঠাকুর-দেবতা, বৌদ্ধ কাহিনী, মোগল রাজপুতের জীবন আর শেষে সাঁওতাল কি পাহাড়ী মেয়ে-

পুরুষ এই শিল্পের বিষয়। এ অবশ্য অত্যন্ত স্থূল ধারণা, আর অত্যন্ত ভুল ধারণা;— সাধারণ লোকের ধারণা সেরূপ হওয়া আশ্চর্য নয়। বুঝে-না-বুঝে 'নব্য ভারতীয় শিল্পকে' এই বলেই আমরা ধরে নিই। কিন্তু কেন? এরূপ ধারণা যে জন্মাল তারও কারণ আছে। একটা কারণ বোধ হয় এই যে, প্রাণ দিয়ে এক দিন যে সত্যকে আবিষ্কার করা হয় আর দিন পুনরাবৃত্তির ঝোঁকে তার প্রাণ হারিয়ে ফেলা হয়। সত্যের তখন খোলসটা থাকে; তা দিয়েই তার রূপ আমরা চিনি, আর মনে করি—সেই সত্যকে চিনলাম, বুঝলাম, পেলাম। চল্লিশ বছর হয় নি, তবু মনে হয় ভারতীয় শিল্পের ভাগ্যে এমনি দুর্দশা ঘট্‌ছে—পদ্ধতি দিয়েই তার পরিচয় ও বিচার সাধারণত শেষ হয়।

কিন্তু কি সত্য আবিষ্কার করেছিলেন তার প্রথম স্রষ্টারা? অবনীন্দ্রনাথ সে সত্য বলেছেন অনেকবার, বলেছেন তাঁর আবিষ্কারের কাহিনীও। তাঁরই কথায় আবার আমরা তা শুনি নতুন করে: "পুরাতন ছবিতে (আর্ট স্কুলের আর্ট গ্যালারির মোগল-পার্শিয়ান ছবি) দেখ্‌লুম ঐশ্বর্যের ছড়াছড়ি, ঢেলে দিয়েছে সোনা রুপো সব। কিন্তু একটি জায়গায় ফাঁকা; তা হচ্ছে ভাব। সবই দিয়েছে ঐশ্বর্য ভরে, কোথাও কোনো কার্পণ্য নেই; কিন্তু ভাব দিতে পারে নি। মানুষ আঁকতে সবই যেন সাজিয়ে গুজিয়ে পুতুল বসিয়ে রেখেছে। আমি দেখলুম, এই বারে আমার পালা। ঐশ্বর্য পেলুম, কি করে তার ব্যবহার তা জান্‌তুম, এবারে ছবিতে ভাব দিতে হবে।

বাড়ি এসে বসে গেলুম ছবি আঁক্‌তে। আঁকলুম "সাজাহানের মৃত্যু।"

নন্দলালের শিল্পেরও যে এই মন্ত্রেরই বোধন চলেছে, তা অনুমান করতে পারি। কিন্তু তাঁর নিজের সাক্ষ্য কি?—তা জানা ছিল কঠিন। তিনি লিখতে এবং বল্‌তে বরাবরই কুণ্ঠিত। এবার "শিল্পকথায়" শিল্পী নন্দলালের সেই অভিজ্ঞতা ও উপলব্ধি —কখনো যা তিনি মুখে বলেছেন, কখনো বা তিনি লিখে দিয়েছেন,— 'বিশ্বভারতী' সব আমাদের পক্ষে সহজলভ্য করেছেন। অনেক কথাই মনে হয় সংক্ষিপ্ত যেন এ্যাফোরিজম্‌ সেরূপ কথা সাধারণ পাঠকের পক্ষে বোঝা শক্ত হয়, তাদের ভুল বুঝ্‌বারও কারণ থাকে। কিন্তু এক্ষেত্রে অধিকাংশ কথাই সাধারণ লোকদেরই শিল্পী বলেছেন, কিংবা বলেছেন তাঁর শিল্প শিক্ষার্থীদের। তাতেই আমরা সাধারণ লোকেরাও এসব কথা থেকে নিজেদের শিক্ষার বেশ উপকরণ পাই, আর নিজেদের স্থূল ও ভুল ধারণাগুলোকে শুধ্‌রাবারও সুযোগ পাই। কি শিল্প সম্বন্ধে কি নব্য ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে —আমাদের দৃষ্টি তাতে একটু পরিচ্ছন্ন হয়ে ওঠে। নন্দলালবাবুর কথাকে উদ্ধৃত

করতে গেলে খণ্ডিত করা হতে পারে। জ্ঞানত তা না করে, তবু দু'একটি বিষয়ে তাঁর কথা এখানে উদ্ধৃত করা যাক।

অদ্বৈতবাদী সন্ন্যাসীকে তিনি বলেছেন ঃ

"সকল শিল্পের লক্ষ্য এক। কবিতা, মূর্তি, চিত্র, নাচ, গান, সবই সৃষ্টির মূল আনন্দের ছন্দকে আপন আপন ছন্দে ধরতে চায়। সে হিসাবে যোগসাধনার সঙ্গে শিল্প-সাধনার মিল আছে। অধ্যাত্ম-সাধনায় সৃষ্টির সমুদয় বৈচিত্র্যের অন্তরালে ঐক্য সন্ধান করা হয়—একের সন্ধান করা হয় যাকে জানলে সব কিছুকেই জানা যায়। শিল্পও ঠিক ঐ ভাবেই বিরাট একের সন্দর্শন-মানসে চলেছে। এক চীনা আর্টিষ্ট বলেছেন, 'দেবতার মূর্তি আর দূর্বার অঙ্কুর, যথার্থ আর্টিষ্টের নিকট দুইয়ের একই মূল্য; এ দুই রসপ্রেরণা জাগাবার শক্তি দুজনে ধরে।' এতেই বোঝা যায়, শিল্পীর পক্ষে একের ধারণা করা কতখানি সম্ভব। অবশ্য দেবমূর্তির প্রতি অশ্রদ্ধার কোনো কথা হচ্ছে না, কেবল দূর্বার অঙ্কুরের প্রতিও সমান শ্রদ্ধা প্রয়োজন।"

নন্দলালের দৃষ্টিতে শিল্প এমনি একটা সাধনার পথ—রূপের মধ্য দিয়ে ভাবের উপলব্ধি। কিন্তু রূপই তারও আশ্রয়। সম্পর্কটা তিনি স্পষ্ট করেছেন বোধ হয় এই লেখায় ঃ "শিল্পী বস্তুকে গুণ সহিত দেখেন। সাধারণে বস্তুর রূপ উদাসীন অন্যমনস্ক মন দিয়ে দেখে, কাজেই তার গুণের দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেয় না—রূপে রূপে প্রভেদটুকু মাত্র দেখে, অথবা রূপ-গুণের সম্বন্ধটি ঠিক না জানায় কখনো স্থূল রূপের প্রতি, কখনো বিচ্ছিন্ন গুণের প্রতি অত্যধিক আকৃষ্ট হয়ে পড়ে। শিল্পী জানেন, আসলে রূপে ও গুণে তফাৎ নেই, রূপের সবটাই গুণ এবং গুণের জন্যই রূপ। শিল্পীর পক্ষে বস্তুর কোনো একটি বিশেষগুণে আকৃষ্ট হওয়াটাই প্রধান কথা। (একেবারে এক মুহূর্তে বস্তুর সব গুণের ধারণা কোনো মানুষের পক্ষেই স্বাভাবিক নয়।) শিল্পীও প্রথমে বাহ্যিক রূপের দ্বারা আকৃষ্ট হন, পরে গুণের ধারণা হয়। এই আকর্ষণের কারণ নির্দেশ করা যায় না, জনে জনে তা বিভিন্ন।

"বাহ্যরূপ থেকে গুণে পৌঁছোন, গুণটি বুঝে যখন রূপে আবার ফিরে আসেন তখনই শিল্পের রূপ শিল্পীর চোখে নির্দিষ্ট ও পরিস্ফুট হয়ে ওঠে। শিল্পসৃষ্টির ক্ষেত্রে প্রতি নিয়তই বাহ্যরূপের রূপান্তর হয়, কিন্তু একেবারে রূপছাড়া গুণের কোনো চিত্র বা মূর্তি হয় না। অবচ্ছিন্ন (abstract) রূপের ধারণা বিচারবিশ্লেষণে কাজে লাগে, এবং শিল্পীর ধ্যান-জ্ঞানের অধিগত হলে কাজেও বিশেষ দৃঢ়তা আনে। অনেক শিল্পী বিচ্ছিন্নগুণের সূক্ষ্ম

বা অপরোক্ষ অনুভব থেকে (intuitively) বিশিষ্টরূপ কল্পনা করেন ; বিশেষ গুণের উপর ঝোঁক দেওয়াতে, না জানতেই, আপনা থেকেই রূপের বদল হয়ে যায়,—গড়নের মাপজোপে কম বেশি হয় ”

'নব্য ভারতীয়' শিল্পের মূল ভাবাদর্শ নিয়ে অনেক বাগ্-বিস্তার হয়। সম্ভবত এখানে সে আদর্শের কথাই তার সব চেয়ে বেশি অধ্যাত্মবাদী শিল্পী বলেছেন। যা অপরোক্ষ অনুভব, কিংবা যে গুণ অবচ্ছিন্ন, তা সাধারণের পক্ষে সহজ নয়, এমন কি শিল্পীর পক্ষেও সুলভ নয়। কিন্তু যা সত্য তা হচ্ছে এই যে, শিল্পীর জগৎ রূপের জগৎ ; রূপ থেকেই তার যাত্রা, আর রূপেই আবার তাঁর সৃষ্টির প্রমাণ। অবশ্য রূপ মানে ফটোগ্রাফির রূপ নয়, তা বলাই বহুল্য। রূপ সৃষ্টি মানে কোনো শিল্পী বল্‌বেন, আসলে বস্তরই সত্যকে অধিগত করা, বাস্তবের মানেকে রূপের মধ্যে ধরে তোলা ; আর কোনো শিল্পী বল্‌বেন—রূপসৃষ্টির মানে আসলে সত্যকেই বস্তুর মধ্যে অধিগত করা, মানে, অরূপকে রূপের মধ্যে লীলায়িত করা। কারও মতে “গুণের জন্যই রূপ” ; কারও মতে 'রূপের জন্যই গুণ' ; কারও মতে ভাব আগে, কারও মতে আগে বস্তু। কিন্তু যেখানে বোধ হয় মতভেদ নেই তা এই যে, রূপসৃষ্টিই আসল কথা।

'নব্য ভারতীয় শিল্প' এই ভাববাদ থেকে যাত্রা শুরু করে পরম্পরার (tradition) খোঁজ করে—তার পিছনে ছিল আমাদের 'স্বদেশী'যুগের জাতীয় আত্ম-মর্যাদাবোধ, আর ছিলেন হ্যাভেল, নিবেদিতা, ওকাকুরা প্রভৃতি বিদেশীয় মনস্বীরা। পরম্পরার সিঁড়ি বেয়ে সেদিনকার স্রষ্টারা একটা পদ্ধতিও নিজেদের বলে চিনে নেন। কিন্তু সেখানেই কি তাঁরা ঠেকে গেলেন ? না তাঁদের মনে ছিল ওকাকুরার সমস্ত উপদেশই—nature, tradtion, originality, এই তিন নিয়ে হয় সর্বাঙ্গসুন্দর আর্ট ? তাঁরা জানতেন না, আধ্যাত্মিকতা আর পদ্ধতি নিয়ে ভারতশিল্পের চোরা-বাজারও আবার বসবে। নন্দলাল বলছেন, “হিন্দু ঘরে জন্মে হিন্দুর শিক্ষা দীক্ষায় আমি মানুষ হয়েছি। এককালে বিশেষ করে দেবদেবীর ছবিই এঁকেছি। [তারও সেদিনকার পরিবেশ আয়োজন অবনীন্দ্রনাথের কথায় আমরা পেয়েছি, লেখক।]. এখন কিন্তু দেবতার ছবি যেমন আঁকি সাধারণের ছবিও এঁকে থাকি ; উভয়েতেই সমান আনন্দ পেতে যত্ন করি।”

শিল্পী নন্দলালের যে বিচিত্র বিকাশের কথা এখানে রয়েছে তার পরিচয় তাঁর সৃষ্টিতে। সেই পরিচয়ই আমাদের মনে করিয়ে দিয়েছে 'নিরীক্ষার' 'নন্দলাল সংখ্যা।' এদিনে চিত্র ও প্রবন্ধ শুদ্ধ এমন সামায়িক পত্র বের হল তা এক বিস্ময়। কিন্তু না বের হলে বাঙালীর

লজ্জা থাকত, তাব শিল্পীব পরিচয় সে নিতে চায় না। 'নিবীক্ষায়' দেখি "যে নির্দিষ্ট অঙ্কন-পদ্ধতিকে তিনি (নন্দলাল) স্বদেশী বলতে পাবেন একমাত্র তাহাই সকল ভারতীয় শিল্পী আত্মস্মাৎ করুক ইহা তাঁহাব দৃঢ় মত" (নিবীক্ষা, নন্দলাল সংখ্যা, দেবীপ্রসাদ বায় চৌধুবী) ; "কিন্তু তিনি নব নব অভিযানে বাহিব হইয়াছেন। তাঁহাব নিকট সুন্দরেব রূপ ফর্মায়-ফেলা কোনো বিশেষ গণ্ডীব ভিতব আবদ্ধ থাকে নাই।" "পৌবাণিক পর্ব কাটিয়ে নন্দলাল এসেছেন 'আধুনিক' পর্বে।" এযুগ হল 'পবীক্ষাব যুগ' "—"কোনো শৈলীতে তিনি আবদ্ধ হইয়া থাকিতে চাহেন না। তাঁব আধুনিক চিত্রে যে ফরাসী পোষ্ট-ইম্প্রেশ্যনিজম্-এব প্রভাব পড়িয়াছে তাহাও লক্ষ্য করাব বিষয়" (নিবীক্ষা, ঐ, মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত)। রাজপুত, মোগল, অজন্তা তাঁর প্রথম প্রেরণা জুগিয়েছে, প্রেবণা জুগিয়েছে তেমনি চীনা ও জাপানী চিত্রকলা। কিন্তু প্রেবণা জুগিয়েছে আবার বাংলার লোকশিল্প—পট ও পুঁথিব পাটা, পোড়ামাটিব খোদাই, মাটিব বাসনের রেখার ও তুলিব কাজ ; নানা দেশেব লোকশিল্প ; মিশবীয়, আসীবিয়, গ্রীক, চীনা, বাইজেন্টাইন, গথিক, প্রভৃতি নানা শিল্পকলা। বাধা তিনি পান না কোথাও —নাটকেব মঞ্চসজ্জা, পোষাকেব পবিকল্পনা, স্থাপত্য, অলঙ্করণ, এচিং; কাঠখোদাই, চামড়াব কাজ থেকে হবিপুবার কংগ্রেসের মণ্ডপ-মণ্ডন—আব দৈনন্দিন জীবনেব সহজরূপ —কুণ্ডলী-করা, কুকুব, পশু, ফল, গাছ, নব-নারী—সব তাঁব তুলি ও কলমেব টানে যেন গীতি-কবিতার মত রূপ ধবে উঠ্ছে। আর এ সব দেখ্তে দেখ্তে বুঝি নব্য ভারতীয় শিল্পকলা কোন সত্য নিয়ে কাজ শুরু কবেছিল। তাবপব যখন এ সব ছেড়ে আবাব একালেব নব্য ভাবতশিল্প দেখি, তখন বুঝি কোন্ খেদে অবনীন্দ্রনাথ বলেন "আজকাল ভারতীয় শিল্প বলে যারা পবিচয় দেয় ভারতীয় তারা কোন্খানটায় ?" স্পর্ধা না শোনালে বল্তাম—তথাকথিত আধ্যাত্মিকতাব চোরা-কাববাবে শিল্পই বা আছে কতটুক ?

গোপাল হালদাব

The Elizabethan World Picture. E. M. W. Tillyard (Chatto, 6/-)

ডক্টব্ টিলিয়ার্ডের ঝর্ঝবে সংক্ষিপ্ত ও সস্তা বইটি আমাদের পক্ষে উপকাবী। ববীন্দ্র-নারায়ণ ঘোষ একবাব লিখেছিলেন যে এদেশে আমবা সাহিত্য বলতে মোটামুটি উনিশ শতাব্দীব ইংরেজি সাহিত্য বুঝি। আঠাবো শতক প্রায় আমাদেব কাছে অস্তিত্বহীন, আর মধ্যযুগে তো শুধু ক্যাপিটালপূর্ব বর্ববতা। এলিজাবিথান্ যুগ, কলকাতায় বলা

যেতে পারে, প্রায় রোমান্টিক বিভাইভলেরই সামিল। ওরই মধ্যে বিচক্ষণ ছাত্ররা এলিজাবেথের রাষ্ট্রনীতি, আবিষ্কারকদের সমুদ্রযাত্রা ইত্যাদির আলোচনা করেন। কিন্তু এলিজাবিথান্ মানসের যে মধ্যযুগীয় ভিত্তি, তা ভার্জিনিয়া উল্‌ফও *Orlando*-তে প্রতিফলিত করেন নি।

What a piece of work is a man · how noble in reason; how infinite in faculty ; in form and moving how express and admirable ; in action how like an angel ; in apprehension how like a god ; the beauty of the world,—the paragon of animals. হ্যামলেটের এই উক্তি রেণেসান্স্ মানবিকতা ভাবলে ভুল হবে, এ হচ্ছে পাপের আগে ইডেন্ বাগানের মানুষের কথা। টিলিয়ার্ডের মতে অর্‌ল্যাণ্ডো তথা *Shakespear's England*-এ ভেদের কথাই আছে, পিউরিট্যানের ও রাজসভার এক জগচ্চিত্রের মিলের কথা নেই। অথচ *Measure for Measure*-এর *Be absolute for death* আলাপের সম্যক্ অর্থ আমরা বুঝতে চাই।

অবশ্য এই জগচ্চিত্র সম্বন্ধে কয়েক বছর ধ'রে বই বেরোচ্ছে, ব্যাস্‌ল উইলির বই দুটি বা নীড্‌হ্যামের বইএর নাম করা যায়। তবু টিলিয়ার্ড্ এলিজাবিথান্‌দের মূল বিশ্বাস বা ধারণার পরিচয় দিয়ে আমাদের কৃতজ্ঞতা-ভাজন। কারণ এই ধারণা বা প্রত্যয়গুলি বাদ দিলে এলিজাবিথান্ নাট্যসাহিত্যের প্রথাসিদ্ধ রীতি (highly stylised and conventional) বোঝা যাবে না, যদিচ এই রীতির ছকেই শেক্‌স্‌পিয়রের প্রতিভার স্ফূর্তি। এ বিষয়ে একপক্ষে ব্র্যাড্‌ব্রুক্ ও ইলিসফ্যর্মর এবং অন্যপক্ষে উইল্‌সন্ নাইট, ও স্পর্জেন প্রভৃতি বিশেষ সাহায্য করেন। টিলিয়ার্ড্ শুধু সংক্ষেপে *Order, Sin, The Chain of Being* প্রভৃতি মূল ধারণাগুলি দেখিয়েছেন—যেগুলি হিন্দুর জন্মান্তরবাদ বা কর্মফলের মতো শেক্‌স্‌পিয়রের জীবন ও জগতের কাঠামো। তারই ওপর নানাবিধ এন্‌জেল্‌স্, নক্ষত্র ও ভাগ্যদেবী, ক্ষিতি অপ্ অগ্নি বায়ু চার ভূত বা elements যার সঙ্গে জড়িত চার রস বা humours শেক্‌স্‌পিয়র-পাঠকের কাছে order বা degree অত্যন্ত পরিচিত—এ বিশ্বব্যাপী বর্ণাশ্রম ছাড়া ম্যাক্‌বেথের ট্রাজেডি বা য়ুলিসিসের প্রজ্ঞা অর্থহীন। অব্যবস্থার ট্রাজেডি এই ব্যবস্থার পটভূমিতেই।

মন্‌টেয়নের রেয়্‌মোঁ দ সেবোঁদ্-এ অস্তিত্বের বহুনরী হারের বিস্তৃত ব্যাখ্যা মুলতুবি রেখে এ প্রসঙ্গে মিল্‌টনের হারানো স্বর্গের চতুর্থ ও সপ্তম ভাগের কথা বলা যায়।

Tempest তো জীব জগতে এই শৃঙ্খলার উপরেই নির্ভর করে। ক্লিওপেট্রা যখন ডলাবেলাকে এন্টনি-প্রশস্তি শোনান ঃ

His delights were dolphin-like ; they showed his back above

The element they lived in—তখন সে শুশুক্ ইয়েট্‌সের অর্বাচীন শুশুক নয়, সে হচ্ছে মৎস্যরাজ শুশুক যে জলক্রীড়াতেও রাজমহিমা প্রকাশ করে ঢেউ-এর উপরে গা ভাসিয়ে। লিয়রে তেমনি নক্ষত্র-প্রভাব আর ভাগ্যদেবীর প্রতিপত্তি। তারপরে ঐ ভূতগুলি, শরীরের ধরণ যার প্রভাবে গড়ে, কারণ আমাদের খাদ্য যকৃতে গিয়ে নাকি চারটি রসে পরিণত হয়, ফলে কেউ হয় বিষণ্ণ, কেউ বদ্‌রাগী, কেউ শ্লেষ্মায় সহিষ্ণু কেউ বা রক্তপ্রধান। তাই The Extasie :

As our blood labours to beget
Spirits as like souls as it can
Because such fingers need to knit
That subtle Knot which makes us man :
So must pure lovers' souls descend
To affections and to faculties
Which sense may reach and apprehend ;
Else a great prince in prison lies.

টিলিয়ার্ডের পরের বিষয় হচ্ছে যোগাযোগ বা Correspondences, তাঁর শেষ অধ্যায় The Cosmic Dance, যে বিশ্বনৃত্যের মধ্যযুগীয় আসরে এলিঅট তাঁর শেষ কবিতা ক'টিতে দেখি বারবার ব্যর্থ প্রবেশ চেষ্টা করছেন। কারণ মধ্যযুগশোভন ঈশ্বরেচ্ছায় সে কাল উত্তীর্ণ, শুধু আছে সে কালের সভ্যতাস্মৃতি ফুলের রচনাবলী আমাদের জ্ঞান ও আমাদের আনন্দের বর্ণহীন অক্ষয় ভাণ্ডারে।

বিষ্ণু দে

পাঠক-গোষ্ঠী

'পরিচয়' সম্পাদক সমীপেষু—

গেল মাসের 'পবিচয়ে' ভাবতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের "নবান্ন" নাটক সম্পর্কে সম্পাদকীয় মন্তব্য পড়ে 'পরিচয়ের' পাঠক ও 'নবান্ন'-র দর্শক হিসেবে একটু প্রতিবাদ জানাতে চাই।

'পবিচয়' সবাসরি রায় দিয়েছেন: "নাটক হিসেবে 'নবান্ন'কে মোটেই সক্ষম রচনা বলা চলে না।" তবু ঐ নাটকের অভিনয় 'পরিচয়ের' সম্পাদকেবও খুব ভালো লেগেছে। তার কাবণ "'নবান্ন' নাটকের গুরুতর ত্রুটিগুলি অভিনয়ের গুণে অধিকাংশ ঢাকা পড়েছে।"

"মোটেই সক্ষম রচনা নয়" মানেই একেবারে অক্ষম বা অসার্থক রচনা। অভিনয় কলা যে একটা আর্ট বা সৃষ্টি তা জানি। সুন্দর অভিনয় মূলবস্তুকে ছাপিয়ে উঠে তদতিরিক্ত বসেব পবিবেশন যে কবতে পারে, তা-ও জানি। কিন্তু একখানা মোটেই সক্ষম নয় নাটককে আশ্রয় করে এতখানি ভালো অভিনয় হতে পাবে বলে সহজ বুদ্ধি মানতে চায় না। অবশ্য মানতে পারে, যদি সমস্ত ব্যাপাবটাকে আগাগোড়া একটা ভোজবাজি বলে বিশ্বাস করা যায়। অনেকটা সক্ষম, কিছু সক্ষম, আধা-সক্ষম, সিকি-সক্ষম—এমন একটা বিশেষণও কি 'নবান্ন'র প্রাপ্য নয়? "মোটেই সক্ষম বচনা বলা চলে না" কি সম্পাদকের অনবধানতাপ্রসূত মন্তব্য?

এমন একখানি অক্ষম নাটকেব লেখক, 'পরিচয়ের'ই অভিমতে, কেবল বাঙলা রঙ্গমঞ্চেই নয়, বাঙলা সাহিত্যেও "নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন।" বাঙলাব দর্শক মহলের কি এতই স্থূলদৃষ্টি এবং বাঙলার পাঠক মহলেরও কি এতই অপক্ক মন? "নতুন আবহাওয়াব সৃষ্টি" কি তবে এতই সহজ? একই কলম থেকে এমন স্ববিরোধী মতামত ব্যক্ত হওয়ায় আমরা ন্যায়তই প্রশ্ন করতে পারি: কোন্‌টা 'পরিচয়ে'ব আসল অভিমত? মোটেই সক্ষম রচনা নয় কথাই মিথ্যে, না নতুন আবহাওয়া সৃষ্টির কথাটা মিথ্যে? দু'টো কখনো সত্যি হতে পাবে না।

আমার মতে "নবান্ন" রীতিমত সক্ষম রচনা। তার একাধিক দোষত্রুটি আছে। তা বড় কথা নয়। প্রধান কথা "নবান্নে" কী পেলাম। এতদিন যাকে আমরা পাবাব আশায় ছিলাম তার সবটা না পেলেও যদি তার অনেকটা বা কিছুটাও পেয়ে থাকি, সেই কি কম? "নবান্নে" পেয়েছি এতকালের অনাদৃত বৃহত্তর বঙ্গদেশকে—

বাঙলার চাষীর সুখ-দুঃখের দুর্ভোগ-দুর্দশার নৈরাশ্য-সঙ্কল্পের চমৎকার আলেখ্য "নবান্ন"। কেবল বিষয়বস্তুর জোরেই "নবান্ন" সার্থক নয়। এ বইএর সাহিত্যিক সাফল্যও যথেষ্ট। "নীলদর্পণে"র বহুকাল পরে বাঙলার অপাংক্তেয় কৃষক বাঙলা রঙ্গমঞ্চের নিষিদ্ধ রাজ্যে প্রবেশাধিকার আদায় করে নিয়ে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত তার নিজের কথা নিজের মতো করেই অনায়াসে বলেছে, কেঁদেছে, কোঁদল করেছে, হাসিয়েছে, নাড়া দিয়ে চলে গেছে। এক কথায়, নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছে। এ কী অক্ষমতার পরিচয়? অনভ্যস্ত কলম মাঝে মাঝে কখনো আড়ষ্ট হয়ে পড়েছে কিংবা দু'এক স্থানে একটু আধটু বাড়াবাড়ি হয়তো করে ফেলেছে। সেই কি একমাত্র বিচার্য বিষয়?

"নবান্ন"র ত্রুটিগুলির অধিকাংশ তার birth-marks. নতুন ভুইফোঁড় নয়। পুরাতনেরই জঠর থেকে আসে সে। যে দু'চারটে গতানুগতিক বা মঞ্চঘেঁষা ত্রুটি আছে ভারতীয় গণনাট্য সঙ্ঘের পরবর্তী নাটকগুলিতে সে সব গৌণ বিষয় এক এক করে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে বলে আমরা আশা রাখি। "নবান্ন" নবাঙ্কুর বলেই তার অবশিষ্ট ত্রুটিগুলিও আর এক অর্থে ত্রুটি নয়—সে-গুলিকে প্রচলতি নাট্য-কলা-বিচারের অভ্যস্ত চসমা চোখে এঁটে বিচার করলে চলবে না। যেমন, কেউ কেউ বলেছেন, একখানি নাটকে এতটা ব্যাপ্তি ও বৈচিত্র্যের ভীড়ে ঠাস-বুনটের গলদ রয়ে গেছে। এ অভিযোগ সত্যি হলেও তাকে অসাফল্য বলা চলে না। নতুন সর্বত্র বা প্রধানত পুরাতনের বিধিবিধান না মেনে নির্ভুল পথে পা বাড়িয়েছে কিনা সে-কথাই বিচার্য। এ প্রসঙ্গে প্রখ্যাত নট মনোরঞ্জন ভট্টাচার্যের অভিমত উল্লেখযোগ্য মনে করি; " 'নবান্ন' নতুন নাটক। এর কানুন রচিত হবে পরে।" 'পরিচয়' বলেছেন "ঘটনা পরম্পরার এই প্রকাণ্ড তালিকা, যাকে গত দু'বছরের বাঙলা দেশের ইতিহাস ও সমালোচনা বলা যায়, একে সুদৃঢ় গল্পের ভিত্তিতে নাট্যরসাশ্রিত করে তোলা যুগান্তকারী প্রতিভার অপেক্ষা রাখে।" যুগান্তকারী প্রতিভা কি স্বয়ম্ভূ? তা যদি না হয় তবে একদিন যুগান্তকারী প্রতিভা 'নবান্ন' প্রভৃতির কল্যাণে অনেকখানি তৈরী পথ পাবেন। সেই পথ পরিষ্কারের কাজকে কি 'মোটেই' দক্ষম রচনা নয় বলব?

'পরিচয়ে'র সম্পাদকের অভিমতের ন্যায় আমার এই মতামতও চূড়ান্ত বলে গৃহীত হতে পারে না। সমঝদার মহলের কাছ থেকে সমালোচনা আমরা প্রত্যাশা করি। ছোট বড় ত্রুটিবিচ্যুতিগুলি নিয়েও "নবান্ন" এমন এক বহুপ্রত্যাশিত ফললাভ যার সম্পর্কে এক কথায় রায় দেওয়া সম্ভবও নয়, সমীচীনও নয়।

['নবান্ন সম্বন্ধে আলোচনা বারান্তরে হবে। সং]

স্বর্ণকমল ভট্টাচার্য

চতুর্দশ বর্ষ—৬ষ্ঠ সংখ্যা।

পৌষ, ১৩৫১

পরিচয়

এডিংটন

রয়টারের সংবাদে সেদিন জানা গেল যে, বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক সর্ আর্থার এডিংটন মাত্র ৬১ বৎসর বয়সে মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছেন। এ বয়সে মৃত্যু নিশ্চয়ই অপ্রত্যাশিত কিন্তু সে সম্বন্ধে আর কোন খবর এখনও পর্য্যন্ত জানা যায় নি। এডিংটন ছিলেন কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের জ্যোতির্বিদ্যা ও ব্যবহারিক দর্শনের প্লুমেরিয়ান (Plumerian) অধ্যাপক। অনন্যসাধারণ প্রতিভায় তিনি জ্যোতির্বিদ্যা, আপেক্ষিকতত্ত্বের গণিত ও পদার্থ বিদ্যার বহু অধ্যায়কে সমৃদ্ধ করেছেন ও এই সব বিষয়ে প্রামাণিক গ্রন্থ রচনা করে গেছেন; কিন্তু যে জন্য তাঁর নাম চিরদিন বৈজ্ঞানিক জগতে কীর্ত্তিত হবে তা ইংরাজী ভাষী দেশসমূহে আপেক্ষিকতত্ত্ব ও আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ-বিধির প্রথম ও প্রধান ব্যাখ্যাকারক ব'লে। কেবল ব্যাখ্যা নয়, এই নূতন মহাকর্ষ-বিধির প্রমাণ প্রতিষ্ঠাও তাঁর নামের সঙ্গে চিরদিন জড়িত হ'য়ে থাকবে। আপেক্ষিকতত্ত্বের পূর্ব্বাভাস (Special Theory of Relativity) ১৯০৫ সালে আইনষ্টাইন প্রকাশিত করেন; এর উত্তর ভাগ (Generalised Theroy of Relativity) প্রকাশিত হয় ১৯১৬ সালে। ইয়োরোপ তখন মহাযুদ্ধে লিপ্ত। কিন্তু জার্ম্মানির প্রতি জনসুলভ বৈরীভাব উপেক্ষা করে এডিংটন ১৯১৬ সালে এই নবকল্পিত মাধ্যাকর্ষণ বার্ত্তা ইংলণ্ডে প্রচার করেন। নিউটোনিয়ান মাধ্যাকর্ষণ পরিত্যাগ করে আইনষ্টাইনের মাধ্যাকর্ষণ স্বীকার করার একটা প্রমাণ ছিল হাতে। গ্রহের কক্ষপথ প্রথমটির হিসাবে বৃত্তাভাস (Ellipse)। কার্য্যতও তা ঠিক মিলে যায় কিন্তু বেশ একটু গরমিল দেখা যায় বুধ গ্রহের বেলা। আইনষ্টাইনের মহাকর্ষ বিধির হিসাবে কিন্তু কোন গরমিল থাকে না। প্রকৃতপক্ষে গরমিল ছিল সব গ্রহেরই বেলা—কেবল সূক্ষ্ম ব'লে ধরা পড়ে না, পড়ে বুধের বেলা, বেশী হওয়াতে। কিন্তু শুধু গরমিল দূরীকরণে প্রমাণ নিঃসংশয় হয়

না, প্রস্তাবিত পরীক্ষার দ্বারা প্রমাণ প্রতিষ্ঠার দরকার। এরূপ এক পরীক্ষার নির্দেশ করলেন আইনষ্টাইন সূর্য্যগ্রহণের পূর্ণগ্রাসের অবসরে। ১৯১৭ সালে—যুদ্ধ তখনও পূর্ণমাত্রায় চলছে,—বিলাতের রাজ-জ্যোতির্বিবদ ইঙ্গিত করেন যে সম্মুখবর্ত্তী ১৯১৯ সালের পূর্ণগ্রহণের সময় সে সুযোগ উপস্থিত হবে। রয়াল সোসাইটি ও রয়াল অ্যাষ্ট্রোনমিক্যাল সোসাইটি একত্রে যে-যে স্থানে পূর্ণগ্রাস দ্রষ্টব্য সেখানে সেখানে নিরীক্ষার জন্য অভিযান পাঠাতে উদ্যোগী হন। এডিংটন মহা উৎসাহে এই অভিযানের জন্য প্রস্তুত হন ও প্রায় দুই বৎসর ব্যাপী আয়োজনের পর ২৯শে—পূর্ণগ্রাসের জন্য "প্রিন্সিপ" দ্বীপে যথাসময়ে উপস্থিত হন। এই উদ্যোগে তাঁহার সহচর ছিলেন মিঃ কটিংহ্যাম। এখানকার নিরীক্ষার ফল ও ব্রেজিলমধ্যস্থ সোব্রালের আর একটি অনুরূপ উদ্যোগের ফল আইনষ্টাইন কল্পিত মহাকর্ষ বিধির সপক্ষে সম্পূর্ণ সায় দেয়। ঐ বৎসরই নভেম্বর মাসে এডিংটন এই পরীক্ষার সাফল্যের বিবরণ রয়াল সোসাইটিতে পেশ করেন। এই প্রমাণের বিষয়ে ১৯১৬ সালে আইনষ্টাইন ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন—

"Apart from this (বুধকক্ষের হিসাব) it has been possible to make only two deductions from the theory which admit of being tested by observation, to wit, the curvature of light ray by the gravitational field of the Sun and......... I do not doubt that these deductions from the theory will be confirmed also."

এই বিস্ময়কর ভবিষ্যদ্বাণীর সফলতাকে মহিমান্বিত করেছে এডিংটনের বৈজ্ঞানিক সত্যের প্রতি নিষ্ঠা, সাহস ও গ্রহণের সময় সূর্য্যের অবলোকন-পথের পার্শ্বস্থ তারার ফটো তোলার আয়োজন এবং সর্ব্বশেষে সেই সকল ফটোর কষ্টসাধ্য দুরূহ ও সূক্ষ্ম জরিপ। সাধারণ বৈজ্ঞানিক পাঠকের উপযোগী করে তিনি ১৯২০ সালে তাঁর 'দেশ, কাল ও মহাকর্ষ' (Space, Time and Gravitation) নামক রচনা প্রকাশিত করেন। এ ছাড়া উচ্চ গণিত শিক্ষার্থীদের জন্য তিনি আপেক্ষিকতত্ত্ব সম্বন্ধে প্রামানিক বই রচনা করেছেন। পাঠকদের অবগতির জন্য উল্লেখ করা যেতে পারে যে, ঐ বৎসরেই অর্থাৎ ১৯২০ সালে ডক্টর মেঘনাথ সাহা ও অধ্যাপক সত্যেন্দ্র নাথ বসু আইনষ্টাইনের ১৯০৫ ও ১৯১৬ সালের আপেক্ষিকতত্ত্বের প্রবন্ধ দুটি আদি জার্ম্মান ভাষা থেকে ইংরাজীতে অনূদিত করে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হ'তে প্রকাশিত করেন। গোড়া থেকে এডিংটন ব্যোমপথে তারার গতি-বিষয়ক গবেষণার প্রতি আকৃষ্ট হয়েছিলেন ও এ বিষয়ে তিনি যথেষ্ট কাজ

করেন। ১৯০৪ সালে কাপিটিয়েন কর্তৃক আবিষ্কৃত তারকাস্রোত ও সে-সময়কার জ্যোতির্বিদ্যা সম্বন্ধে সমস্ত জ্ঞান উচ্চাঙ্গের গণিত সাহায্যে সঙ্কলন করে তিনি ১৯১৪ সালে "তারার গতি ও বিশ্বের গঠন" (On Stellar Movements and Structure of the Universe) গ্রন্থ প্রকাশ করেন।

তারার আভ্যন্তরীণ সংস্থান (Constitution) তাঁর আর একটি প্রধান গবেষণার বিষয় ছিল। ১৯২৬ সালে তাঁর বিখ্যাত বই "Internal Constitution of Stars" প্রকাশিত হয়। এ বিষয়ে গণিতশাস্ত্র সম্মত এই প্রথম প্রামাণিক বই। সাধারণ পাঠকের উপযোগী করে লেখা "Stars and Atoms" প্রকাশিত করেন ১৯২৭ সালে। তারার আভ্যন্তরিক উত্তাপ (প্রায় ৪০,০০০০০০ ডিগ্রী), ভারের সঙ্গে তারার উজ্জ্বলতার অনুপাত, সেফেইড জাতির তারা ও তাদের ঔজ্জ্বল্যের হ্রাস-বৃদ্ধির পক্ষ (৫॥ দিন) ও তা হতে অন্যান্য নীহারিকার দূরত্ব নিরূপণ, ঘনীভূত তারা, তারার অস্বচ্ছতা প্রভৃতি বিষয়ে তিনি বহু মূল্যবান গবেষণা করেছেন। প্রসঙ্গক্রমে বলা যেতে পারে যে, ১৯২০ সালে অধ্যাপক মেঘনাথ সাহার বিখ্যাত তত্ত্ব—উত্তাপ অনুপাতে পরমাণুর ইলেকট্রন সংস্থান,—প্রকাশিত হওয়ায় তারার আভ্যন্তরিক ও বহিস্থ উত্তাপ, চাপ এবং বর্ণছত্র সম্বন্ধে গূঢ় তথ্য উন্মোচিত হয়। এই ভারতীয় বৈজ্ঞানিক সম্বন্ধে এডিংটন লিখেছেন: "A great advance in this study was made in 1920 by Professor M. N Saha who first applied the quantitative physical laws which determine the degree of Ionization at any given temperature and pressure. He thereby struck out a new line in Astrophysical research which has been widely developed." তারার আভ্যন্তরিক সংস্থানের গবেষণায় অন্য একদিক থেকে কৃতকার্য্য হয়েছেন ব'লে আর একজন ভারতীয় বৈজ্ঞানিকের উল্লেখ করে তিনি লিখেছেন "The interesting point is that his solution invokes some of the most recent development of the Quantum Theory (The 'New Statistics' of Einstein and Bose)" এই গবেষক অধ্যাপক সত্যেন্দ্রনাথ বসু।

আধুনিক জ্যোতির্বিদ্যার বহু গূঢ় ও কূট প্রসঙ্গ এডিংটন উচ্চ-গণিতের আলোকপাতে পরিস্ফুট করেছেন ও অনেক নূতন অধ্যায়ের সূত্রপাত করেছেন। সম্প্রতি তিনি

Lemaitre-এর নীহারিকার অপসরণ থিওরির আলোচনায় মনোনিবেশ করেছিলেন। যেমন বৃহতের বেলা, তেমনি বস্তুর সূক্ষ্মরূপ—পরমাণু, ইলেকট্রন, প্রোটন সম্বন্ধেও তিনি বিশিষ্ট গবেষণা করেন। বিশেষতঃ প্রোটন ও ইলেকট্রন থেকে হিলিয়াম পরমাণুর গঠন বিষয়টি এখানে উল্লেখযোগ্য।

অপেক্ষিকতত্ত্ব সম্বন্ধে তাঁর উৎসাহ ও গবেষণার কথা পূর্ব্বেই বলা হয়েছে। যেমন এ তত্ত্বে দেশ কাল মহাকর্ষের একরূপ সমন্বয় সাধন করা হয়েছে,এডিংটন তেমনি এক সঙ্গে বৈদ্যুতিক আধান (charge) ও পরিস্থিতির (field) সমাবেশ করে এক মহা সমন্বয়ের (Unified Field Theory) চেষ্টা করেছেন। তাঁর আর এক সুদৃঢ় বিশ্বাস ছিল বিশ্বের এমন কয়েকটি আদি সংখ্যার অস্তিত্বে যা বিশ্বের সীমা, বস্তুকণিকার সংখ্যা ও মুক্ত ইলেকট্রনের দৌড়ের (free path) মধ্যে একটা গাণিতিক সূত্র স্থাপন করতে সক্ষম।

১৯২৭ সালে এডিংটন অক্সফোর্ডে "গিফোর্ড" বক্তৃতা দিতে আহূত হ'য়ে আধুনিক আবিষ্কারের দ্বারা বৈজ্ঞানিক চিন্তাধারার যে সব আমূল পরিবর্ত্তন সাধিত হয়েছে দার্শনিকের দৃষ্টিভঙ্গীতে তার আলোচনার প্রয়াস করেন। পর বৎসর এই বক্তৃতাটি সম্পাদিত করে তিনি "Nature of the Physical World" নামে প্রকাশিত করেন। আমাদের দেশের সুধী-সমাজ এ বইটির সঙ্গে সুপরিচিত। এডিংটন বলেন, সমস্ত বৈজ্ঞানিক আবিষ্কার আলোচনা করলে দেখা যায় যে পরিদৃশ্যমান বিশ্বের (External World) তত্ত্ব অনুসন্ধান করতে গিয়ে আমরা পাই কয়েকটি অঙ্ক (Pointer Readings)। সারা বিশ্ব দেশ কাল, বস্তু, ঊর্দ্ধ অধঃ, সূক্ষ্ম বিরাট সব শুদ্ধ অখণ্ড সূত্রে জড়িত। ভিতর থেকে আমরা তাকে উন্মোচন করে দেখার জন্য বিজ্ঞান ও গণিতকে যতই শানিত করি ততই কেবল নিত্য নব ও সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অঙ্কে প্রত্যাবর্ত্তিত হই ও পাই শুধু গুটি কয়েক পারস্পরিক সম্পর্ক (Relations)। তাঁর মতে বিশ্বের আসল বস্তু মন-বস্তু "To put the conclusions crudely—the stuff of the world is mind stuff. The mind stuff is the aggregation of relations and related which form the building material for the Physical World". উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, বিশ্বকে তিনি মায়া-মরীচিকা বলে উড়িয়ে দিতে চান নি; আসল (Real) বিশ্বে তিনি বিশ্বাস করেন। তিনি বলতে চেয়েছেন—বিজ্ঞান-শলাকায় আসল বিশ্ব অভেদ্য হলেও বিজ্ঞান-কথিত বিশ্বের সার্থকতা এই যে, তা সমস্ত দর্শক ও সমস্ত দৃষ্টিভঙ্গির একটা সর্ব্বগ্রাহ্য মিলিত আসর। আমাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে যদি

বিজ্ঞান ও গণিতের পরিভাষায় প্রাকৃতিক বিধিব সমষ্টিরূপে প্রকাশ কবা যায়, তবে সেই বিধি-সমষ্টি শুদ্ধ মননের দ্বাবা অভিজ্ঞতা বিনাও লাভ করা যায়—এই ছিল তাঁর বিশ্বাস। বলা বাহুল্য বৈজ্ঞানিকদেব ভিতব এডিংটনেব মতেব সঙ্গে অনেকেব পার্থক্য আছে।

১৯৩৮ সালের সায়েন্স কংগ্রেসেব যুবিলি অধিবেশনে আহূত হয়ে এডিংটন এদেশে আসেন ও পদার্থ বিজ্ঞান শাখাব সভাপতিত্ব কবেন। সে সেনেটে, ইণ্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েশন অফ সায়েন্স ও অন্যত্র অনেকগুলি বক্তৃতা করেন। অধ্যাপক সাহার সঙ্গে তিনি গভীর সখ্যতাসূত্রে আবদ্ধ ছিলেন ও তাঁব সঙ্গে চিঠিব আদান প্রদান করতেন। তিনি ছিলেন প্রগাঢ়ভাবে ধর্ম্মবিশ্বাসী, Quaker, আধুনিক যুদ্ধের প্রতি তিনি অত্যন্ত বিমুখ। যুদ্ধেব এই বিপুল প্রাণহানিতে কাতব হয়ে তিনি জনসমাজ থেকে প্রায়-বিচ্ছিন্ন হয়ে বাস কবছিলেন।

গিবিজাপতি ভট্টাচার্য্য

সম্মেলন

আগামী ৩রা ফেব্রুয়াবী, শনিবার, ১৯৪৫ হইতে "ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী-সঙ্ঘেব' তৃতীয় বার্ষিক সম্মেলনেব অধিবেশন কলিকাতায় আবম্ভ হইবে। শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দোপাধ্যায়, শৈলজানন্দ মুখোপাধ্যায়, মাণিক বন্দোপাধ্যায়, ডাঃ ধীবেন্দ্রনাথ সেন, শেখ গোমহানি প্রভৃতি সাহিত্যিক ও শিল্পীকে লইয়া সভাপতি মণ্ডল নির্বাচিত হইবে। সম্মেলন উপলক্ষে 'আমাদেব বাংলা' বিষয়ক শিল্প-প্রদর্শনী ; গণ-নাট্যেব অভিনয়, গণ-সঙ্গীত, 'জাতীয় সঙ্গীত' প্রভৃতিব বিশেষ জলসাব ব্যবস্থা হইতেছে, বাঙলার শিক্ষিত ও জনসাধাবণেব সর্ববিধ সৃষ্টি-প্রতিভাব পবিচয় প্রদানেব চেষ্টা এই সম্মেলনে হইবে।

গোলাম কুদ্দুস,
জ্যোতিবিন্দ্র মৈত্র } যুগ্ম-সম্পাদক

ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সঙ্ঘ হইতে সম্মেলনেব সময়ে প্রকাশিত হইবে।

নবজীবনের গান—(স্বরলিপি সমেত)

জাতীয় সঙ্গীত—(পূর্বাপর স্বদেশী গানেব সঞ্চয়ন)

শেষ-উইল

বুড়ো ভগবান নুয়ে নুয়ে চলে
ভুল বকে আর গাল দেয়
বস্তাপচানো কাশ্মিরী শাল
পাটে পাটে পোকাকাটা
শিথিল অঙ্গে জড়ায়।
শাদা ধবধবে রাজকীয় পাকা দাড়ী
লাল হ'য়ে গেছে কড়া তামাকের ধোঁয়ায়॥

বুড়ো ভগবান কুঁজো হ'য়ে চলে
পিঠে উইলের বস্তা
গোলমেলে এই তুনিয়ার সম্পত্তি—
কা'কে দিয়ে যা'বে ?
ভাবনায় সাবা মাথাটায় টাক ভর্ত্তি।
ভুল বকে আর অভিশাপ দেয়
পথের তু'দিকে কেবলি তাকায়
—এত বড় সম্পত্তি
কা'কে দিয়ে যা'বে ?
বারে বারে তাই পুরোনো উইল পাল্টায়॥

বুড়ো ভগবান নুয়ে নুয়ে চলে
তু'দিকে নোংরা বস্তি
হঠাৎ একটা ধূলোকাদামাখা ন্যাংটা ছেলে
বুড়োর সামনে ছুটে এসে বলে ঃ
"ও বুড়ো তোমার কি আছে পিঠের বস্তায় ?"

ভগবান মুখ খিঁচিয়ে ওঠে
ভুল বকে আর গাল দেয়
ন্যাংটা ছেলেটা ভয় পেয়ে গিয়ে
বস্তির দিকে ছোটে।

বুড়ো ভগবান হাবু-স্যাকরার দোকানে এসে
ঝুলি থেকে নিয়ে সনাতন হুঁকো কল্কে—
তামাক ধরায়। মাঝে মাঝে ওঠে কেসে
"আহা কচিমুখ ন্যাংটা ছেলেটা
ভুত্তোর!" ব'লে বুড়ো ভগবান আবার চলে—

বুড়ো ভগবান খুক্ খুক্ কাসে
ক্ষয়কাশে বুক ঝাঁঝরা,
ফুটপাতে ব'সে দম নেয় আব
কেঁপে ওঠে কোটি বছরের হাড় পাঁজরা
দম নিয়ে ফেব বিড় বিড় বকে
সংস্কৃত-চীনে-হিব্রু
বোঝা দায়। বোকা-মানুষ তাকায়
বুড়ো ভগবান মহারেগে যায়
রাজপথ দিয়ে হাঁটে আর পাকা
ভুরু কুঁচকিয়ে গাল দেয়।

বুড়ো ভগবান বড অসহায়, ঘোলা চোখে চায়
দু'দিকে নোংরা বস্তি
ছানিপড়া চোখে সন্ধ্যা ঘনায়
কাশ্মিরী শাল ধূলোতে লুটায়
কয়েকটা কুলী ছুটে আসে দূর থেকে

ধরাধরি ক'রে বুড়োকে শোয়ায়
সাবধানে ভাঙা খাটে।
মুদ্দফরাস মুখে জল দেয়
হারুডোম টাকে বরফ বুলায়
করিম কামার জোসেফ চামার
সারারাত জেগে থাকে।

ভোর হয়ে আসে। ভাঙা খাটিয়ার ধারে
আশেপাশে লোক ভর্ত্তি
বস্তির যত ধূলোকাদা মাখা ন্যাংটা ছেলের নামে
বুড়ো ভগবান লিখে দিয়ে যান্
নতুন উইলে তাঁর—
দুনিয়ার এই গোলমেলে সম্পত্তি।

বিমলচন্দ্র ঘোষ

ছায়া

কেন এ যক্ষার রক্ত যৌবনের উৎসব বাসরে,
গানের আসরে কেন কানে আসে শ্মশানের স্তব,—
প্রাণের আনন্দযজ্ঞে এল কোন অঘোর তান্ত্রিক,
মিলনের মধুলগ্নে কেন এ ক্লীবের কলরব ?

সুধার সমুদ্রকূলে কেন জাগে সুরার পিপাসা ?
উৎসবে মিশিতে চাই, কে আমার পথ করে রোধ ?
কোন প্রেত বারে বারে পাশে এসে ফেলে দীর্ঘশ্বাস,
আজীবন বঞ্চনার নিতে চায় পূর্ণ প্রতিশোধ ?

পশ্চাতে টেনো না আর, হে আমার বিষাক্ত অতীত !
আমার দূষিত রক্তে রুগ্ন কাম জাগায়ো না আর।
প্রাপ্তির পূর্ণিমারাত্রে ব্যর্থতার অন্ধকার হ'তে
সম্মুখে এসো না আর, হে মোহিনী কঙ্কাল আমার।

আলোকে আচ্ছন্ন দিন, নবজন্ম, নূতন সঙ্গিনী,
আঁচলে বাঁধিয়া বিষ তবু কেন আসো মায়াবিনী ?

সরোজকুমার দত্ত

আন্তরিক

বিধ্বস্ত এ হৃদয়ের ফাঁকে
একফালি রোদ এসে পড়ে—
বুঝি কোন আগ্নেয় ইঙ্গিতে
শিহরিত প্রাণটুকু নড়ে।

ছোট ছোট খণ্ডিত প্রহরে
অন্ধকার জমেছে স্নায়ুতে—
ঝলসানো অনেক মায়াই
ঝরে গেছে ক্ষণিক আয়ুতে।

কোন দিন যদি বা আয়াসে
মনে আসে বসন্ত-বাহার
কন্‌কনে উত্তুরে হাওয়ায়
করাতের দাঁতের প্রহার।

ক্রমে ক্রমে উত্তুঙ্গ আকাশে,
হৃদয়ের এই অনুভব
তারপর বেধেছে সেখানে
চেতনার ঘোরালো বিপ্লব।

বিধ্বস্ত সে হৃদয়ের ফাঁকে
একফালি রোদ এসে পড়ে—
বুঝি কোন আগ্নেয় ইঙ্গিতে
শিহরিত প্রাণটুকু নড়ে।

অশনি গুপ্ত

স্বপ্ন ও বাস্তব

অনেকক্ষণ পরে নিমাই একবার তাকাল তার হাতের শিশিটার পানে। অনুতাপ হয় ওর। এ কি ক'রল সে!

মাঝখান থেকে হরকুমার এসেই না বাধাল যত গণ্ডগোল। মা দিয়ে দিয়েছিলেন দশটি টাকা। তাই নিয়েই নিমাই চলেছিল মুখুয্যে মশাইর দোকানে, অনেকদিনের পাওনাটা শোধ ক'রতে। মুখুয্যে মশাই বলেছেন, টাকা শোধ না হ'লে আর ধারে মাল দেয়া হবে না। টাকা শোধ ক'রে আসবে আর সেই সঙ্গে এক শিশি সরষের তেলও নিয়ে আসতে হবে। তাই না চলেছিল নিমাই। কিন্তু কোথা থেকে হরকুমার এসে চেয়ে ব'সল ঠিক দশটি টাকা। ধার চায়।

সুরধুনীর বাবা হরকুমার। এসে অদ্ভুতভাবে হেসে বলে: "সুরো,—আমার মেয়ে সুরধুনী। ওকে একখানা কাপড় কিনে দিতে চাই। বাপ হ'য়ে আর এ সহ্য ক'রতে পারিনে। হাতে পেলেই আবার তোর এই টাকা কটা আমি শোধ ক'রে দেব।"

হরকুমার জানে কোথায় নিমাইর দুর্ব্বলতা। অভাব-অনটনের সংসারে কত রকমেরই না প্রয়োজন উপস্থিত হয় মুহূর্ত্তে—মুহূর্ত্তে। তাই চরম প্রয়োজনের ক্ষণে হরকুমার আজ আর পারে না নিজেকে সংযত রাখতে।

হরকুমার আড়চোখে চেয়ে দেখে নিমাইকে। নিমাইর দুটি স্তিমিত চোখের মধ্যে যেন বিদ্যুত খেলে যায়—অকস্মাৎ। মাছ টোপ গিলেছে। হরকুমারের মনে আর লেশমাত্র সন্দেহ নেই।

নিমাই পারল না হরকুমারকে বিমুখ ক'রতে। কাঁচা মনে নতুন প্রেমের রং। তাই দিয়েই ওর আনন্দ। কিন্তু···হঠাৎ খুট্ ক'রে লাগল যেন কোনখানটাতে। অনুতাপ হয়? ভুল ক'রলে না কি?

ঘন বনের প্রান্তে বাঁশের খুঁটির জীর্ণ ঘরখানি। তার গা ঘেঁষে, আর একখানি ছোটো পাকের ঘর। হরকুমারের বাড়ী।

চুপচাপ দাওয়ায় ব'সে হরকুমার হুঁকো টানছিল। এমন সময় নিমাইর অপ্রত্যাশিত আবির্ভাব। বেশ একটু বে-কায়দায় পড়ে গেল হরকুমার।

"এই যে নিমাই।" ব'লে হরকুমার যেন চীৎকার ক'রে উঠল।

ধীরে মন্থর পদক্ষেপে নিমাই দাওয়ায় এসে বসে। রৌদ্র-ক্লিষ্ট বিষণ্ণ মুখখানি তার করুণারই উদ্রেক করে। একটি এলোমেলো বিব্রত ভাব কিসের যেন সুস্পষ্ট ইঙ্গিত জানায়। কি যেন ব'লতে চায় নিমাই, ভাষা খুঁজে পাচ্ছে না। অবশেষে বহু কষ্টে মুহূর্ত্তের জন্য একটু দৃঢ়তা ফুটে ওঠে। কিন্তু দ'মে যায় আবার। বলে : "এমনি এলাম ইদিকে।" আবার অপ্রত্যাশিত ভাবেই চুপ ক'রে যায় নিমাই।

নিমাই এমনি আসেনি, তা হরকুমার স্পষ্টই বুঝতে পারে।

বেলা তখন মন্দ হয়নি। প্রায় দুটো। এতক্ষণ সে যে সারাগ্রামে এর-ওর কাছে দশটি টাকা হাওলাত চেয়ে চেয়ে ঘুরে বেড়িয়েছে, সে সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হরকুমার। তারপরে অনন্যোপায় হ'য়েই সে ফিরে এসেছে হরকুমারের কাছে। নিশ্চয়। প্রথম দৃষ্টিপাতেই সুরধুনীর বাবা তা বুঝে নেয়। নিমাইর মনের ছবিখানি সে স্পষ্ট দেখতে পায়।

হরকুমার অস্বস্তি বোধ করে। নিমাইকে আজ তার সহ্য হয় না। যথাসম্ভব চেষ্টা ক'রে নিজেকে সামলে নেয়। এদিকে চুপ ক'রে ব'সে আছে নিমাই। বিক্ষোভের পর যেন একটি প্রশান্ত প্রতিক্রিয়া ছেয়ে আসছে ধীরে ধীরে।

অন্যদিন হ'লে নিমাই কখনও এমন নির্লিপ্তভাবে চুপ ক'রে ব'সে থাকতে পারত না। ইতিমধ্যে কতবারই না ঘরের মধ্যে চকিত দৃষ্টি চালিয়ে চুরি ক'রে দেখতে চাইত! এক নিমেষের চোখোচোখির জন্যেও কত না ছল কত কৌশল। কিন্তু আজ নিমাইর কোন কিছুর হুঁস নেই। এমন কি ঘরখানির অভ্যন্তরের সাড়াশব্দহীন ঔদাসীন্য পর্য্যন্ত কোন কৌতুহলের উদ্রেক করে না।

হরকুমার কিন্তু নিঃসংশয় হ'তে পারছে না। হুঁকোটায় বার কয়েক সজোরে টান দিয়ে নিমাইকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে একবার দেখে নিয়ে এবং কণ্ঠস্বর কিছুটা মোলায়েম ক'রে এনে অনায়াসে বলতে থাকে : "যা উপকার ক'রেছিস্ নিমাই, কোনদিন তা ভুলবার নয়, (কণ্ঠস্বর সামান্য একটু কেঁপে ওঠে, কিন্তু বেশী সময় লাগে না সামলে নিতে) কাপড় পেয়ে কি খুশি সুরো! মার আমার কি যে আনন্দ! তখনকার সেই হাসিমুখ না দেখলে বুঝতে পারবিনে নিমাই।" এই ব'লে হরকুমার কপট গাম্ভীর্য্য নিয়ে ব'সে ব'সে আবার তামাক টানতে শুরু ক'রে দেয়।

নিমাই চেয়ে আছে।

মানুষের মন নিয়ে খেলা করবার এই নির্ম্মম কৌশল কোথা থেকে পেল হরকুমার?

হবকুমারেব শর-যোজনা ব্যর্থ হয় না। ভারাক্রান্ত আকাশপ্রান্তে কোথায় যেন এক ঝলক সোনালি বোদের আভাস খেলে যায়! নিদ্রোত্থিতের মত নিমাই তাকায় একবাব হরকুমাবেব দিকে। তারপবে চুপ ক'রে কি যেন ভাবতে থাকে! তাই ত, এ দিকটা ত সে এমনি ক'বে কোনো দিনই ভেবে দেখেনি। তারই টাকায় কেনা নতুন শাড়ী প'বে ঝল্‌মলিয়ে উঠেছে সুবধুনী। কি সুন্দবই না দেখাচ্ছে তাকে।

"আমি তোব কথাই ব'লেছি নিমাই।" ব'লে চলে হবকুমার, "হ্যাঁ, তোর কথাই ব'লেছি। নিমাই হাওলাত দিলে, তাইত কিনে আনতে পারলুম মা! কি ব'লব নিমাই, কি যে খুশি হল মা আমার।"

বিব্রতভাব প্রকাশ ক'রতে গিয়ে নিমাই এবাব ফুটিয়ে তোলে কেমন একটু বেদনাব আভাস।

সদ্য নির্গত একবাশ ধোঁযাব আড়াল থেকে হরকুমাব লক্ষ্য করে নিমাইকে। দেখে, উৎসুক দুটি চোখের দৃষ্টি এবাব ঘনঘন ঘরের ভেতর কাকে যেন অনুসন্ধান ক'রে ফিবে আসে।

"শাড়ী পেয়ে কি আর একমুহূর্ত্তও ঘরে মন টেকে। সবাইকে দেখাতে বার হ'য়ে প'ড়েছে।" ব'লে হবকুমার ঘন ঘন ধোঁয়া ছাড়ে।

নিমাইব মুখ ভ'রে যায় বিব্রত হাসিতে।

"তোর এ টাকা আমি বেশি দিন ফেলে রাখব না নিমাই।" ব'লে চলে হবকুমাব, "হাতে এলেই শোধ দিয়ে দেব।"

অপ্রতিভ নিমাই এবাব সপ্রতিভ হ'য়ে পড়ে, "ওর জন্যে ভাববেন না। কটাই বা টাকা! দিতে পাবলে দেবেন, না পারলে না দেবেন।" নির্ভয়ে স্পষ্ট ভবসা জানায় নিমাই।

পবক্ষণেই ম্লান হ'য়ে গেল নিমাই। এ হাসিব অর্থ হঠাৎ ধরা পড়ে গেল তাব নিজেবই কাছে।

"আমি এবার যাই।" একটু বিচলিতভাবে বলল নিমাই।

"হুঁ", হবকুমার হুঁকোটা বেখে কেসে গলাটা একটু পরিষ্কার ক'রে নিলে।

"মা ভাবছে।" বললে নিমাই।

কণ্ঠস্বব তার ভারী হয়ে ওঠে। একটা অসহ আবেগ বুক পর্য্যন্ত এসে আবার মিলিয়ে যায় ধীরে ধীবে।

কেমন যেন এক অনভিপ্রেত গুমোটের আবহাওয়া। কিছুটা হাল্‌কা করা প্রয়োজন। তাই মুখে যা আসে, তাই ব'লে চলে হরকুমার—অনর্গল।

অন্যমনস্ক নিমাই ভাবছে তার বাড়ীর কথা, মার কথা। মার কর্ম্মনিরত নীরব ম্লান মুখখানির কথা মনে পড়ে। মা সত্যি কত কষ্ট করে। কত কষ্ট হয় তার। বাবা মানুষ নন। অনটনের সংসার, মা না থাকলে কি যে অবস্থা হ'ত। আজও যে সব দিক বজায় রেখে সংসার চ'লছে—সে ত কেবল অমন মায়ের জন্যেই। তারই গায়ের রক্ত-জল-করা টাকা দশটি এভাবে নষ্ট ক'রে মন যেন কিছুতেই প্রবোধ মানছে না নিমাইর।

শেষ মধ্যাহ্নের ঝিরঝিরে হাওয়া বয়ে যায়। এক-পা দু-পা করে পথ চলছে নিমাই। ঐ ত হরকুমারের বাড়ী, বেশী দূরে নয়। বনের ফাঁকে ফাঁকে ঘরের চালাখানি উঁকি দিয়ে চেয়ে থাকে বহু দূর পথ পর্য্যন্ত।

পুরোনো বন। দূর দূরান্ত থেকে কত লোক আসে দল বেঁধে কাঠ কুড়োতে সেখানে।

সারা দুপুর কাঠ কুড়িয়ে সুরধুনী রওনা হয়েছে বাড়ীর পথে। পথের মধ্যে নিমাইকে দেখে ঘাড়ের বোঝা নামিয়ে নেয়, বলে: "আমাদের বাড়ী গিয়েছিলে? হুঁ, আর বেশী যেয়ো না।" দুটি চঞ্চল চোখ যেন ঝিলিক দিয়ে কথা ক'য়ে ওঠে, "বাবা টের পেয়েছে।"

চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে থাকে নিমাই। ওর ক্লান্ত, মলিন মুখ। নজরে পড়ে না সুরধুনীর। কোথায় নতুন শাড়ী? একখানি পুরোনো মলিন আটপৌরে কাপড়, বেশ আঁটসাট করে পরা। কোমরে দিয়েছে শক্ত করে আঁচলের প্যাঁচ, পায়ের কাপড় উঠে এসেছে প্রায় হাঁটু পর্য্যন্ত। নিমাই নিশ্চয় চেয়ে আছে এক দৃষ্টে।

সুরধুনী চল্‌কে ওঠে। মুখে চোখে ফোটে এক সম্মোহনী ভঙ্গী, বলে: "অসভ্য"। বলেই সঙ্গে সঙ্গে কাপড়ের প্রান্তখানি টেনেটুনে নিজেকে আবৃত ক'রে নেয় যথাসম্ভব।

মিথ্যা, মিথ্যা, সব মিথ্যা! হরকুমার প্রতারণা ক'রেছে। ঝিম্ ঝিম্ করে নিমাইর মাথার ভেতরটা।

"জানো?" বলে চলে সুরধুনী, "বাবা কাল দেখে ফেলেছে তোমাকে, দেখুকগে আর একটা জায়গা ঠিক ক'রেছি। আগের চেয়েও ভালো। ওই যে, ওই হোথা।" ব'লে দেখিয়ে দেয় অদূরের একটি ঝাপ্‌সা গাছের ছায়াচ্ছন্ন তল।

পাখীর নিস্তেজ কণ্ঠস্বর। বেলা শেষের মন্থর বাতাসে নাম-না-জানা বুনো ফুলের গন্ধ। সচকিত ক'রে দিয়ে যায় নিমাইকে। ঐ ডুমুর গাছের তলায় দিনের শেষে কতদিন যে মিলনের কাহিনীরচনা শুরু ক'রেছিল তারা, দু'জনে গোপনে গোপনে এখন তা ক্ষণিক বিদ্যুতের মতন হয় ত একটুখানি আঁচড়ও কেটে যায় মনে।

"বাবার কাছে গিয়েছিলে বুঝি? একটু গম্ভীর হ'য়ে প্রশ্ন করে সুবধুনী।

নিমাই ব'লবে। হ্যাঁ, নিশ্চয় বলবে। সব কথা খুলে ব'লবে সুবনধুীকে। বলে, একটু ইতস্ততঃ ক'রে; "তোর বাবা সকালে দশটা টাকা ধাব নিয়ে ব'লে এসেছিল আজই তোকে সাড়ী কিনে দেবে।"

"এ্যাঁ" আর্ত্তনাদ ক'বে ওঠে সুবধুনী, "বলছ কি? বাবাকে দিয়েছ টাকা! তবেই হয়েছে। বোকা, বোকা, একেবাবে বোকা তুমি। তাকে কেন দিতে গেলে, বাবাকে তুমি চেন না! ও টাকা দিয়ে আমাকে সে কখ্খনো শাড়ী কিনে দেবে না। ফাঁকি দিয়েছে। ও-সব নিজেব জন্য খবচ ক'ববে।"

ক্ষণকাল দাঁডিয়ে থানিক কি যেন চিন্তা ক'বে নিয়ে অপ্রত্যাশিতভাবে সুরধুনী ছুটে চলে বাড়ীব দিকে। কিন্তু কিছুদূর গিয়েই থমকে দাঁড়ায়। ফিবে আসে। কোন কথা না ব'লে কুড়োনো কাঠেব বোঝাটি আবার ঘাড়ে তুলে রওনা হয়। এবাব কিন্তু চলনে আব সেই ক্ষিপ্রতা নেই।

খানিকবাদে দাঁড়িয়ে দাঁডিয়ে নিমাই শুনতে থাকে হরকুমারের বাড়ীর কলহের কোলাহল। এই ত শান্ত ছিল সব। এবই মধ্যে কি ডাকাত প'ড়ে গেল সেখানে?

নিমাই আব একটু এগিয়ে যায়।

সুবধুনী দাবী জানায়,"ও টাকা আমাব",হবকুমারও জবাব দেয়—"হুঁঃ, এ টাকা ওর!"

মেয়ে বলে—"আমাবইত, আমার নাম করেইত এনেছ।"

বাপ বলে, "বেশ করেছি।"

নির্লিপ্তভাবে নিমাই ঠায় দাঁডিয়েই আছে, শেষ মধ্যাহ্নের শান্ত উদাস হাওয়ায় অস্নাত কয়েকগুচ্ছ রুক্ষ চুল উড়ে এসে পডে তার কপালের উপব। হাসি পায় নিমাইব —ঐ হাসির সঙ্গে কোথায় যেন কয়েক ফোঁটা জলও জমা হয়ে আছে।

হরকুমারের বাড়ীর কলহ যথারীতি থেমে গেছে। বোধ হয় একটা মীমাংসায় এসে গেছে তারা, আর কিছুক্ষণের মধ্যে এই কলহের আব কোন ছাপই হয় তো থাকবে না। বাবা তামাক চাইবে। মেয়ে কলকে সেজে হুঁকো এনে দিয়ে যাবে, হরকুমাব টানবে;

কাসবে, হাসবে। আর স্নুরধুনী? আজ তারও গর্ব্বের আর অন্ত নেই। বোধ হয় বুক ফুলিয়েই হেঁটে বেড়াবে ঘরময়।

অস্নাত অভুক্ত নিমাই খানিক দাঁড়িয়ে থাকে এক অপরিসীম বৈরাগ্যে।

মণ্টু রায়

পত্রিকা-প্রসঙ্গ

পুরানো 'পরিচয়'-এর পাঠকদের মনে থাকিতে পারে যে, ১৩৪৩-এর ফাল্গুন সংখ্যায় একটি বিদেশী গল্পের অনুবাদ প্রকাশিত হয়—যার নাম ছিল, "নিশান।" নাৎসি জার্মানির একটি সুবৃহৎ ফ্যাক্টরির গগনস্পর্শী চিমনির মাথায় শ্রমিক শ্রেণীর মিলন-প্রতীক লাল নিশান উড়াইয়া দিতে হইবে, এই সংকল্প লইয়া নিশীথ রাত্রে দু-জন শ্রমিকের সফল অভিযান,—সংক্ষেপে ইহাই ছিল গল্পটির বিষয়বস্তু। এ ধরণের গল্প আজকের দিনে আমাদের কাছে অতি-পরিচিত হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এ গল্পটি অনুবাদের জন্য গৃহীত হইয়াছিল বছর দশেক পূর্ব্বে প্রকাশিত মস্কোতে মুদ্রিত "ইণ্টার-ন্যাশনাল লিটারেচার" নামক মাসিক পত্রিকার প্রথম বর্ষের কোনো একটি সংখ্যা হইতে। সে সময়ে এ ধরণের গল্প ইউরোপের অন্য কোন কাগজে স্থান পাইয়াছে, তাহা আমাদের জানা নাই।

ইণ্টারন্যাশনাল লিটারেচার প্রকাশিত হইত চারিটি ভাষায়—রুশ, জার্মান, ফরাসী ও ইংরাজী। বিভিন্ন দেশের প্রগতিবাদী ধারার সাহিত্য—কবিতা, নাটক, প্রবন্ধ, কাহিনী ইত্যাদি—ইহাতে আলোচিত হইত। যে রচনায় দেশের অধিকাংশের সুখদুঃখের অভিজ্ঞতার প্রকাশ থাকিত, তাহাকেই ধরা হইত প্রগতি-ধারার অন্তর্ভুক্ত। রাজনৈতিক বা অর্থনৈতিক মতবাদের সহিত তাহার সাক্ষাৎ সম্বন্ধ থাকিবার কোনো প্রয়োজন ছিল না। এই একখানি পত্রিকার সহায়তায় ইউরোপের অগ্রগামী দেশগুলির উন্নততর সাহিত্যিক প্রচেষ্টার সহিত সহজেই পরিচয় লাভ করা যাইত।

হঠাৎ একদিন দেখা গেল, উক্ত পত্রিকার প্রচার এদেশে বন্ধ হইয়া গিয়াছে। তখনকার দিনের ভারত সরকারের সোভিয়েট-প্রীতি সুপরিজ্ঞাত, তাহার উপর মন্তব্য নিষ্প্রয়োজন। এখন দেখা যাইতেছে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের নির্ম্মম বিধানে সেই

পত্রিকা আবাব প্রকাশ্যভাবে ভারতবর্ষের পাঠকের করায়ত্ত হইয়াছে। ইহাকেই বলা যায়, ইতিহাসের পরিহাস।

সম্প্রতি এই পত্রিকার কয়েক সংখ্যা আমাদের হাতে আসিয়াছে—১৯৪৩-এর জুন সংখ্যা হইতে ১৯৪৪-এব এপ্রিল পর্য্যন্ত। নাড়িতে চাড়িতে পূর্বস্মৃতি জাগিয়া উঠিল ও 'পবিচয়'-এর পূর্ব্বতন সম্পাদনাব প্রতি শ্রদ্ধাও জাগিল যে, অত আগেই সাহিত্য ক্ষেত্রে এই নবাগত অতিথির সহিত যোগসূত্র স্থাপন কবার দূবদৃষ্টি তাঁহাদের ছিল।

ইহা স্বাভাবিক যে, গত দশবছবের বিশ্বব্যাপী আলোড়নের আঘাতে এই পত্রিকাটিবও আকৃতি ও প্রকৃতিতে কিছু পবিবর্ত্তন ঘটিয়াছে। উহা এখনও পূর্ব্বোক্ত চাবিভাষায় প্রকাশিত হয় কিনা জানা যাইতেছে না, তবে ইংবাজী সংস্করণ ত হাতের কাছে রহিয়াছে। ইউরোপেব বিভিন্নদেশেব সাহিত্যসৃষ্টিব পরিচয় দেওয়া এখন আর সাধারণভাবে সম্ভব নয়, তবে বিদেশের কথা যে একেবারে বাদ পড়ে তাহাও নহে। তবু ইহা সত্য যে, এখন ইহাকে প্রধানতঃ সোভিয়েট ইউনিয়ন-এব সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার উপর নির্ভব কবিতে হয়। মনে হয়, দুই কাবণে, তাহাতেও তাহার আন্তর্জ্জাতিকতাব ব্যত্যয় হয় নাই। প্রথম, সোভিয়েট ইউনিয়নেব সীমানার মধ্যে বহু বিভিন্ন জাতিব বসবাস, যাহাদেব সাহিত্য চর্চ্চা এই পত্রিকার মাধ্যমে সোভিয়েটের বাহিবে লোকচক্ষুব গোচর হইতেছে; দ্বিতীয, সোভিয়েট দেশসমূহে, বিশেষতঃ সোভিয়েট রাশিয়ায় এখন যে ঐশ্বর্য্যবান সাহিত্য সৃষ্টি হইতেছে, ও অভিনব সংস্কৃতি গড়িয়া উঠিতেছে তাহাব আন্তর্জ্জাতিক গুরুত্ব শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই অকুণ্ঠে স্বীকাব করিতে সম্মত হইবেন।

জাতীয় সত্তার মবণোপম সঙ্কট সত্বেও সোভিয়েট দেশে সংস্কৃতির যে ক্রমভঙ্গহীন অনুশীলন চলিতেছিল তাহার প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসিলে বিস্ময়ে বিচলিত না হইয়া পারা যায় না। সঙ্কট-অতিক্রমণেব সে অনুশীলনেব মাত্রা কি প্রচণ্ডবেগে বাড়িয়া যাইবে তাহা আমাদেব পক্ষে কল্পনা কবাও দুঃসাধ্য! পত্রিকাটির প্রথম বিভাগে থাকে, সাময়িক মন্তব্য। বলা বাহুল্য, ইহা মুখ্যতঃ যুদ্ধেব গতিপ্রকৃতিব সহিত সংশ্লিষ্ট। এ বিভাগেব লেখকদেব মধ্যে আছেন, সোভিয়েটেব আলেক্সী টলস্টয়, ফ্রান্সের জঁা রিসাব ব্লক, অষ্ট্রিয়ার ভাইনবের্গের প্রভৃতি। স্পেনের অবস্থা, তেহেবান সম্মেলন সম্বন্ধেও আলোচনা আছে। ১৯৪৪-এর জানুয়ারী সংখ্যায় (লেনিনেব মৃত্যু মাস) আছে "লেনিন ও সাহিত্য" শীর্ষক প্রবন্ধ।

দ্বিতীয় বিভাগ, শিল্প-সাহিত্য। লিয়োনোভ, শোলোকভ, সোবোলেভ, সিমোনভ, গ্রোসমান, গর্বাটভ প্রভৃতি বিশ্রুতকীর্ত্তি লেখকদের নাটক, গল্প ও উপন্যাস এই বিভাগের মেরুদণ্ড। নব জাগ্রত জাতিসমূহের সাহিত্যিক সৃষ্টিও এই বিভাগে স্থান পায়। কবিতা সকল সংখ্যায় থাকে না, বোধ হয় কবিতার অনুবাদ ও অনুবাদের অনুবাদ (কারণ অনেক সময় অন্য ভাষার কবিতা রুশ ভাষায় অনূদিত হইলে তবে ইংরাজী অনুবাদ করা সম্ভব হয়) সহজলভ্য ও সুপাঠ্য নহে বলিয়া। ১৯৪৩-এর জুন সংখ্যায় Three Lachian Poems নিশ্চয়ই উপভোগ্য রচনা। বিজ্ঞান বিষয়ে বিশ্ববিখ্যাত বৈজ্ঞানিক কাপিট্সা, ভাভিলভ ও মেণ্ডেলিয়েফ সম্বন্ধে আলোচনা উল্লেখযোগ্য। গ্রন্থ ও গ্রন্থকার বিভাগে মায়াকোভ্স্কি, আলেক্সী টলস্টয় প্রভৃতি সাম্প্রতিক লেখকের বিচার ছাড়াও শেকস্পিয়ার, টুরগেনেভ ও প্রসিদ্ধ ইতালীয় কবি তাস্সো সম্বন্ধে যে সব আলোচনা আছে তাহাতে আমাদের দেশের পণ্ডিতেরাও উপকৃত হইতে পারেন। শিল্প বিভাগে থাকে চিত্র, সঙ্গীত, নৃত্য, নাটকাভিনয়, (যথা, উজবেক দেশে ওথেলো ও হেম্লেট), ফিল্মের (যথা, স্টালিনগ্রাড, রেন-বো, লেডি হ্যামিলটন, পিগম্যালিয়ন) সমালোচনা। উল্লেখ করা প্রয়োজন যে ফিল্ম সম্বন্ধে এমন সুনিপুণ সাহিত্যিক সমালোচনা আমরা অন্যত্র কোথাও দেখি নাই।

"অগ্র ও পশ্চাৎ" বিভাগে সোভিয়েটের মধ্যে নানারূপ সাংস্কৃতিক প্রচেষ্টার বিবরণ, যেমন য়ুরাল প্রদেশে সাহিত্যিক সম্মেলন। আর থাকে, মলাট হইতে আরম্ভ করিয়া যেখানে সেখানে ছড়ানো সোভিয়েটের অদ্ভুত কীর্ত্তি কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্র। বোরিস য়েফিমেভ যে কতবড় শিল্পী তা এখন অনেকেই জানেন; ইংলণ্ডের বিখ্যাত কারটুনিষ্ট ডেভিড লো তাঁহার গুণপনায় মুগ্ধ। প্রায় প্রতিসংখ্যাতেই তাঁহার বা অন্য কাহারো ব্যঙ্গচিত্র এই পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। শিক্ষা ও আনন্দ পাইবার এই পরিমাণ উপকরণ একটাকায় পাওয়া নিশ্চয়ই বাঙালী শিক্ষিত পাঠক দুর্মূল্য মনে করিবেন না। যাঁহারা মাসে মাসে নগদ কিনিতে চান বা এককালীন গ্রাহক হইতে অভিলাষী, তাঁহারা ন্যাশনাল বুক এজেন্সিতে (১২, বঙ্কিম চ্যাটার্জ্জি ষ্ট্রীট, কলিকাতা) অনুসন্ধান করিবেন।

নীরেন্দ্রনাথ রায়

নবকুমারের উপন্যাস

অনেক ভেবে চিন্তে নবকুমার তাব উপন্যাসের ভূমিকাটা এই ভাবেই শুরু করল :

"স্বর্গরাজ্য থেকে শয়তান এবং তার অনুচববৃন্দ বিতাড়িত হয়েছে।...

"জ্বলন্ত হ্রদে শয়তানের প্রথম জাগরণ হ'ল। মানতে হ'ল তার এই হীন নির্বাসন। কিন্তু তাব উদ্ধত শির নত হ'ল না, সে বলল—নরকই আমার স্বর্গ, কেননা স্বর্গ আর নবক মনেবই সৃষ্টি, মনের বাইরে ওদের কোনো সত্তা নেই।...আর যাই হোক এখানে আমরা স্বাধীন।

"তৈবি হ'ল প্যাণ্ডিমোনিয়াম্। সভা বসল সেখানে। আলোচনা চলল—ঈশ্ববেব নবনির্মিত জগৎকে ধ্বংস করতে হবে, অথবা দখল করতে হবে, অথবা সেখানকার বাসিন্দাদেব দলে টানতে হবে। যেমন ক'রে হোক প্রতিশোধ নিতে হবে।

"তাবপর বহু ঘটনাব ভিতর দিয়ে শয়তানের পরিকল্পনা রূপ গ্রহণ করতে লাগল।

"তাবপব এল ইডেনেব দৃশ্য। আদম আব ঈভ—পরম সুখে দিন কাটাচ্ছে। কিন্তু শয়তানেব ষডযন্ত্র নিষ্ফল হবে না।

"র‍্যাফেল প্রেবিত হ'লেন স্বর্গ থেকে, আদমকে সাবধান করতে; আদমেব পতন অনিবার্য, কিন্তু তাব আগে সে জানুক তাব কি হবে, সে সজ্ঞানে নিজের ভাগ্য গড়ে তুলুক।

"তাবপব এল চরম মুহূর্ত। ঈভেবই দোষে আদম আর ঈভ পরস্পব পৃথক ভাবে সেদিন কাজে গেল। শয়তানেব শুভ সুযোগ। সে সাপের মূর্তি ধরল। ঈভ একা—তাকে সে নানা ছলে ভুলিয়ে নিষিদ্ধ ফল খেতে বাধ্য করল। ঈভ ডুবল, আদমকেও ডোবাল।"

এব পর থেকে শুরু হয়েছে নবকুমারের নিজের কাহিনী। সেই কাহিনীব সঙ্গে এই ভূমিকার অবিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। উপন্যাস যতই এগিয়ে গেছে ততই এই ভূমিকাটির সার্থকতা বেশি কবে ফুটে উঠেছে। নবকুমাবের উপন্যাসখানি এই ভূমিকাযোগে নবতর বৈশিষ্ট্য লাভ করেছে।

- মাসিকপত্র সম্পাদকেব ঘর।

ঈশ্বরের বিচার শেষ হয়েছে; সম্পাদকেব বিচার শুরু হবে।

নবকুমারের প্রথম উপন্যাস। কত বিনিদ্র রজনীর স্মৃতিভরা, কত আশা আনন্দের স্পর্শমাখা এর প্রতিটি পৃষ্ঠা। আজ সে দ্বিধা-কম্পিত হৃদয়ে এসেছে সম্পাদকের দ্বারে। তার ইচ্ছা উপন্যাসখানি মাসে মাসে ছাপা হয়।

সম্পাদক আগ্রহের সঙ্গে শুনতে রাজি হয়েছেন। অল্প খরচে মাসিক চালানোর উপর তাঁর চাকরি নির্ভর করছে। নবকুমার বিনা পয়সায় উপন্যাস দেবে; উপন্যাস শোনার পক্ষে একটা মস্ত বড় তাগিদ। কি জানি যদি ভাল লেখাটাই হাতছাড়া হয়ে যায়।

খুব উৎসাহের সঙ্গেই নবকুমার পড়তে আরম্ভ করল। কণ্ঠে তার আবেশ, উচ্চারণ স্পষ্ট এবং মধুর। ভূমিকা শেষে আসল কাহিনীর আরম্ভ। পাতা ওল্টাবার আগেই সম্পাদক বললেন, থামুন!

নবকুমার চমকিত হল। সম্পাদকের ঐ কথাটি যেন একটা গুলির-মতো-তার বুকে এসে বিঁধল।

সম্পাদকের মনশ্চক্ষে ফুটে উঠল তাঁর মালিকের চেহারা। সেই দিনই তিনি অফিসে এসে বলে গেছেন, 'ভাল উপন্যাস সংগ্রহ কর সম্পাদক'। যুদ্ধের বাজারের উদ্বৃত্ত লাভে জন্ম নিয়েছে তাঁর কাগজ। মূল্যহীন লেখা তাঁর কাগজে স্থান পেয়ে মূল্যবান হয়ে উঠবে, মূল্যহীন লেখকেরা ধন্য হবে। লাভের কিছু অংশ এইভাবে তিনি ব্যয় করছেন দেশসেবায়।

নবকুমার অস্বস্তি বোধ করতে লাগল। সম্পাদকের চেহারা, তাঁর বিনীত ব্যবহার এবং সহানুভূতিপূর্ণ ভাষায় এতক্ষণ সে যতখানি উৎসাহিত হয়েছিল, সে উৎসাহ ঐ একটি কথায় তার নিবে গেল। ঐ ছোট্ট মানুষটি দৈবক্রমে সম্পাদকীয় চেয়ারে বসেছে ব'লে সে কি তার এত যত্নের সৃষ্টিকে বিনা বিচারে মৃত্যুদণ্ড দেবার অধিকার পেয়েছে?… তবে কি বিচারবুদ্ধি তাঁর নেই? অথবা বিদেশী পৌরাণিক কাহিনী ব'লেই তাঁর আপত্তি?

কিন্তু 'থামুন' কথাটি তো খুব স্পষ্ট নয়। চিন্তারত সম্পাদকের মুখের দিকে চেয়ে নবকুমারের সন্দেহ হ'ল, তবে কি তিনি মনে করেছেন আমি প্যারাডাইস্ লষ্টের গল্পটি চুরি ক'রে নিজের বলে চালাচ্ছি?

কিন্তু তার অমূলক সন্দেহ দূর ক'রে সম্পাদক বললেন, আপনার ভাষা ভাল, বর্ণনার ভঙ্গী চমৎকার, কিন্তু ভূমিকাটি—

নবকুমার উৎসাহের সঙ্গে বলল, ওরই মধ্যে আমার কাহিনীর ছায়া ভাসছে।

সম্পাদক আবার চিন্তানিবিষ্ট হ'লেন।

আচ্ছা, ভূমিকায় যেটুকু আপনি বলেছেন মাত্র ঐ টুকুকেই কি একটা রূপক কল্প করা যায় না?

কেন যাবে না? ওটা আসলে তো রূপকই।

তা হ'লে ও-থেকে কি গল্পটির সম্পূর্ণ আভাস পাওয়া যাচ্ছে না? আপনি যে বলেছেন আপনার মূল গল্প ওতে প্রতিবিম্বিত হ'চ্ছে।

কিন্তু আভাসই পাওয়া যাচ্ছে, গল্পটা পাওয়া যাচ্ছে না। গল্প পেতে হ'লে সবা পড়তে হবে।

সবটা পড়ার জন্যে নবকুমার উস্‌খুস্‌ করতে লাগল।

কিন্তু লেখকেরা যখন বিগলিত, সম্পাদকেরা ঠিক সেই সময়েই প্রস্তরীভূত।—সম্পাদকের চোখের সম্মুখে ফুটে উঠছে তাঁর মালিকের ছবি!—'ভাল উপন্যাস সংগ্রহ ক সম্পাদক'।

নবকুমার বলল, তা হ'লে পড়ে ফেলি সবটা?

সম্পাদক সে কথায় কান না দিয়ে বললেন, আমি এর রূপক অংশটি যদি এইভাবে ভাঙি—

নবকুমার সাগ্রহে সম্পাদকের দিকে চাইল।

আধুনিক কালের কতকগুলো ঘটনার সঙ্গে যদি মেলাতে চেষ্টা করি?

নবকুমার শঙ্কিতভাবে বলল, কিন্তু আমার এ লেখাটাকে একটা চিরন্তন কালে সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করেছি!

চিরন্তন কালের কোনো সত্য নেই, শুনুন আমি এর একটা অর্থ করছি।

নবকুমার নিরুপায় ভাবে চাইল সম্পাদকের দিকে।

সম্পাদক বলতে লাগলেন, আপনার ঐ সেটানকে ধরা যাক ব্ল্যাকমার্কেটে মজুতদার। সে জোচ্চুরি ক'রে ব্যবসা করতে চায় ব'লে সমাজ থেকে বিতাড়িত হয়েছে। এসেছে সে ব্ল্যাক মার্কেটের আড়তে। এই আড়ৎ হচ্ছে আপনার প্যাণ্ডি মোনিয়াম্।

নবকুমার এবারে পাথর হ'ল।

সম্পাদক বলতে লাগলেন, কিন্তু ব্ল্যাক মার্কেটে এসে তার কাজ সহজ হ'ল না।

এখানে হোমরা-চোমরাদের দলে টানতে না পারলে সহজে কিছু করা যাবে না, তাই সে তার আসল রূপ ধরল—সাপের রূপ। সাপ সেজে সে গেল যথাস্থানে ঘুঁস দিতে। কত ছলনা ভরা কথায় সে ভোলাল এক বড়কর্তাকে। ঈভকেই ধরা যাক এই বড়কর্তা। কেননা যারা ভোলে তারা পুরুষ হ'লেও আসলে নারীধর্মই তাদের মধ্যে প্রবল। অথবা ঈভকে বড়কর্তার গৃহিণীও ধরা যেতে পারে।

নবকুমারের কপালের শিরা দপ দপ করছে, কান গরম হয়ে উঠেছে।

সম্পাদক মৃদু হেসে বললেন, এমন একটা অর্থ কি করা যায় না?

নবকুমার মনের ভাব যথাসাধ্য গোপন ক'রে সংক্ষেপে বলল, যায় বোধ হয়, কিন্তু তাতে লাভ কি?

সম্পাদক আবার ভাবতে লাগলেন।

কিছুক্ষণ দুজনেই নির্বাক। হঠাৎ সম্পাদক প্রশ্ন করলেন, আপনার এ লেখা আর কোথাও ছাপাবার চেষ্টা করেছেন?

না।···তা হ'লে রেখে যাব এটা?

সম্পাদক গম্ভীরভাবে বললেন, রেখে যান।

নবকুমার পরদিনই একখানা চিঠি পেল, এবং ঐ সঙ্গে লেখাটিও। সম্পাদক লিখেছেন, "আমাদের সম্পাদকীয় সঙ্ঘ (এইটে সম্পাদকের মিছে কথা, কেননা কাগজের একমাত্র তিনিই সম্পাদক) দুঃখের সঙ্গে বিবেচনা করেন, আপনার উপন্যাসখানা আমাদের কাগজে প্রকাশ করা চলতে পারে না। আমি নিজে যে সন্দেহ করেছিলাম, আমাদের সম্পাদক-সঙ্ঘও সেই সন্দেহ করেছেন যে, আপনি সেটানকে উপলক্ষ ক'রে আমাদের কাগজের মালিকের চরিত্র এঁকেছেন। হয় তো এটা আপনি সজ্ঞানে করেননি, কিন্তু আপনার রূপক ভাঙলে যা দাঁড়ায় তাতে আর সন্দেহের অবকাশ থাকে না। আপনি নবীন লেখক, আপনার প্রতি আমাদের সহানুভূতি আছে, তাই আপনাকে দুটো ভাল কথা বলি। আপনি ভবিষ্যতে এ রকম কোনো মহাকাব্যের রূপক-মণ্ডিত ক'রে কোনো কাহিনী দাঁড় করাবার চেষ্টা করবেন না। দিনকাল বড় খারাপ, এ সময়ে বিশেষ ক'রে সেটানের চরিত্রের বিরুদ্ধে কোনো কিছুই লেখা আপনার পক্ষে নিরাপদ নয়। আপনার এই উপন্যাস প্রকাশ হ'লে শুধু আমাদের মালিক নন, আরও অনেকে রুষ্ট হবেন, কে কে হবেন তা

আমবা জানি। অকারণ বিপদ ডেকে আনবেন না। আমার একান্ত অনুবো
আপনার পাণ্ডুলিপি আপাতত আপনি বাক্সে বন্ধ ক'রে রাখুন, যুদ্ধেব পবে খুলবেন
ইতিমধ্যে বেদান্তের পটভূমিতে যদি কোনো গল্প লিখতে পারেন চেষ্টা করুন, আম
তা সানন্দে প্রকাশ করব।"

শ্রীপবিমল গোস্বামী

পুস্তক-পরিচয়

রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন। শ্রীপ্রমথনাথ বিশী।
বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য আড়াই টাকা।

লেখকেব ও প্রকাশকেব দ্বৈত কৃতিত্বেব ফলে এই বইটি উল্লেখযোগ্য হয়েছে। এম
সুসজ্জিত অথচ বাহুল্যবর্জিত বই ইতিপূর্বে বাংলায় দেখেছি মনে পড়ে না; একদিকে
রচনার উৎকর্ষ, অপর পক্ষে ছাপা, বাঁধাই ও চিত্র-সমাবেশের রুচি, দুই-ই সমা
প্রশংসনীয়।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী বর্তমান বাংলার অন্যতম শ্রেষ্ঠ গদ্যলেখক হিসাবে ইতিপূর্বে
যথেষ্ট প্রতিষ্ঠালাভ কবেছেন। 'রবীন্দ্রনাথ ও শান্তিনিকেতন' এই প্রতিষ্ঠাকে দৃঢত
করবে। শান্তিনিকেতনেব এমন অন্তরঙ্গ ও ব্যাপক ছবি আব কেউ আঁকতে পারে
নি। যে অভিজ্ঞতার ফলে এই ছবি তিনি আঁকতে পেরেছেন তা অর্জিত হয় বহু বৎস
শান্তিনিকেতনে ছাত্রজীবন যাপনেব ফলে। তখন রবীন্দ্রনাথ বার্ধক্যে অক্ষম হন নাই
আশ্রমেব বিবিধ কাজেব সঙ্গে তাঁব ছিল সাক্ষাৎ যোগ, ছাত্রদের অধ্যাপনায় তিনি
তখন প্রচুর সময় দিতেন। ফলে শৈশবাবস্থা হতে শুরু কবে পবিণত যৌবন পর্যন্ত
গ্রন্থকারের ভাগ্যে ঘটেছিল রবীন্দ্র-সান্নিধ্যের মহৎ সুযোগ। এই সুযোগ যে তিনি
অবহেলা করেন নি তার প্রমাণ এই বইটি।

স্বভাবতই রবীন্দ্র প্রসঙ্গ বইটিব পাতায় পাতায় ছড়ানো। আন্তরিকতা ও বৈদগ্ধ্যের
সমাবেশে লেখকের বর্ণনা এমন হৃদয়গ্রাহী যে সমালোচকেব পক্ষে উদ্ধৃতি-সংকলনের
লোভ সংবরণ কঠিন। বহুল উদ্ধৃতির উপায় নাই—স্থানাভাব; কিন্তু অন্তত একটি না
দিলে বইটির পরিচয় অসম্পূর্ণ থাকবে। লেখকের একটি অভিজ্ঞতা স্মরণীয়: অপরের
অপরাধে তিনি অভিযুক্ত, বিচারক অবশ্য রবীন্দ্রনাথ। অতঃপর—

"অনেকক্ষণ ধরিয়া তাঁহার নৈর্ব্যক্তিক তিরস্কার শুনিলাম। শেষ হইলে বলিলাম—আপনার সব কথাই ঠিক, কেবল আমি অপরাধী নই। আমার কথা শুনিয়া তিনি যেন বাঁচিয়া গেলেন, বলিলেন—ভালো হ'ল, আমার বলাও হ'ল, আবার লোকটাকে কষ্ট দেওয়াও হ'ল না। এবার তুই তাকে গিয়ে বল্। তারপরে একটু থামিয়া বলিলেন—আসল কথা কি জানিস, মাঝে মাঝে খুব বিরক্ত হই, কিন্তু অপরাধী যখন সশরীরে সম্মুখে এসে দাঁড়ায় তখন তিরস্কার করতে কষ্ট হয়। নিতান্তই যখন না বললে নয়, তখন এদিক ওদিক তাকিয়ে কোনো রকমে বলে ফেলি। আর খুব রাগ হলে কথাই বলি না, পাছে অপরাধের চেয়ে বেশি ওজনের কিছু বলে ফেলি।"

এক হিসাবে বইটি লেখকের শৈশব কৈশোর ও যৌবনের আত্মজীবনী। কিন্তু এই আত্মজীবনীতে লেখকের ব্যক্তিত্ব কোথাও অসংগতভাবে আত্মপ্রকাশ করেনি—এইখানেই তাঁর কৃতিত্ব। এই কৃতিত্ব সম্ভব হয়েছে তাঁর নৈর্ব্যক্তিক মনোবৃত্তি ও সংযত লেখনীর ফলে। মাত্র একটি জায়গায় প্রমথবাবুর গুরুতর স্খলন হয়েছে: রবীন্দ্র সংগীত বর্ণনা প্রসঙ্গে। রবীন্দ্রনাথের গান অপরূপ—শুধু এই কথা বলার জন্যে তিনি পাঁচ পাতা ধরে উচ্ছ্বাস করেছেন, তাঁর কলমের আয়ত্তে যতগুলি কৌশল আছে সবগুলি প্রয়োগ করেছেন। কিন্তু এই ত্রুটি বাদে বইটিতে আর কোথাও ছন্দোভঙ্গ ঘটে নাই।

শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশী রবীন্দ্রনাথের ভক্ত কিন্তু অন্ধ নয়, রবীন্দ্রনাথের সম্মোহন তাঁর দৃষ্টিকে আচ্ছন্ন করেনি। শৈশব থেকে যৌবন পর্যন্ত যে দুর্লভ জগতে তিনি বাস করেছেন তার প্রতি ব্যক্তি, প্রতি ঘটনা, খুঁটিনাটি সকল ব্যাপার তাঁর সজাগ ও সহানুভূতিসম্পন্ন মনে গভীর ছাপ রেখে গেছে। তাই শান্তিনিকেতনের—অর্থাৎ গ্রন্থকারের সমসাময়িক শান্তিনিকেতনের—ছাত্র শিক্ষক এমন কি চাকরদের বিচিত্র জীবনের ও এর প্রাকৃতিক পটভূমির উজ্জ্বল বর্ণনায় বইটি আশ্চর্য রকম হৃদয়গ্রাহী হয়েছে। সেখানকার উৎসব, খেলাধুলা, ছাত্রদের বিবিধ সাংস্কৃতিক প্রয়াস, বিভিন্ন শিক্ষকদের বৈশিষ্ট্য—লেখকের নিপুণ রচনায় পাঠকের সামনে অত্যন্ত স্পষ্টভাবে ফুটে ওঠে।

এক সময়ে বহু লোকের ধারণা ছিল যে শান্তিনিকেতনের আশ্রম এক বেখাপ্পা ধরণের প্রতিষ্ঠান, সাধারণ মানুষের জীবনের সঙ্গে তার যোগ অতি অল্প। এই অদ্ভুত ধারণা যদি আজো কারও মনে থাকে আশা করি এই বইটি পড়লে তা দূর হবে। শান্তি-

নিকেতনে কবি তাঁর আদর্শকে রূপ দিতে চেয়েছেন, কিন্তু কল্পলোকের শূন্যে নয়, মাটিতে —যে মাটি ভারতবর্ষের আবহমান জীবনধারায় সিক্ত। তাই দশের জীবনের ভালোমন্দ, দোষগুণ সব নিয়ে শান্তিনিকেতনের আশ্রম গড়ে উঠেছে। কিন্তু শান্তিনিকেতন সম্বন্ধে এই কথাই চরম কথা নয়। দোষত্রুটি সব সত্বেও শান্তিনিকেতনের আশ্রমের বৈশিষ্ট্য এর ঘনিষ্ঠ অখণ্ডতা, এর আশ্চর্য সৌরভ। এই অখণ্ডতার স্রষ্টা রবীন্দ্রনাথ, তাঁর ব্যক্তিত্বই এই সৌরভের উৎস। গান গল্প কবিতার মতন শান্তিনিকেতনও রবীন্দ্রনাথের সৃষ্টি। এই সৃষ্টির একটি দিক একান্তভাবে জড়িত এখানকার মাটি ও মানুষ, এখানকার দৈনন্দিন জীবনযাত্রার সঙ্গে। শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ বিশীর কৃতিত্ব এই যে তাঁর রচনায় এই মাটি ও মানুষ ও এই অনাড়ম্বর সমৃদ্ধ জীবন অত্যন্ত মর্মস্পর্শী ভাবে পাঠকের কাছে প্রত্যক্ষ হয়েছে।

হিরণকুমার সান্যাল

The Sociology of Literary Taste. By L. Schuking (Routledge, 7/6)
Intertraffic : Studies in Translation. By E. S. Bates (Jonathon Cape 8/6).

ছবির চেয়ে দেশকালের সীমায় আবদ্ধ অনেক বেশি সাহিত্য, ছবির সীমানা যেমন আবার-পারস্য গালিচা বা চীনদেশের ফুলদানির চেয়ে স্থানকাল-নির্ণীত মানসের উপরে অনেক বেশি নির্ভর করে। ভাষা শুধু বর্ণসমষ্টি নয়, ভাবের ছকও বটে! অনুবাদ তাই এত কঠিন। নানাদেশে, নানা যুগে, নানাভাষায় এর যাতায়াত; তাছাড়া রয়েছে জীবন ও সাহিত্যের যোগ, যে যোগে বারবার টান পড়ে এবং বারবার দানা বাঁধতে হয়।

বেটস্ শুধু কাব্যানুবাদই বিচার করেছেন। ভাবের ছকে ব্যঞ্জনায় কাজ সারা কাব্যেরই ধর্ম; তাই অনুবাদের সেরা পরীক্ষা কাব্যে। ভাষার বর্ণবৈশিষ্ট্যও কাব্যে খোলে ভালো। অনুবাদককে সেই সুকুমার ধ্বনি, দেশজব্যবহার, ভাষামানসের নানা ইঙ্গিতসর্বস্ব প্রকাশ প্রথমত বুঝতে হয়, দ্বিতীয়ত স্বকীয় ভাষায় ঐ বৈশিষ্ট্যগুলির অভাবের সঙ্গে মেলাতে হয়। মেলে না হয়তো কখনোই, তবু কম বেশি আছে আর আছে ধ্বনির সমধর্মিতা। ব্রাউনের পারস্যের সাহিত্যেতিহাস থেকে বেটস্ ধ্বনির দিক থেকে এই সূফী শ্লোকটি উদ্ধৃত করেছেন:

বি-শুম্, বাশুম্, অজিন্‌আলম্ বদর্ শুম্ !
বি-শুম্, অজ্ চীন উ মা-চীন্ দির্-তর্ শুম্ !
বি-শুম্, অজ্ হাজিয়ান্-ই-হজ্ বি-পুর্‌সুম্
কি 'ই' দিবি.বস্-এ, য়া দির্-তর্ শুম্ ?

ব্রাউনের অনুবাদের সঙ্গে আর দুটি অনুবাদ তুলনীয় :

(১) Out of this world. I will arise, and fare
To China and beyond ; and when I'm there
I'll ask the Pilgrims of the Pilgrimage,
'Is here not enough ? If not, direct me where'

(২) I go to make a journey
Beyond far China's shore
And, passing, ask the pilgrims
Who trod this way before,
'Winds on the road yet more ?'

(৩) টাইম্‌স্ লিটরেরি সপ্লিমেণ্ট্ আরবোবির উপরের উদ্ধৃতি-র আরেকটি ভাষ্য দেন :
I will go, I will go on, I will go out from this world,
I will go, I will go beyond China and trans-China :
I will go, I will ask the pilgrims of the Pilgrimage ;
'Is this distance enough, or must I go yet further ?'

বেটসের মতে মূল ভাষা না জেনেও ভিন্ন ভিন্ন অনুবাদ বিচার সম্ভব, মোটামুটি কাব্যবিচারের মানদণ্ডেই : শব্দব্যবহার ও বাক্যার্থের মিলে ও নিজের ভাষার স্বচ্ছন্দ প্রয়োগে। পাঠের সম্ভোগ আর জীবনের সম্ভোগ এখানে জড়িত।

ইংরেজিতে এর সবচেয়ে বড়ো বাধা, বেট্‌সের মতে, পণ্ডিতমাহাত্ম্য। এ মাহাত্ম্য বহুকাল ধরে ইংরেজি অনুবাদকে কাণা করে রেখেছে, উনিশ শতকেই অবশ্য এর প্রবল প্রতাপ। উনিশ শতকেই একটা পণ্ডিতশ্রেণী গড়ে উঠেছিল, যারা সামাজিক কারণে নিরাপদ আশ্রয়ে কূপমণ্ডুক পাণ্ডিত্যে ক্লাসিক্‌সের একচেটে কারবার করেছিল। জীবনবোধের নগণ্যতা ছাড়া এর আরেকটা বিপদ হল ছন্দব্যবহারে। বেট্‌স্ নাম করেন নি, কিন্তু ডার্বি ও পোপের সঙ্গে চ্যাপম্যান্, মার্লো বা গোলডিঙের অনুবাদের তুলনা করলে এই উনিশ শতকের ও আঠারো শতকের ব্যক্তিত্বের দারিদ্র্য স্পষ্ট হয়। রোমান্-দের চেয়ে গ্রীক্ লেখকরাই এতে ক্ষতিগ্রস্ত, গ্রীক জীবনযাত্রা মোটেই এই মধ্যবিত্ত ইংলণ্ডের মতো ছিল না। গ্রীক লেখকের জীবনে সব সময়েই অর্থকষ্ট, দ্বীপান্তর, দাসত্ব

এবং অকালমৃত্যুর সম্ভাবনা, রোমান্-দের তবু পেট্রন্ ব্যবস্থা থাক্‌ত। তাই কি রোমান্ সাহিত্যের অনুবাদ ইংরেজিতে উত্‌রে যেত এলিজাবিথান্ আমল থেকে সাতুনম্বর এডোয়ার্ড্ অবধি ?

রোমান্ কবিরা প্রায় সবাই নিজ নিজ দেশজ ভাষা ছেড়ে সংস্কৃত লাটিনে লিখেছিলেন পেট্রনের মুখ চেয়ে। তার ওপর আবার পেট্রনেরা প্রায়ই হতেন অশিক্ষিত, অগস্টস্ তো লাটিন্ ভালো করে' লিখতে পড়তেই পারতেন না। ফলে ভাষা হল চোখের ভাষা, ক্রিয়া বিভক্তি প্রত্যয় বিশেষণে পারম্পর্য রইল না, আমাদের দেবভাষার মতো, লাটিন সাহিত্যের ভাষা হল অপ্রাকৃত। ছন্দে তাই এল অঙ্কের প্রয়োগ। তাই থেকে এল পদান্ত অভ্যাস, শ্লোক হল যন্ত্র, এল মিলের প্রাণহীন আবৃত্তি, strophe-র ভাবাবেগঘটিত ছন্দ চাপা পড়ল নাম্‌তায়। বাংলাতে কি সেই জন্যই প্রবোধ চন্দ্র সেন, অমূল্যধন মুখোপাধ্যায় প্রভৃতি পণ্ডিতেরা ও তাঁদের ভয়ে বুদ্ধদেব বসুর মতো কবিরা ছন্দের যন্ত্রবৎ ব্যবহারের বিচারবর্ণনা করেন ? এবং সেই জন্যই কি এঁরা একধর্মী এক ভাষাতে তিনরকম ছন্দের কল বসান্ ? এর ফলে যদি গদ্যকবিতা নামক জীব ভূমিষ্ঠ হয়, তাহলে আর দোষ কি, however devoid it may be of music, method, or metre.

ছন্দের এ যান্ত্রিক অভিযানের বিরুদ্ধে বাংলার আছে যাকে বলা হয় স্বরবৃত্ত, ইংরেজিতে আছে নর্সারি ছড়া, স্কেল্‌টন্, হপ্‌কিন্‌স্, কোল্‌রিজ্, শেক্‌স্‌পিয়র, প্রথমবয়সের ডন্ ইত্যাদি। আর, বেট্‌সের মতে চৈনিক ও জাপানী কাব্যের অনুবাদ। বেট্‌সের দ্বিতীয় অধ্যায় ঃ ইটালিতে অনুবাদ, কারণ ইটালিতেই নাকি অনুবাদের সমধিক চর্চা। মহাভারতের পঠনীয় অনুবাদ নাকি ইটালিয়ানেই প্রাপ্য (আর বাঙ্গালে)। কিন্তু এবারে চীনে যাওয়া যাক। ওয়েলি ও চু তা-কাও, মার্সেল্ গ্রানে ও তাঁর অনুবাদক এডোয়ার্ডস্, আলেক্‌সিভ্ ও লুঃ—এই কজন মুখ্য পাত্র। ওয়েলির অবশ্য কোনো পরিচয় দরকার নেই, তবু ওয়েলির সঙ্গে চু তা-কাও একবার মেলানো যাক্ দুর্বোধ্য তাও তে চিং-এর অনুবাদের এক অংশে ঃ

And if men think the ground the best place for building a house upon,
If among thoughts they value those that are profound,
If in friendship they value gentleness,
In words, truth ; in government, good order ;
In deeds, effectiveness ; in actions, timeliness—
In each case it is because they prefer what does not lead to strife,

And therefore does not go amiss. এবং চু.তা-কাও :
In dwelling, think it is a good place to live ;
In feeling, make the heart deep ;
In friendship, keep on good terms with men ;
In words, have confidence ;
In ruling, abide by good order ;
In business, take things easy ;
In motion, make use of the opportunity.
Since there is no contention, there is no blame.

আলেক্সিভের কথা শিরোধার্য, অনুবাদ শুধু লেখাটির ভাষান্তর নয়, লেখার পিছনের ঐতিহ্যেরও আভাস। আর, কোন বইএর পুরুষার্থ তার পিছনের ঐতিহ্যকে ছাড়িয়ে যায়? অতঃপর অডিসির অনুবাদ—কটেরিল পরীক্ষায় প্রথম, যদিচ টি. ই. লরেন্স্ পরীক্ষার্থী ফর্দে বাদ কেন বুঝলুম না। তারপরে ইস্কিলাস্। যাঁরা এলিঅটের উপাদেয় প্রবন্ধটি জানেন, তাঁরা এখানে পণ্ডিত গিলবার্ট মরে-র কম নম্বরে অবাক হবেন না। দেখা গেল ফরাসী ও ইটালিয়ানে ইস্কিলাস্ পাঠ্য। তারপরে বাইব্‌ল, প্লটাইনস্, পরফিরি, প্রপের্টিউস্। মোটামুটি এ সবের মধ্যে শুদ্ধ সাহিত্যের বিচার উপভোগ্য।

এবং রেটসের সাহিত্য বিচারের সঙ্গে ধরে নেওয়া আছে সামাজিক জীবনযাত্রার প্রভাব ও জগচ্চিত্র। শূকিং সাহেব শুধু সেই বিষয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতামত নতুন নয়, আলোচনায় নতুন বিষয়ে নতুন আলোকও হয়তো কমই পড়েছে, তবু তাঁর জর্মান সমাজ ও সাহিত্য উপকারে লাগে। এবং তিনি মুখ্যতঃ উনিশ শতকে মনোযোগ দিলেও আঠারো শতকে মূর্খ পেট্রনরা কেমন নির্বিবাদে লেখা বদলাতে বল্‌ত এবং পোপ মার্কা মহাকবিরা নীরবে শুনতেন বা কি করে' নিঃসঙ্গ কবিমাহাত্ম্য উনিশ শতকে গোড়ায় দেখা দিয়ে শেষটা প্রতীকী কবিদের চরম নৈরাজ্যে পরিণতি পেল, শূকিঙের জর্মান ভাব সত্ত্বেও, এসব বিষয়ে আলোচনা কার্যকর।

বিষ্ণু দে

সংস্কৃতি-সংবাদ

রোমাঁ রোলাঁর মৃত্যুতে চিরাচরিত প্রথা মেনে শোক প্রকাশ না করে তাঁরই আদর্শ অনুসরণে শিল্প ও সংস্কৃতির শত্রুর বিরুদ্ধে আমরণ সংগ্রামের দুর্জয় সঙ্কল্প গ্রহণ করতে পারলেই তাঁর স্মৃতির প্রতি যোগ্য সম্মান দেখান হবে। শোক প্রকাশ করতে গেলে এই বিশ্ববিশ্রুত মনীষীর উনআশী বছরের স্বাভাবিক মৃত্যু আমাদের কাছে আজ এক পরম প্রিয়জনের অকালমৃত্যুর মতোই অসহনীয় মনে হবে।

রোলাঁর অনেক পরিচয়। রোলাঁ শিল্পরসিক, কথা-সাহিত্যিক, নাট্যকার, দার্শনিক, নির্ভীক সমালোচক, বিংশ শতকের এক প্রতিনিধিস্থানীয় চিন্তানায়ক। তাঁর সব চেয়ে বড় পরিচয় তিনি খাঁটি শিল্পী। তাই যতখানি তিনি বুদ্ধিমান্ ঠিক ততখানিই তিনি হৃদয়বান। চিন্তায়, কথায় ও কাজে তিনি তিন আলাদা জগতের বাসিন্দা ছিলেন না। তাই সভ্যতার সঙ্কটের যুগের অতবড় প্রতিভার সব্যসাচী না হয়ে উপায় ছিল না। রোলাঁর বিগত মহাযুদ্ধের পরবর্তী জীবন, বিশেষ করে উত্তর-তিরিশের ইউরোপের বেদনাময় বৎসরগুলি, সাম্রাজ্যবাদ ও ফ্যাশিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর অবিশ্রান্ত সংগ্রামে মুখর হয়ে আছে। মানুষের শিল্প-সংস্কৃতির আবহমান্ সম্পদ-সঞ্চয়ে নিজের দান রেখে যাবার দায় যেমন তাঁর ছিল, তেমনি সেই শিল্প ও সংস্কৃতি বিপন্ন হলে তাকে প্রাণপণ করে বাঁচিয়ে রাখার দায়িত্বও তিনি এক মুহূর্তের জন্যে ভোলেন নি। মানবপ্রীতি যাঁর জীবন্-বেদ সেই খাঁটি শিল্পীর এই তো স্বধর্ম!

আজকের দুর্দিনে রোমাঁ রোলাঁর বেঁচে থাকার যে কত বড় প্রয়োজন ছিল সে কথা ভালো করে বুঝতে গেলে ফ্যাশিজমের আবির্ভাবের দিনে ফিরে যেতে হয়। শোষিত দুনিয়ার পরম ভরসাস্থল এবং রোলাঁর ভাষায় পুঁজিতান্ত্রিক পৃথিবীর একমাত্র "inconvenient torch" সোভিয়েট যুক্তরাষ্ট্রের বিরুদ্ধে আন্তর্জাতিক চক্রান্তের ব্যাপক বেড়াজাল বিস্তৃত হচ্ছে। রেডিও, সিনেমা, থিয়েটার, সংবাদপত্র—বিশ্বজোড়া প্রচারকার্যের আধুনিক উপায়-উপকরণগুলি সভ্যতার শত্রুপক্ষের করায়ত্ত। দেশে দেশে বুদ্ধিজীবী সমাজের সহজ দৃষ্টি ঘুলিয়ে দেবার সুকৌশল অভিযান ব্যর্থ হয় নি। বিস্তর শিল্পী ও সাহিত্যিক অজ্ঞাতসারে প্রচারের ফাঁদে পা দিলেন—অনেকে জেনে শুনেই সাম্রাজ্যবাদের ভাড়াটে হয়ে কালি-কলমের আক্রমণ শুরু করে দিলেন।

শঙ্কিত রোলাঁর লেখনী সেদিন না মানে ভ্রান্তি, না জানে ধৈর্য। সময় থাকতে সাবধান হবার জন্যে লেখক ও শিল্পী সমাজকে তিনি বারবার আবেদন জানাতে থাকেন। তাঁর স্বদেশের শাসক সম্প্রদায়ের রক্তচক্ষু অমান্য করে, বিদেশের শোষক শ্রেণীর ভ্রুকুটি অগ্রাহ্য করে রোমাঁ রোলাঁর সেই অনমনীয় রূপ মানুষের সভ্যতারই মহিমময় রূপ! রোলাঁর সংগ্রাম ব্যর্থ হয় নি। স্পেনের গৃহযুদ্ধ থেকে আরম্ভ করে বাংলার মন্বন্তর পর্যন্ত দুনিয়ার লেখক ও শিল্পী সমাজের সচেতন অংশ কর্তব্যের দায় অস্বীকার করেন নি।

ফ্যাশিজম এখনো মরে নি। তার মৃত্যুর দিন যতই এগিয়ে আসবে, ততই ফ্যাশিষ্ট জাপান ও ফ্যাশিষ্ট জার্মানীর বাইরেও দেশেদেশে ছদ্মবেশী ফ্যাশিষ্ট ও ফ্যাশিষ্ট-সুহৃদরা মরণ-কামড়ের জন্যে উঠে পড়ে লাগবে। ইতিমধ্যে তার আভাসও পাওয়া যাচ্ছে। গুপ্ত সর্পের দল মিত্রপক্ষে বিভেদ সৃষ্টির সুযোগ খুঁজে বেড়াচ্ছে। প্রতিক্রিয়া নিজের উদ্দেশ্য সিদ্ধির জন্যে হয় তো নানা ছলে উদার বুলির আশ্রয় নিয়ে কালি ও কলমের কাছে ধর্ণা দেবে। সেদিন রোমাঁ রোলাঁর উদাত্ত কণ্ঠ আমাদের ভুল পথে যেতে দেবে না। শিল্পী রোলাঁর সংগ্রামের জীবন স্বধর্মনিষ্ঠ ও স্বার্থ-সচেতন সাহিত্যিক ও শিল্পী সমাজের কর্মকাণ্ড।

*　　*　　*　　*

বড়দিনের বহু অনুষ্ঠানের মধ্যেও প্রবাসী বঙ্গ সাহিত্য সম্মেলনের কানপুরের অধিবেশন উল্লেখযোগ্য। তবে নানা আয়োজনের ভিড়ে তার সম্পূর্ণ বিবরণ বাংলাদেশে আমরা পুরোপুরি সংগ্রহ করে উঠতে পারি নি। মূল সভাপতি ডাঃ রাধাকমল মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অভিভাষণ ও বিভিন্ন শাখার সভাপতি শ্রীযুক্ত তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায় (সাহিত্য শাখার), সুনীতি কুমার চট্টোপাধ্যায় (ইতিহাস ও সংস্কৃতি শাখার), ডাঃ কুদরত-এ-খুদা (বিজ্ঞান শাখার) প্রভৃতি মহাশয়দের অভিভাষণের সংক্ষিপ্তসার সংবাদ-পত্রে প্রকাশিত হয়েছে। শ্রীযুক্ত তুষারকান্তি ঘোষের পত্রিকা-প্রদর্শনীর বক্তৃতা, শ্রীযুক্ত অর্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধনের বক্তৃতা ও শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের আধুনিক কথা-সাহিত্য ও বিমল ঘোষের (মৌমাছি) শিশু-সাহিত্য সম্বন্ধে বক্তৃতারও সারমর্ম প্রকাশিত হয়েছে। এ সব বক্তৃতার সারাংশ দেখে অবশ্য বাঙালী লেখক ও রূপস্রষ্টা সমাজের মনের গতি বিষয়ে কোনো সিদ্ধান্ত সাময়িকভাবেও করা সম্ভব নয়। কারণ সংবাদপত্র 'সার' নির্বাচন করে নিজের ইচ্ছানুরূপে,

বিষয়ের গুরুত্ব দিকে নয়, লেখকের ইচ্ছানুসারেও নয়! মোটের উপর এই সব অভিভাষণের মধ্যে একটা সাধারণ সুর দেখা যাচ্ছে—নতুন কালকে কেউ আর অস্বীকার করতে চান না। তবে কেউ তাকে স্বীকার করতে চান নিতান্ত অনিচ্ছাসত্ত্বে, আর কেউ স্বীকার করতে চান ভয়ে ভয়ে, কেউ বা স্বীকার করতে চান বলিষ্ঠ চেতনা নিয়ে। তারাশঙ্কর বাবুর অভিভাষণে ও রাধাকমল বাবুর সভাপতিত্বের বক্তৃতায় এরূপ বাস্তব ও সবল মনোভাব দেখতে পেয়েছি মনে হয়। সংবাদ-পত্রের বিবরণ থেকে তার বেশি কিছু বলা সহজ নয়। তবে সংবাদপত্রে সম্মেলনের চিত্র-প্রদর্শনী বা পত্রিকা-প্রদর্শনী সম্বন্ধে আর কোনো বিবরণ বের হয় নি, এটি আশ্চর্য-জনক। কোনো সম্মেলনের সাফল্য শুধু সভাপতিদের অভিভাষণের উপর নির্ভর করে না—সম্মেলনের কার্যধারা, সম্মেলনের মোটামুটি আবহাওয়া, লোক সমাগম, বাঙলার বাঙালী ও প্রবাসী বাঙালীর পরস্পরের যোগাযোগ, বাঙলা সাহিত্য ও সমাজ সম্বন্ধে ও তার সমস্যা সম্বন্ধে প্রবাসী বাঙালীর সচেতনতা বা অচেতনতা, আগ্রহ বা ঔদাসীন্য—এ সব বহু কথাই আমরা জানতে চাই। বাঙলাদেশে আজ সমাজ-জীবন ভেঙে পড়ছে আর বাঙালী কর্মীরা তা নতুন করে গড়তেও চাইছে;—এই এত বড় সঙ্কটের কিরূপ সাড়া প্রবাসী বাঙালীর মনে পড়ছে?

* * * *

৩১শে ডিসেম্বর, কলিকাতা মুসলিম ইনস্টিটিউটে শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুর সভানেতৃত্বে উর্দু কবি হালির ত্রিংশতিতম স্মৃতি বার্ষিকী উদ্‌যাপিত হয়। কবি হালি জন্মান সিপাহী বিদ্রোহের বিশ বৎসর পূর্বে ১৮৩৭ সালে; আর ১৯১৪-তে গত মহাযুদ্ধের প্রথম দিকেই তাঁর মৃত্যু হয়। দীর্ঘ জীবনের মধ্যে তিনি দেশের এক যুগান্তর ও জাগরণ দেখে যান;—আর উত্তর ভারতে সেই নবযুগের উদ্বোধনে তাঁর দান ছিল সমধিক। উর্দু কবিতার জগতে তিনি এক নূতন যুগের সূচনা করেন। ১৮৭৯ খৃষ্টাব্দে তাঁর 'মুসাদ্দস্' প্রকাশিত হয়—ইস্‌লামের জোয়ার-ভাঁটা নিয়ে লিখিত এ কাব্য এখনো উর্দুর মহাসম্পদ—তা পাঠ করে স্যর সৈয়দ আহমদ্ খাঁ প্রভৃতি মুসলিম নবযুগের প্রবক্তারা উদ্বুদ্ধ হন—উর্দু কবিতা হালির হাতে নতুন হয়ে উঠে পুরোনো কৃত্রিম বাক্‌চাতুর্য ছেড়ে দেয়।

এ স্মৃতি-সভার আয়োজন করেছিলেন বাঙলার আঞ্জুমান-এ-তরক্কী-এ-উর্দু। এজন্য তাঁরা ধন্যবাদার্হ। কারণ, আমরা বাঙালীরা অধিকাংশেই উর্দু জানি না;

অধিকাংশ বাঙালী মুসলমানও উর্দু জানেন না। দু'চার জন শিক্ষিত বাঙালী মুসলমান যা জানেন, তাও তত গভীর নয়। কিন্তু উর্দু একটি জীবন্ত ভাষা, বিশেষত হায়দ্রাবাদের নিজাম সরকারের চেষ্টায় এতে জ্ঞান-বিজ্ঞানের পাঠ্য বই যথেষ্ট রচিত হয়—অন্য কোনো ভারতীয় ভাষায় সে সব বই তত রচিত হয় না। তাই এ ভাষার কবি ও লেখকদের সঙ্গে পরিচয় রাখলে আমরা সব রকমেই উপকৃত হব। কিন্তু আমাদের এ পরিচয় ঘটিয়ে দিতে পারেন শিক্ষিত বাঙালী মুসলমানরাই। কারণ, সাধারণ বাঙালীর পক্ষে এদিকে প্রথম বাধা উর্দু বর্ণমালা; দ্বিতীয় বাধা ফারসী আরবী শব্দের প্রাচুর্য। ইচ্ছা থাকলেও এ সব বাধা উত্তীর্ণ হওয়া আমাদের অনেকের পক্ষে সহজ হয় না। জানি না উর্দু কবিতা ও সাহিত্যের বাঙলায় অনুবাদ সম্ভব কি না। কিন্তু মৌঃ মুজাফ্ফর রহমান-এর ইংরেজিতে লেখা পুস্তিকায় হালির কবিতার যে নিদর্শন দেওয়া হয়েছে, তা মোটেই ভীতিপ্রদ নয়, অনুবাদের অযোগ্যও হতে পারে না। যেমন:

"তুম্ আগর্ চাহ্‌তেহো মুল্‌ক্ কি খয়ের্
না কিসি হম বতন্ কো সম্‌ঝো গৈর,
হো মুসলমান উসমে ইয়া হিন্দু
বুধ্ মজ্‌হব্ হো কেহ্ হো ব্রাহ্মো
সব্ কো মিঠি নেগাহ্‌সে দেখো
সম্‌ঝো আংখ্‌কি পুট্‌লি সবকো।"

কিংবা—

শক্তি ভি শান্তি ভি ভগ্‌তোঁ কে গীত মে হ্যায়
ধর্‌তি কে বাঁসিও কি মুক্তি পিরিত মেঁ হ্যায়।

এই উর্দু ভাষা অবশ্য আমাদের পক্ষেও বোঝা সম্ভব। হয়ত পরবর্তী সময়ে উর্দু আরও ফারসী আরবীতে ভরতি হয়ে উঠেছে। যাই হোক্, এ ভাষার সম্পদকে বাঙালীর নিকট সুপরিচিত করবার দায়িত্ব বাঙালা মুসলমানের।

এ প্রসঙ্গে বাঙালী মুসলমান উর্দুর চর্চা করবে কি বাঙলার চর্চা করবে, সে বিষয়ে আলোচনা করা নিরর্থক। যা তাঁদের পক্ষে সহজ ও স্বাভাবিক, তাই তাঁরা করবেন, তাঁরা নিজেরাই দেবেন সে প্রশ্নের উত্তর;—আর সে উত্তর তাঁরা দিচ্ছেনও। শখ

হিসাবে আমরা অনেক ভাষা চর্চা করতে পারি, প্রয়োজনে ইংরাজীতেও কলম পিশি—কিন্তু নিজেকে প্রকাশ করতে পারি সেই ভাষায় যে ভাষায় জন্ম অবধি কথা বলি।

*　　*　　*　　*

ক'লকাতার প্রেসিডেন্সী কলেজে নারী সেবা সঙ্ঘের (বিভিন্ন নারী সংগঠনের সম্মিলিত সঙ্ঘ) উদ্যোগে যে প্রদর্শনীর আয়োজন হয়েছিল তাতে একটা নূতন চেষ্টার আমরা সন্ধান পাই। প্রদর্শনী হিসাবেও অবশ্য তা খুব সার্থক হয়েছে। হাতের কাজের প্রচুর জিনিস এসেছিল, কুটীর শিল্পের বহু রকমের ষ্টল ছিল, দর্শকদের সংখ্যাও হয়েছিল অনেক। মোট হাজার তের লোক দর্শকের টিকেট কিনে প্রদর্শনী দেখেন। একদিনও লোকের বিরাম ছিল না; কিউ করে তবে প্রবেশ পথে পা বাড়াতে হয়েছে। ভেতরে জিনিসপত্র দেখেও সবাই আনন্দিত হয়েছেন। বাংলাদেশের নানা জায়গায় এবং বহু প্রতিষ্ঠানের কুটীর শিল্পীর এমন বিচিত্র সমাবেশ আমরা শীঘ্র কেউ দেখিনি। এর সেই শিল্পগত মূল্য ছাড়াও আর একটা দিক সহজেই নজরে পড়ে। সেটা হচ্ছে মধ্যবিত্ত, নিম্নশ্রেণী, এমন কি দুর্ভিক্ষপীড়িত দুঃস্থ মেয়েদেরও শিল্পের সহায়তায় বাঁচবার প্রচেষ্টা, পায়ে ভর দিয়ে উঠে দাঁড়াবার ভরসা। বর্তমান সঙ্কটের সময় মেয়েরা নিজেরাই যে সমবেত শক্তিতে এইভাবে নিজেদের জীবিকার ব্যবস্থা করবার প্রয়াস কচ্ছেন এটা খুবই আশঙ্কার কথা। আর এইটিই এই প্রদর্শনীর প্রধান উল্লেখযোগ্য কথাও।

এই রকম প্রদর্শনী যদি প্রতি বৎসরে, বা সম্ভব হলে দু তিন মাস পরে পরে করা যায় তাতে এই সব মেয়েরা আরও উৎসাহিত হবেন এবং কাজ করবার প্রেরণা পাবেন। যে সব প্রতিষ্ঠান এই সব দুঃস্থাদের কুটীর শিল্পের সাহায্যে স্বাবলম্বী করবার চেষ্টা কচ্ছেন তাঁরা, এবং যাঁরা অক্লান্ত পরিশ্রম করে এমন একটি বিরাট, সফল ও সুন্দর প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিলেন, সঙ্গে সঙ্গে দেশের সমস্যাও চোখের সামনে তুলে ধরবার চেষ্টা করেছেন তাঁরা, সবাই আমাদের ধন্যবাদের পাত্রী।

*　　*　　*　　*

বৎসরে বৎসরে এ সময়ে যে সব সাংস্কৃতিক সম্মেলন হয় তার মধ্যে বিজ্ঞান কংগ্রেসের অধিবেশন প্রধান বলে গণ্য হয়ে উঠছে। ভারতবর্ষে বিজ্ঞান চর্চা ক্রমশই সুস্থ এবং জীবন-নিষ্ঠ হচ্ছে, শুধু মাত্র একাডেমিক বা ল্যাবরেটরির গবেষণার বিষয় হয়ে থাকছে না। অবশ্য 'বিজ্ঞানের স্বরাজ' এ দেশে কেন, পৃথিবীর অধিকাংশ দেশেই এখনো সম্পূর্ণ লাভ

হয় নি। বিজ্ঞানের গবেষণা ও আবিষ্কার অনেকাংশে ধনিকবর্গের স্বার্থেই চলে। এদিকে আমাদের দেশের অবস্থা আরও শোচনীয় হবারই কথা। সাম্রাজ্যবাদের আওতায় বিজ্ঞানের স্বাভাবিক বিকাশ এখানে সম্ভব হয় নি। দেশ স্বরাজলাভ করলে ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকরা সত্যই একটা সুস্থ পরিবেশ পেতেন; তখন এ দেশে বিজ্ঞান স্বাভাবিক ধারায় বিকাশলাভ করতে পারত। এই চেতনাও বৈজ্ঞানিকদের মনে বেশ প্রবল ও তীব্র হয়ে আজ দেখা দিচ্ছে। অধ্যাপক জ্ঞানচন্দ্র ঘোষ, মেঘনাদ সাহা, শান্তিস্বরূপ ভাটনগর প্রমুখ ভারতবর্ষের যে বৈজ্ঞানিক দল বৃটেন হয়ে সম্প্রতি আমেরিকা গিয়েছেন তাঁদের নানা কথাবার্তা, বক্তৃতা, আলোচনায় তাঁরা এই সত্যকে বেশ সুস্পষ্ট ভাবেই সে সব দেশে প্রকাশ করছেন। তাঁদের মধ্যে শান্তিস্বরূপ ভাটনগরের এবার বিজ্ঞান কংগ্রেসের নাগপুর অধিবেশনে সভাপতি হবার কথা ছিল। তাঁর লিখিত অভিভাষণ সেখানে পঠিত হয়, তা ছাড়া তিনি আমেরিকা থেকে বিশেষ সন্দেশও এই উপলক্ষে অধিবেশনে পাঠিয়েছেন। তাতে এ দেশের বিজ্ঞান চর্চার ইতিহাস ও বৈজ্ঞানিকদের বাস্তব অভিজ্ঞতার কথা আলোচিত হয়েছে। সভাপতি মহাশয়ের দু-একটি কথা বিশেষভাবে লক্ষণীয়। যেমন "ভারতের নূতন শিল্প প্রতিষ্ঠানগুলির সমবেতভাবে শিল্প-গবেষণা-কাউন্সিল গঠন করা উচিত।" ভারতীয় শিল্পপতিদের এ বিষয়ে অবিলম্বে উদ্যোগী হওয়া প্রয়োজন। "ভারতের দারিদ্র্য সমস্যা সমাধানে কৃষিই যথেষ্ট নয়। ভারতের যথেষ্ট সংখ্যক লোক যদি কৃষি ছেড়ে অন্য ব্যবসা অবলম্বন না করে তা হলে স্বাস্থ্যবান, উন্নত, আত্মসম্মানমূলক ভারত গঠন করা সম্ভব নয়।" কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী স্বার্থের চেষ্টা বরাবরই এর বিপরীত—তার লক্ষ্য ভারতবর্ষ কাঁচা মালের দেশ ও বিলাতী শিল্পজাতের বাজার হয়ে থাক্। এ যুদ্ধের পরেও চার্চিল প্রমুখ ব্যক্তিদের সেরূপ চেষ্টাই প্রবল হবার কথা। স্যর শান্তিস্বরূপ প্রস্তাব করেছেন যে, বৃটিশ পার্লামেণ্টারি কমিটির মত আমাদের কেন্দ্রীয় সরকারের আইন সভার সঙ্গে একটি 'বৈজ্ঞানিক কমিটি' সংযুক্ত থাকা উচিত। তা হলে আমাদের আইন সভার প্রতিনিধিরা কৃষি, শিল্প, খাদ্য, স্বাস্থ্য, টেক্‌নোলজি সম্বন্ধে ওয়াকিফ হাল থাকতে পারেন, অবশ্য যদি সত্যই সদস্যদের তেমন ইচ্ছা থাকে। স্যর শান্তিস্বরূপের অন্য কথা এই, দেশ-বিদেশে বিজ্ঞানের যে উন্নতি হ'চ্ছে তার সঙ্গে সংযোগ রক্ষার জন্য ওয়াশিংটনে, লণ্ডনে এবং সম্ভবত মস্কোতে বৈজ্ঞানিক যোগাযোগ রক্ষার অফিস প্রতিষ্ঠায় গভর্ণমেণ্টকে রাজী করাতে হবে। দুটি প্রস্তাবই যুক্তিযুক্ত। কিন্তু

বর্তমান ভারত গভর্ণমেণ্ট তা কতটা গ্রহণ করবে, অন্তত মস্কোর সঙ্গে ভারতবর্ষের বৈজ্ঞানিকদের যোগাযোগে যে রাজী হবে—তা আশা করা যায় না। এ সরকার সময় মত কিছুই করতে পারে না। যুদ্ধ একেবারে ঘাড়ের উপর এসে পড়লে এ দেশে একটি বোর্ড অব সায়েণ্টিফিক এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীয়াল রিসার্চ গঠিত হয় সত্য, কিন্তু তারপর থেকে মার্কিন মুলুকে এবং কানাডায়, অষ্ট্রেলিয়ায়, এমন কি দক্ষিণ আফ্রিকায়ও যে তালে শিল্পোন্নতি ঘটেছে ভারতবর্ষে তার মত কিছুই ঘটে নি। বরং ও সব দেশে এরূপ উন্নতি হওয়ায় ভারতীয় বৈজ্ঞানিক ও শিল্প বিষয়ক গবেষণার জন্য তাগিদ সাম্রাজ্যবাদীদের পক্ষে কমে গেছে। দিনের পর দিন এ দেশের যে কোনো গবেষণায় বিলাতের উদ্বৃত্ত বিশেষজ্ঞ আমদানী করা চলছে। তবু এর মধ্য দিয়েও ভারতীয় শিল্প ও ভারতীয় বিজ্ঞান অগ্রসর হচ্ছে, আর শিল্পপতি ও বৈজ্ঞানিকরা নিজেদের অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হচ্ছেন, তাতে সন্দেহ নেই। স্যর শান্তিস্বরূপ এ সব বুঝেই বলেছেন, "ভারতে জনসাধারণের প্রতিনিধিমূলক জাতীয় গবর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠাই যে জাতীয় উন্নতির জন্য প্রয়োজন, তা বলাই বাহুল্য।" জাতীয় সরকারের জন্য যাঁরা তাই সক্রিয়, বৈজ্ঞানিকরা বুঝতে পারছেন যে, তাঁরাও এ দেশে বিজ্ঞানেরই উন্নতির পথ তৈরী করছেন। যুদ্ধের ঠিক পূর্বমুহূর্তে একজন বৃটিশ বৈজ্ঞানিক—জে. ডি. বার্ণেল—বলেছিলেন: Propably the best workers for Indian science today are not the scientists but the political agitators who are struggling towards this end. আমাদের বৈজ্ঞানিকদের বর্তমান প্রচেষ্টা দেখে মনে হয়, আমরা উপরের কথাটাকে একটু সংশোধন করে বলতে পারি—are also the scientists in addition to the political agitators. ...

* * * *

শান্তিনিকেতনে পৌষ উৎসবে এবার প্রচুর লোকসমাগম হয়েছিল। সে সময়েই বিশ্বভারতীর বার্ষিক সভা অনুষ্ঠিত হয়েছে, শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু তাতে বক্তৃতা করেন। দেখা যাচ্ছে, কবির অবর্তমানেও শান্তিনিকেতন বা সেখানকার নানা প্রতিষ্ঠান মোটের উপর দেশ-বিদেশের ভাগ্যবানদের সাহায্য ও সহযোগিতা লাভ করেছে। 'চীন ভবন' চীন সরকার এবং সেনাপতি চিয়াং ও মাদাম চিয়াং-এর শ্রদ্ধার প্রমাণ। দেশীয় রাজা-রাজড়ারাও বিশ্বভারতীকে বিস্মৃত হন নি। তাছাড়া বিড়লাদের মত দেশীয় বণিক ও মিষ্টার এলমহার্ষ্টের মত বিদেশীয় ধনী হিতৈষীরা তো এর উন্নতিতে সাহায্য করবেনই। আয়ব্যয়ের হিসাবেও ঘাটতি নেই, বরং বাড়তি

আছে ; 'শ্রীনিকেতনে', ও 'শিক্ষা ভবনে', আয় হয়েছে দ্বিগুণ। বাঙলা দেশের শিক্ষিত জনসাধারণ শান্তিনিকেতনের উৎসবে এবার যেরূপ ভিড় করেছিলেন, তাতেই বোঝা যায়, কবির প্রারব্ধ কাজে তাঁরা কত শ্রদ্ধাশীল। বাইরে থেকে সরোজিনী দেবী, মিষ্টার এল্‌ম্‌হার্ষ্ট প্রভৃতি ছিলেন; বোম্বাইর ভূতপূর্ব কংগ্রেস সোশালিষ্ট নেতা মিষ্টার মেহের আলী অসুস্থ অবস্থায় অধ্যাপক কৃপালানির গৃহে অতিথি হিসাবে আছেন—এ সব থেকে শান্তিনিকেতন যে বাঙলার বাইরেও ভারতবর্ষের দৃষ্টি সর্বদাই আকর্ষণ করছে, তা বেশ বুঝা যায়। তার নানা প্রতিষ্ঠানের ভাব যাঁরা বহন করছেন, এতে তাঁদের আশ্বস্ত হবার কথা। রবীন্দ্রনাথের শান্তিনিকেতন এক সৃষ্টিময় চেতনার উৎস-স্বরূপ ছিল। জনসাধারণের ও ধনিকদের সহযোগিতা যখন পাওয়া যাচ্ছে তখন সেই সৃষ্টির ঐতিহ্য অক্ষুণ্ণ থাকবে, এই আশা করা চলে। কারণ শান্তিনিকেতনে গুণী ও মনস্বীর অভাব নেই। এ বিষয়ে 'সাহিত্যিকা সমিতি'তে শ্রীযুক্তা নাইডুর কথা কয়টি স্মরণীয়ঃ "জনৈক বক্তা আজ সত্যই বলিয়াছেন যে, রবীন্দ্রনাথের কবিতাগুলিকে সাহিত্যের শেষ বাণী বলিয়া মনে করা উচিত নহে। মহত্তর ও শ্রেষ্ঠতর বাণী সৃষ্টির জন্য রবীন্দ্রনাথের বাণী হইতে প্রেরণা লাভ করা আমাদের কর্তব্য। আমাদের পূর্বগামিগণ যতই বড় এবং যতই মহৎ হউন না কেন তাঁহাদিগকে ছাপাইয়া যাওয়ার চেষ্টা করা উচিত। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেশের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছেন। তাঁহার দেশ আরও বেশী গৌরবমণ্ডিত হয়, ইহাই তাঁহার লক্ষ্য ছিল। তাঁহার কবিতা তাঁহার দেশের স্মৃতিলিপি-মধ্যে গণ্য হয়—ইহা তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল না। আমাদের অবদান যতই অকিঞ্চিৎকর হউক না কেন, ভবিষ্যৎ গঠনের জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা করা আমাদের কর্তব্য।" শান্তিনিকেতনে কবির সৃষ্টিশীল-প্রেরণা জয়ী হবে, এই বাঞ্ছনীয়। দেশের সকল শ্রেণী তারই জন্য সেদিকে তীর্থযাত্রা করে।

* * * *

গত ১৮ই নভেম্বর সুভোঠাকুরের ষ্টুডিও ৩-এ, এস্‌. আর. দাস রোডে, তরুণ শিল্পী গোপাল ঘোষের চিত্র প্রদর্শনীর উদ্বোধন হয়। দুটি ঘরে সব শুদ্ধ ১০৮টি ব্রাশ ড্রইং এবং ১০ খানি রঙিন ছবি প্রদর্শিত হয়েছিল।

এই ছবির মিছিলের মধ্যে এসে প্রথম দর্শনে অভিভূত হতে হয় শিল্পীর রচনা বৈচিত্র্য ও বিভিন্ন আঙ্গিকের ওপর অনায়াস ও বলিষ্ঠ দখল দেখে। এই রচনা প্রাচুর্যের মূলে হয়ত আছে তাঁর সহজ শিল্পবুদ্ধি, যার স্বতস্ফূর্ত প্রকাশ তাঁর চিত্রগুলিকে আভামণ্ডিত করে

তুলেছে। অথচ শিল্পের সাহজিক বিকাশ ও জাগ্রত সমাজ চেতনা, সুসমন্বিত হয়েছে গোপাল ঘোষের রচনা প্রতিভায়। তাঁর ব্রাশ ড্রইং-এ আঁকা ছবিগুলিই অবশ্য বেশী ভাল লাগলো। দেখলাম মানুষ এবং তার নানা ভঙ্গীর মুহূর্তগুলি, নির্ভীক ও দ্বিধাহীন রেখার গতিবেগে শক্তিমান হয়ে উঠেছে। তিনি কতগুলি ক'লকাতার রাস্তার দৃশ্য এঁকেছেন যার ভেতর নগরীর কর্ম-চাঞ্চল্য সুনিপুণভাবে ফুটে উঠেছে। তাঁর আঁকা কয়েকটি জন্তুর ড্রইংও দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। বিশেষ ক'রে গত মন্বন্তরের কয়েকটি ছবি হৃদয়কে খুব গভীরভাবে নাড়া দেয়। সবদিক দিয়ে গোপাল ঘোষের আঙ্গিকের পরিচয় দিতে হলে বলতে হয় যে তাঁর চিত্রগুলি ছন্দমুখর, দ্বিধাহীন, নির্ভীক ও সংযত রেখার কতগুলি মুহূর্তের রূপায়ন। তাঁর ছবি আঁকার ভঙ্গীর মধ্যে হয়ত কোথাও কোথাও চৈনিক শিল্পীর প্রভাব দেখতে পাই, তা হলেও, একথা স্পষ্ট যে গোপাল বাবু একান্তভাবে ভারতীয় ও আধুনিক। সার্থক রূপ-কর্মী হিসাবে গোপাল ঘোষের ভিতর আমরা আরও বলিষ্ঠ সমাজ-চেতনা ও জাগ্রত শিল্প-প্রচেষ্টা দেখ্‌তে আশা করি।

* * *

সরকারী আর্ট্‌ স্কুলের বার্ষিক চিত্র প্রদর্শনীতে স্কুলের বর্তমান ও প্রাক্তন ছাত্রদের এবং শিক্ষকদের সাম্প্রতিক শিল্পকর্মের পরিচয় দেওয়া হয়ে থাকে। এ প্রদর্শনীতে একটা গতানুগতিকতার ছাপ সাধারণত দেখা যায়। এবারও যে তার ব্যতিক্রম ঘটেছে, তা বলা চলে না। ছাত্রেরা বিভিন্ন শিল্প-আঙ্গিকের কতকগুলি বিশেষ বিশেষ নিয়ম চর্চা করে যাচ্ছেন বলেই মনে হয়। অবশ্য কেউ কেউ যে সেই বাঁধাধরা নিয়মকানুনগুলোর ব্যবহারিক গণ্ডীর মধ্যে থেকেও ছবিতে তাঁদের নিজস্ব চারিত্রিক গুণগুলি ফুটিয়ে তুলতে পেরেছেন তা সত্য। স্কুলের বাইরে কিন্তু বাংলার চিত্রকররা (এই দলে অনেক প্রবীণ প্রতিষ্ঠাবান শিল্পীও আছেন) গত কয়েকবছর ধরে নতুন শিল্প সৃষ্টি ও শিল্প আন্দোলনের পরিচয় দিচ্ছেন। তাঁরা দেখাচ্ছেন, এ দেশীয় নিজস্ব লোকস্তরের শিল্পাদর্শের পুনঃগ্রহণের দ্বারা রেখাবিন্যাসকে সুডৌল অথচ বলিষ্ঠ একটা গতি দান করা যেতে পারে। টেম্পেরা ঢংএ দেশজ রঙের বিচিত্র প্রয়োগেও পরিপ্রেক্ষিতের সঙ্গে মূল দ্রষ্টব্যের স্থানিক বিরোধ ঘটিয়ে অভিনব চিত্র-কল্পের আবিষ্কার করা যায়। সর্বোপরি, চিত্রের আবেদনকে দর্শক সাধারণের মনে সংক্রামিত করে দেবার কাজে সহজ ও সরল বিষয়বস্তু নির্বাচন অন্যায় নয়। এই আন্দোলনের ঢেউ সরকারী আর্ট্‌ স্কুলে সাড়া জাগাতে পারে নি। সাধারণ দর্শক

হিসাবে আমরা বিস্মিত হয়েছি প্রায় সমস্ত ছবিরই বিষয়বস্তুর সাধারণত্ব দেখে। যুদ্ধাগত নানা দুর্বিপাক, দুর্ভিক্ষ, মহামারী ও উপনিপাত খুব কম শিল্পীকেই তাঁদের চিত্রের বিষয়বস্তুর খোরাক যোগাতে পেরেছে। অতিবিদগ্ধ শিল্প-রসিকেরা হয় ত সে সব দেখেই বরং বিরক্ত হন, কিন্তু আমরা সাধারণ দর্শক হিসাবেই কথা বলছি। জনতার বিচিত্র দৈনন্দিন জীবনের থেকে বিষয়বস্তু নির্বাচন ক'রে নিয়েছেন এবং স্বাধীন পদ্ধতিতে তাকে সার্থক শিল্পরচনায় রূপান্তরিত করেছেন, এ রকম কয়েকজন শিল্পীর কাজ এই প্রদর্শনীতে অবশ্য দেখতে পাওয়া গেল; যেমন, মুরলীধর টালি, সফিউদ্দিন আহ্‌মেদ, সত্যেন্ ঘোষাল, জয়নুল আবেদীন প্রভৃতি। কিন্তু তাঁরা সংখ্যায় এত কম যে, দর্শক যদি অত্যন্ত তীক্ষ্ণ-দৃষ্টি না হন, তা হলে বড় বেশী স্খলিত রেখার বলয়িত ভঙ্গি, জল রং-এর ওয়াশ দেওয়া অস্পষ্ট কুয়াসাচ্ছন্নতা অথবা তৈলচিত্রের উচ্চকিত বর্ণ সমারোহের ভিড়ে তিনি এই সব শিল্পীদের অস্তিত্ব হয় ত উপেক্ষা করে যাবেন। বিশেষভাবে উল্লেখ করতে পারি মুরলীধর টালির ভিড়াক্রান্ত ট্রামগাড়ীর পাশে ভিখারিণীর কাঠখোদাইটি সম্বন্ধে।—এবারকার প্রদর্শনীতে উল্লেখযোগ্য বিষয়টি এই যে, ছাত্রদের এচিং, ড্রাই পয়েন্ট, তামার খোদাই প্রভৃতির দিকে ঝোঁক পড়েছে। কয়েকটি 'নিশ্চল বস্তু' বা ষ্টিল লাইফের চিত্রও লক্ষণীয়। অধ্যক্ষ রমেন্দ্রনাথ চক্রবর্তীর একটি পোর্ট্রেট উল্লেখযোগ্য।

সাধারণভাবে এবার কাঠখোদাই বিভাগের ছবিগুলিই দর্শকদের সবচেয়ে আকৃষ্ট করেছে। এর পরেই বোধ হয় পেন্সিল স্কেচ গুলিকে ধরা যায় জনপ্রিয়তার দিক থেকে। তৈলচিত্রগুলির মধ্যে সমর ঘোষের একটি শিল্পকর্ম রসিক সাধারণের বিশেষ প্রশংসা পেয়েছে। গৃহকপোতদেরকে আহার্যদানরতা একটি মেয়ে: সমস্ত ছবিটির কম্পোজিসনে ও রোম্যান্টিক রঙের ব্যঞ্জনায় এমন একটি intimate এবং স্নিগ্ধ ঘরোয়া সুর ফুটে বেরিয়েছে যে তা' দর্শকের মনকে স্পর্শ করে। ভাস্কর্যগুলি সংখ্যায় যেমন কম, তেমনি বৈশিষ্ট্যহীন; পোষ্টার প্রভৃতি অন্য দু'একটি বিভাগও তদনুরূপ।

বিচ্ছিন্নভাবে একাধিক ছবি ভাল লেগে থাকলেও, মোটের ওপর সরকারী আর্ট স্কুলের ছবির মেলা আমাদের মত সাধারণ দর্শক শ্রেণীকে অন্য যে কোন সাধারণ প্রদর্শনীর তুলনায় বেশী খুসী করতে পারে নি। আর গতানুগতিকতার ধারাও যেন থেকে যাচ্ছে।

* * * *

নাৎসী বিভীষিকার অন্ধকার থেকে ফ্রান্সের সংস্কৃতির ধারক ও বাহকদের সম্বন্ধে যে-

সমস্ত তথ্য ক্রমশ মুক্তির আলোয় বেরিয়ে আসছে তা যেমনি বিচিত্র তেমনি কৌতূহলোদ্দীপক।

একদিকে যেমন লুই আরাগঁ, পল এল্যুয়ার, আঁদ্রে মালরো, জঁ-পল সার্ত্র, কোলেৎ (গাব্রিয়েল গুদেকে) ও জঁ। ককতো-র মত প্রখ্যাত কবি, ঔপন্যাসিক ও নাট্যকারেরা আছেন—ফ্যাশিসমের বিরুদ্ধে এঁদের অনমনীয় প্রতিরোধ যেমন অবিস্মরণীয়, তেমনি অন্যদিকে লুই-ফের্দিনা সেলিন্ (লুই দেতুশ্), পল মোরাঁ এবং আঁরি গু মঁতেরলাঁ-র মত অভিজাত লিখিয়েরাও আছেন—যাঁরা জাতীয় দুর্যোগে স্বল্পপ্রাণ সুবিধাবাদীর দলে ভিড়েছেন প্রতিক্রিয়ার সঙ্গে পা-মিলিয়ে পিছু হেঁটে। আবার জঁ। মালাকে-র মত তৃতীয় আর একদল সাহিত্যিক-ও আছেন—যাঁরা প্রাণ নিয়ে আমেরিকা কি উত্তমাশায় পলাতক। অবশ্য প্রতিক্রিয়াশীল লেখকরাও আজকের নতুন ফ্রান্স থেকে পলাতক : সেলিন—জার্মান নাগরিক অধিকার চেয়ে না-পাওয়া সত্ত্বেও সম্ভবত পিছু হেঁটে জার্মানীতেই মুখ লুকোতে বাধ্য হয়েছেন; পল মোরাঁ—নাৎসী আমলে ছিলেন বুদাপেস্তে ভিসি গভর্ণমেণ্টের রাজদূত হিশেবে, এখন আছেন বার্ণে—আল্পসের চূড়োয়! আর দাম্ভিক মঁতেরলাঁ—বুকে অসংখ্য পদক ঝুলিয়ে প্যারির রঙ্গমঞ্চে আর তিনি হাজির হন না, আজকের স্বাধীন ফ্রান্সে তাঁর যে-কোনো নাটকের অভিনয় নিষিদ্ধ।

এর মধ্যে সবচেয়ে রোমাঞ্চকর প্রথম দলের লেখকদের গত কয়েকবছরের ইতিহাস। পল এল্যুয়ার—একদা সুররিয়েলিষ্ট কবি, এখন কমিউনিষ্ট—ফরাসী গুপ্ত প্রতিরোধ-বাহিনীতে যোগ দিয়ে ইনি অসংখ্য নাৎসী-বিরোধী প্রচারপত্র লিখেছেন, একটি পত্রিকা চালিয়েছেন এবং অবশেষে নাৎসী গোয়েন্দার হাত এড়াতে এমন একটি পাগলাগারদে আশ্রয় নিতে হয়েছে এঁকে যেখানে ডাক্তার এবং নার্সরা গোপনে আহত 'মাকিস্' ফরাসীদের তত্ত্বাবধান করতেন। আঁদ্রে মালরো ও জঁ-পল সার্ত্র—এঁরা উভয়েই প্রতিরোধ-বাহিনীতে যোগ দিয়েছেন, আহত অবস্থায় জার্মানদের হাতে বন্দী হয়েছেন, এবং ফ্রান্সের মুক্তির পর এখনও এঁরা পশ্চিমী ফ্রণ্টে যুদ্ধে লিপ্ত; মালরো এখন কর্ণেলের পদাধিকারী। এঁরা দু'জনেই এই সময়ের মধ্যে কয়েকটি উপন্যাসও লিখেছেন। ফ্রান্সের বিখ্যাত সুররিয়েলিষ্ট সিনারিয়ো-লেখক ও নাট্যকার জঁ। ককতো ফ্যাশিষ্ট-পন্থীদের একটি কুচকাওয়াজে সেলাম করতে রাজি না-হওয়ায় দুর্বৃত্তেরা তাঁর নাক ভেঙে দিতে কুণ্ঠিত হয় নি। এ-ছাড়া লুই আরাগঁ তাঁর কয়েকটি ঘনিষ্ঠ সাহিত্যিক-বন্ধুর কথা জানিয়েছেন—নাৎসীরা যাঁদের গুলি ক'রে মেরেছে।

এ-প্রসঙ্গে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য সাহিত্যিক হলেন লুই আরাগঁ—যাঁর ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী চেতনা জীবনের প্রতি গভীর প্রেরণার রূপ নিয়েছে তাঁর সৃষ্টির বহুলতায় ও ব্যাপকতায় ;—গত চার বছরের সাহিত্যে তাঁর দান : সাতখানি কবিতাগ্রন্থ, একটি উপন্যাস, একটি জীবনকাহিনী, তিনটি নাৎসী-বিরোধী বই এবং এ-ছাড়া অসংখ্য প্রচারপত্র আর ম্যানিফেস্টো ! এই আশ্চর্য খবরটি আমরা উপহার দিলুম আমাদের সেই সমস্ত বন্ধুদের— সাহিত্যের উন্নাসিক ছুৎমার্গে আস্থা রেখে ফ্যাশিষ্ট-বিরোধী সাহিত্যকে এখনও যাঁরা 'না-ধর্মী' ব'লে প্রচার করেন।

* * *

মাসখানেক পূর্বে একদিন হিসাব নিয়ে দেখেছিলাম, কলিকাতায়ই আটটি স্বতন্ত্র ছাত্র প্রতিষ্ঠান আছে। সম্ভবত সব কয়টিই "নিখিল ভারতীয়", অন্তত প্রত্যেকটিই প্রত্যেকটির সঙ্গে কলহে ব্যাপৃত। এমনি সময়ে এবার বড়দিনে ক'লকাতার 'নিখিল ভারতীয় ছাত্র ফেডারেশনের' সম্মেলন হল। উদ্যোগে আয়োজনে, ছাত্র সমাবেশে ও নেতৃ-সমাগাম এবং জন-প্রিয়তায় এ সম্মেলন যেরূপ সার্থক অনুষ্ঠান হয়েছে, তা দেখে কিন্তু আমরা বিস্মিত হয়েছি। সত্যই কি ছাত্রদের বহু-বিজ্ঞাপিত স্বাতন্ত্র্য ও কলহটা তা হলে তত বড় ব্যাপার নয় ? না, তাদের মিলনের শুভ ইচ্ছা আবার জাগ্রত হচ্ছে ? সম্মেলনের মূল প্রস্তাব দুটি থেকেও আমরা এই শুভবুদ্ধির সন্ধান পাই। একটি প্রস্তাবে বলা হয়েছে—এ যুদ্ধকে 'জনযুদ্ধ' বলে ছাত্র সম্মেলন চালাতে চায় না। এই কথা নিয়েই সাধারণের মধ্যেও আলোচনা হয়েছে বেশি। যুদ্ধের রূপ কি, তা নিয়ে তর্কটা অনেক সময়েই দেখেছি নিতান্ত শব্দগত হয়ে দাঁড়ায়। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডুও এই সূত্রে ছাত্রদেরকে ঠিক এই কথাটিই বলেছেন। কেউ 'জনযুদ্ধ' বলতে যা বোঝেন, অন্যে 'জনযুদ্ধ' বলতে বোঝেন তার থেকে ভিন্ন জিনিস। কাজেই অনেক সময়েই এরূপ ক্ষেত্রে তর্ক হয় অর্থহীন, শব্দের উৎপীড়নে বা টিরানি অব্ ওয়ার্ডস্-এই মাত্র ভুগতে হয়। তা ছাড়া, যুদ্ধের রূপ কি তা নিয়ে যখন তর্ক চলছে, যুদ্ধের রূপ তখন শত্রু-মিত্রের দ্বন্দ্বের মধ্য দিয়ে একভাবে পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে ফ্রান্সে, ইতালিতে, যুগোশ্লাবিয়ায়, স্পষ্ট হতে চাইছে পোলাণ্ডে গ্রীসে, বেলজিয়ামে, এমন কি চীনে পর্যন্ত। ছাত্ররা তর্ক ছেড়ে দিয়ে তাই ভালোই করেছেন। কিন্তু তাঁদের যে উদ্যোগ আমরা বিশেষ শুভ বলে মনে করি, তা প্রধানত অন্য প্রস্তাব—দেশের শিক্ষা দীক্ষার পুনর্গঠনের চেষ্টা। যুদ্ধে নাকি প্রথম মারা পড়ে সত্য। দুর্ভিক্ষে আর মহামারীতে এদেশে প্রথম মারা পড়েছে মাষ্টার ও ছাত্র। ইস্কুল-পত্র কি হয়েছে ঠিক নেই, সমস্ত বাংলাদেশের শিক্ষা ও সংস্কৃতি মুছে যেতে বসেছে। ছাত্রদের

প্রস্তাবে আমরা তবু শুভ সংকল্পের অভাস দেখি। অবশ্য, ছাত্ররা তাঁদের জাগ্রত দৃষ্টির প্রমাণও এই সম্মেলনে দিয়েছেন—তাঁদেব সংস্কৃতি অনুষ্ঠানেব মধ্য দিয়ে। অনেক 'আর্টের অবদান' আমরা ক'লকাতায় দেখি; বাস্তববোধও আজ অনেক শিল্পীব দানে দেখতে পাই। কিন্তু এক সঙ্গে ভাবতবর্ষের নানা প্রান্তেব লোককলার এমন বলিষ্ঠ সমাবেশ ইতিপূর্বে একসঙ্গে দেখেছি বলে মনে পড়ছে না। জাবি নৃত্য, নাগা নৃত্য, গুর্খাগান, কথাকলি নৃত্য, "নবজীবনের গান",—সব মিলে এই সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানটিকে এক বিরাট বৈশিষ্ট্য দান কবেছে। আমাদের বিবেচনায়—এই সম্মেলনের দৃষ্টিভঙ্গী ও সংগঠনশক্তির একটি সুন্দর পরিচয় পাওয়া গিয়েছে এই সাংস্কৃতিক উদ্যোগেই।

* * * *

বাংলা দেশের ছাত্রদের প্রশংসা কবতে হয়। নিখিল ভারতীয় ছাত্র সম্মেলনে নানা প্রদেশের সাংস্কৃতিক নিদর্শন উপস্থিত করা হয়েছিল। বাঙালী ছাত্র ও শিল্পীরা অন্য একটি নতুন জিনিসও সেখানে উপস্থিত কবেন—Bengal Painter's Testimony—'বাঙালী শিল্পীর স্বাক্ষর।' সাতাশ জন বাঙালী শিল্পীব ত্রিশ খানি চিত্রের এই গ্রন্থ সত্যই ছাত্রদেব শিল্পানুরাগের প্রমাণ, আব বহু বাঙালী আবাঙালী শিল্পরসিকেব আনন্দের কারণ। শ্রীযুক্তা সরোজিনী নাইডু তাঁব স্বাভাবিক ভাষায় এই চিত্রপঞ্জীব একটি প্রশস্তি লিখে দিয়েছেন, শ্রীযুক্ত বিষ্ণু দে স্বল্প ও সংযত ভাষায় শিল্পীদের পরিচয় সূচক একটি সুন্দর 'ভূমিকা' লিখেছেন। অবশ্য আসল আকর্ষণ হল শিল্পী ও তাঁদের চিত্রমালা। এই শিল্পীদের মধ্যে আছেন—রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ, নন্দলাল, যামিনী রায়, অসিত হালদার প্রভৃতি গুরুরা, দেবীপ্রসাদ, রমেন্দ্রনাথ, বিনোদবিহারী প্রভৃতি অধ্যক্ষরা, আব তরুণ শিল্পী ছাত্রবা পর্যন্ত—সৈফুদ্দীন, চিত্তপ্রসাদ পর্যন্ত। এত কৃতীর এমন একত্র সমাবেশ আমরা দেখি একমাত্র প্রদর্শনীতে, কিন্তু তা ঘরে বসে বসে দেখা যায় না। এই গ্রন্থে আমাদের সেই সুযোগও লাভ হবে। অবশ্য নানা অসুবিধায় কোনো কোনো শিল্পীর নিদর্শন দেওয়া সম্ভব হয় নি—যেমন গগনেন্দ্রনাথের চিত্র নেই। কিন্তু তবু সম্পাদকদের উদ্যম ও উদ্যোগের প্রসংশা করতে হবে। এ দিনে এরূপ অল্প সময়ের মধ্যে এতগুলো বহুবর্ণ ও এক বর্ণের চিত্র মুদ্রণ করাও কম কথা নয়। তাতে মুদ্রণালয়দের কৃতিত্ব আছে। কিন্তু ছাত্রদের প্রয়াস সার্থক হয়েছে আসলে শিল্পীদের দানে—তাঁরা বিনা দক্ষিণায় নিজেদের সৃষ্টি ছাত্রদের হাতে তুলে দিয়েছেন। এ জন্য ছাত্রদের মতই দর্শক সমাজও তাঁদের কাছে কৃতজ্ঞ থাকবেন।

নবান্ন

নবান্নের অভিনয় এতই চমৎকার হইয়াছে যে, আমি যে নগরের রঙ্গালয়ে বসিয়া অভিনয় দেখিতেছি তাহা ভুলিয়াই গিয়াছিলাম। হাবভাব, চালচলন, বাগ্‌বিন্যাশ, উচ্চারণভঙ্গী এমনকি আকৃতি প্রকৃতিতে এমন যথাযথতা কোন অভিনয়ে দেখিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। আমরা পাড়াগাঁয়ের লোক। আমরা কাঙাল চাষীদেরই প্রতিবেশী। কাজেই যথাযথ হইল কিনা বলিবার অধিকার আমাদেরই আছে—চির নগরবাসীদের নাই।

এই অভিনয় দেখিতে গিয়া আর একটা কথা মনে হইয়াছে। নগরের শিক্ষিত যুবক যুবতীরা নাগরিক বেশ ত্যাগ করিয়া চাষা-চাষাণীর বেশ ধারণ করিয়াছিল। মনে হয় নাই তাহারা চাষা-চাষাণীর ভূমিকা গ্রহণ করিয়াছে। ইহাতে মনে হইয়াছে—গরীব, দুঃখী, চাষা-চাষাণী ও নগরের যুবকযুবতী একই জাতির লোক—অঙ্গপ্রত্যঙ্গের আকৃতি প্রকৃতিতে কোন বৈষম্য নাই। কেবল জামা জুতা চশমা ঘড়ি চুরুট সিগারেট ইত্যাদিই পল্লী ও নগরের মধ্যে একটা কৃত্রিম ব্যবধান সৃষ্টি করিয়াছে—দর্জি ও ধোবা একই জাতির লোককে এতটা পৃথক করিয়া রাখিয়াছে। এই পুরাতন সত্যকেই সেদিন হারাধনের মত যেন ফিরিয়া পাইলাম।

বহু কাব্য উপন্যাসের মধ্য দিয়া বাংলার দুঃস্থ দুর্গত পল্লীজীবনের চিত্রের সাক্ষাৎ পাইয়াছি; কিন্তু তাহাকে আমার তটস্থ উদাসীন সাহিত্যিক মন বিচলিত হইয়া আমার নেত্রযুগলে বাষ্পের সৃষ্টি করিতে পারে নাই। নবান্নের অভিনয় দেখিতে গিয়া আমি অশ্রু সংবরণ করিতে পারি নাই। এই অশ্রু অলস বাষ্প মাত্র নয়—সঙ্গে সঙ্গে হৃদয়ে একটা অকপট কল্যাণ বুদ্ধির উন্মেষ হইয়াছে। মনে হইয়াছে এই দুঃস্থ দুর্গতগণের জন্য আমার যতটুকু করিবার ছিল তাহা করা হয় নাই। এ জন্য অনুতাপ জন্মিয়াছে—নিজেদের আরাম বিলাসের হৃদয়হীন জীবনযাত্রার প্রতি ধিক্কার জন্মিয়াছে—ভবিষ্যতে আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু করিবার জন্য সংকল্পও জাগিয়াছে। তাহা ছাড়া দেশ, সমাজ রাষ্ট্র, অর্থনীতি, ধর্ম্ম, কৃষিশিল্প ইত্যাদি সম্বন্ধে নানা চিন্তার উদ্ভব হইয়াছে। মোটের উপর নবান্ন আমার হৃদয় ও মস্তিষ্ককে আমূল আলোড়িত করিয়াছে। এ সমস্তই সাময়িক সন্দেহ নাই—কিন্তু মনের উপর একেবারে কোন ছাপ রাখিয়া যায় নাই তাহা

মনে হয় না। আজ একমাস অতীত হইল এখনো আমার মন হইতে নবান্নের ছায়া অপসারিত হয় নাই।

নবান্ন অভিনয় দেখিয়া সুখী হইয়াছি। নবান্নকে একটি পরিপূর্ণাঙ্গ নাটক না বলিয়া ইহাকে একখানি দৃশ্যকাব্য বলিতে চাই। ইহাতে গীতিধর্ম্ম অপেক্ষা চিত্রধর্ম্মই অধিকতর পরিস্ফুট হইয়াছে। ইহা কতকগুলি জীবন্ত জ্বলন্ত প্রাণস্পর্শী দৃশ্যের একত্র গ্রন্থণ, খাঁটি বাংলার জীবন সূত্রে, পঞ্চাশের মন্বন্তরের আবহাওয়ায়।

মাটির যাহারা খাঁটি মালিক—আসল বাংলাদেশ যাহাদের সুখদুঃখের মধ্যে অবিরাম স্পন্দিত হইতেছে তাহাদের উপেক্ষিত জীবনযাত্রা লইয়া রচিত নাটক বাংলা সাহিত্যে এই বোধ হয় প্রথম। এই নাটক পূর্ব্ববর্ত্তী কোন নাটকের অনুকৃতি নয়। ইহার বিষয় বস্তুগত মৌলিকতার দাবি অস্বীকার করিবার উপায় নাই। নবযুগের নাট্য সাহিত্যের ইহা অগ্রদূত।

আমরা নানা প্রবন্ধে, সংবাদপত্রে, কবিতায় ও উপন্যাসে দেশের মর্ম্মস্থলের কিছু কিছু পরিচয় পাইয়াছি কিন্তু সে পরিচয় একটা কোন-না-কোন পর্দ্দার মধ্য দিয়া। নবান্ন রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া আমাদের সম্মুখে দেশের মর্ম্মস্থলকে প্রত্যক্ষভাবে উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে।

শ্রীকালিদাস রায়

(২)

'শ্রীরঙ্গম' মঞ্চে শ্রীযুক্ত বিজন ভট্টাচার্য-রচিত 'নবান্ন' নাটকের অভিনয় বাংলাদেশের একাধিক রসজ্ঞ সাহিত্যিকের মনকে কি-রকম গভীরভাবে স্পর্শ করেছে তার প্রমাণ গত সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত স্বর্ণকমল ভট্টাচার্যের ও এই সংখ্যায় প্রকাশিত শ্রীযুক্ত কালিদাস রায়ের চিঠি। এই দ্বিতীয় চিঠিটির সম্বন্ধে আমাদের বক্তব্য কিছুই নাই, কিন্তু স্বর্ণকমল বাবু তাঁর চিঠিতে গত কার্তিক সংখ্যায় সংস্কৃতি-সংবাদ প্রসঙ্গে 'নবান্ন'-সম্পর্কিত যে-সামান্য একটু মন্তব্য প্রকাশিত হয়েছিল তাকে সম্পাদকীয় অভিমত গণ্য ক'রে যে-প্রশ্নগুলি উত্থাপন করেছেন সেগুলির আলোচনার প্রয়োজন আছে।

সর্বপ্রথম স্বর্ণকমল বাবুকে ও পরিচয়ের পাঠকগণকে এই কথা জানানো দরকার যে কার্তিক সংখ্যায় প্রকাশিত 'নবান্ন' সম্বন্ধে মন্তব্য বিনা স্বাক্ষরে ছাপা হ'লেও প্রকৃতপক্ষে পরিচয়-কর্তৃপক্ষের সরকারী অভিমত নয়। ঐ অভিমতের সম্পূর্ণ দায়িত্ব আমার একলার। এই প্রসঙ্গে পাঠকদের আরো জানানো দরকার যে সাহিত্য বা

সংস্কৃতি-সংক্রান্ত ব্যাপাবে পরিচয়ের সম্পাদকদ্বয় যে সব সময়ে একমত হবেন এই কথা ধ'রে নেওয়ার কোনো হেতু নাই ; অনেক সময়ে হয়তো দুই সম্পাদকের মত এক হবে, কিন্তু আবার অনেক ক্ষেত্রে তাঁদের মত একেবারে ভিন্ন হবার যথেষ্ট সম্ভাবনা আছে। তার কাবণ এই যে যদিও মোটামুটি ভাবে পরিচয় পত্রিকা একটি বিশেষ দার্শনিক দৃষ্টিভঙ্গীর দাবি রাখে, সাহিত্যক্ষেত্রে এই মনোবৃত্তির পরিচায়ক এমন কোনো নির্দিষ্ট কাঠামো আজ পর্যন্ত রচিত হয় নি যাতে ব্যক্তিগত মতামত পুরোপুবি নিয়ন্ত্রিত হ'তে পাবে। অবশ্য এই মতও সম্পূর্ণ আমার স্বকীয়। যদি কেউ ঐ জাতীয় নির্দিষ্ট কাঠামোব সন্ধান পেয়ে থাকেন, এই পত্রিকার পাতায় তার বিবরণ আমবা আগ্রহের সঙ্গে প্রচার করব। তবে আপাতত পাঠকদের জেনে রাখা ভালো যে পবিচয়-সঙ্ঘ বা পরিচয়েব পবিচালক বা সম্পাদকেব সংস্কৃতি সংক্রান্ত বিশেষ বিশেষ প্রসঙ্গে সবকাবী মতামত কিছু নাই—অবশ্য মোটামুটি একটা দৃষ্টিভঙ্গী আছে।

ইতি ভূমিকা। অতঃপর স্বর্ণকমল বাবু যে আলোচনা উত্থাপন করেছেন তাতে যোগদান করা যেতে পারে। স্বর্ণকমল বাবু ধরে নিয়েছেন আমি 'নবান্ন' একেবাবেই অক্ষম নাটক সবাসরি এই রায় দিয়েছি। আসলে ঠিক এই ধরণের রায় দেওয়া আমার উদ্দেশ্য ছিলনা, আমি শুধু বলতে চেয়েছিলাম 'নাটক' হিসাবে নবান্ন সক্ষম বচনা এই কথা একেবারেই বলা চলেনা, অর্থাৎ 'একেবাবেই' কথাটির জোর পড়ছে 'বলা' চলেনা'ব উপর, 'সক্ষম নয়'-এব উপব নয়। অনিচ্ছায় ও অনিবার্য কারণে অত্যন্ত সংক্ষেপে ব্যক্ত করাব ফলে আমাব উক্ত মত যে অশোভন ভাবে রূঢ় শোনায় তাতে সন্দেহ নাই। প্রথম আপত্তি ওঠে এখানে। স্বর্ণকমল বাবুর তবফ থেকে আপত্তির কাবণ আরো আছে। এই অক্ষম রচনা কি ক'রে আমার মতে নতুন আবহাওয়ার সৃষ্টি করল, শুধু সাহিত্য জগতে নয় বঙ্গমঞ্চেও? আমাব এই পরস্পর বিরোধী উক্তিতে বিভ্রান্ত হ'য়ে স্বর্ণকমল বাবু জানতে চেয়েছেন পরিচয় সম্পাদকেব, অর্থাৎ, এক্ষেত্রে, আমার প্রকৃত মত কি। অতএব, আমার প্রকৃত মত বিস্তারিত ভাবে ব্যাখ্যা করছি। আশা করি তা প'ড়ে স্বর্ণকমল বাবু ও পাঠকবর্গ বুঝবেন যে উক্ত মন্তব্যেব মধ্যে যে স্বতঃবিরোধিতা আপাতদৃষ্টিতে দেখা যায় তার কারণ 'নবান্ন' নাটকটির মধ্যেই এই বিরোধিতা থেকে গেছে। কেন, তা বুঝিয়ে বলছি।

'নবান্ন' নাটকের বহু ত্রুটি স্বর্ণকমল বাবু মেনে নিয়েছেন, কিন্তু এই ত্রুটিগুলি

কাটিয়ে উঠে 'নবান্ন' নাটকীয় সার্থকতা অর্জন করেছে এই তাঁর অভিমত। এইখানে স্বর্ণকমল বাবুর সঙ্গে আমার প্রবল মতদ্বৈধ। 'নবান্ন' বই আমি পড়িনি, কিন্তু অভিনয় দেখে যতদূর মনে হয় বহু উৎকর্ষ সত্ত্বেও নাটকীয় রচনা হিসাবে এর ত্রুটি এত গুরুতর যে 'নবান্ন' শেষ পর্যন্ত যথার্থ নাটকীয় সার্থকতা অর্জন করতে পারেনি।

অভিনয় দেখার এতদিন পরে এই নাটকটির সবগুলি ত্রুটির উল্লেখ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ বিচার সহজসাধ্য নয়। যে ত্রুটিগুলি বিশেষ ভাবে মনে পড়ে তারই উল্লেখ করছি। একেবারে প্রথম দৃশ্যে বিশেষ একটি গ্রামের ও সেই সঙ্গে সমগ্র দেশের যে-অবস্থা উদ্‌ঘাটিত হয় পরবর্তী দৃশ্যগুলির সঙ্গে তার সংযোগের সূত্র অতি ক্ষীণ। এ ক্ষেত্রে ত্রুটি শুধু নাট্যকারের নয়, পরিচালকেরও। আচম্‌কা কতকগুলো লোমহর্ষক ব্যাপার ঘটল, পরের ঘটনাপ্রবাহে থাকল তার অস্পষ্ট রেশমাত্র। অর্থাৎ নাটকটির সূত্রপাতে এমন একটি রহস্য থেকে গেল যার সমাধান শেষ পর্যন্ত পাওয়া গেলনা।

কিন্তু তবু অভিনয় জম্‌ল, লেখকের মর্মস্পর্শী আলেখ্য অবলম্বন ক'রে, অভিনেতা-অভিনেত্রীদের নৈপুণ্য ও পরিচালক প্রযোজকের শক্তিশালী পরিকল্পনার ফলে। মাঝে মাঝে স্খলন হয়েছে, যদিও গুরুতর নয়, যথা ঃ

ছোট বৌর গায়ে হাত তোলার অপবাদ দিয়ে বড় ভাই নিরপরাধ ছোট ভাইর উপর যে-ভাব গগনভেদী মারণ ও তাড়ন লীলা প্রকট করলেন তাতে ছোট বৌর মুখ বুঁজে থাকা ভাসুর ভাদ্র বৌর সলজ্জ সম্পর্কের দোহাই দিয়েও অত্যন্ত অস্বাভাবিক, বিশেষত চাষীর ঘরে।

'তোরা যা, আমি যাবনা' বেসুরো গলায় এই সুরোৎপাদন প্রচেষ্টা খুব শোভন হয়নি; ততোধিক অশোভন এই সঙ্গে নট ও নটীর তথা ভিক্ষুক ও ভিখারিণীর তালে তালে পা ফেলে নিষ্ক্রমণ। এই দৃশ্যে অশোভনতার চরম করুণ বংশী-বিলাপ। খেলো সিনেমা আঙ্গিকের এই অনুকরণ নবান্নের আসরে একেবারেই অপাংক্তেয়।

রিলিফ হাঁসপাতালের পরিবেশে ডাক্তারটির ছিম্‌ছাম্‌ পোষাক ও চাঁচাছোলা মুখস্থ-করা কেতাবী বয়েৎ সমান বেমানান্‌। এক সত্যিকারের ডাক্তার নাকি এই ভূমিকায় নেমেছিলেন। এ কথা সত্য হলে, তাঁর পোষাকও বুলি দুই-ই কিঞ্চিৎ অভিনয়-দুরস্ত ক'রে নেওয়া উচিত ছিল।

এই জাতীয় ত্রুটি হয়তো আরো দু একটি আছে। এখন তার সঠিক বর্ণনা আমার অসাধ্য। যাই হোক, এগুলি গৌণ ত্রুটি—অত্যন্ত গৌণ। নবান্নের নাটকীয় সম্পূর্ণতাকে

এবা অতি সামান্যই ক্ষুণ্ণ করেছে। নবান্নের দুর্বলতম অংশ শেষ দৃশ্য। এই দৃশ্যে গ্রন্থকার যে-ভাবে তাঁব উদ্ভাবিত সমস্যা সমাধানের চেষ্টা করেছেন তা শুধু রোম্যান্টিক ও অবাস্তব নয়, নাটকটিব পূর্বাংশেব সঙ্গে একেবারে সঙ্গতিহীন। মাবী ও দুর্ভিক্ষে যে গ্রাম ছারখার হয়েছে ও এই প্রচণ্ড দৈবতবিভীষিকা যথেষ্ট নয় মনে ক'রে গ্রন্থকার যে-গ্রামকে বন্যা দিয়ে বিধ্বস্ত না ক'বে খুশী হন নি, ঠিক সেই গ্রামে সেই প্রধানের কুটিব-প্রাঙ্গনে অক্ষত দেহে ফিরে এল একটির পব একটি গ্রামত্যাগী দুঃস্থ যারা দুদিন আগে শহরেব পথেব ডাষ্ট-বিন্ হাতড়ে খুঁজছে জীবনধারণের শেষ সম্বল। বৃদ্ধ প্রধান পর্যন্ত এই মিলনান্ত দৃশ্য থেকে বাদ পড়লেন না, তাঁব মাথা গেল বিগড়ে কিন্তু আশী বছরেব প্রাচীন দেহ কায়কল্প চিকিৎসা না ক'বেও শেষ পর্যন্ত রইল অক্ষম! মাঝখান থেকে মাবা গেল একটি অসহায় শিশু, তাও গ্রাম-ত্যাগের আগেই। লেখকের এই শিশু হত্যাব প্রবৃত্তি—পূর্বনাটক 'জবানবন্দী' স্মরণীয়—তাঁর কলমেব পক্ষে মোটেই স্বাস্থ্যকর নয়। এব ফলে সাময়িকভাবে যে করুণ রসের সৃষ্টি হয় নাটকের ঘটনাবিরচনে তা' প্রায় অবান্তর।

কিন্তু, নাটক হিসাবে নবান্নের এই গুরুতর ত্রুটি সত্ত্বেও অভিনয় ও পরিচালনায় অসাধারণ উৎকর্ষের ফলে 'নবান্ন' দেখে আমি মুগ্ধ না হয়ে পারিনি, যেমন আরো বহু দর্শক হয়েছেন। এর ফলেই কথা উঠে—স্বর্ণকমল বাবু যার উল্লেখ করেছেন—একটি অক্ষম নাটককে অবলম্বন ক'রে অভিনয় ও প্রযোজনাব এতখানি কৃতিত্ব কি সম্ভব? এর উত্তরে আমার প্রথম বক্তব্য এই যে তা' যদি না সম্ভব হ'ত তাহলে বাংলাদেশে শিশিব ভাদুড়ীর মতন অভিনেতাব অভ্যুদয় হল কি উপায়ে? 'সীতা' বা আলমগীব'কে যদি সক্ষম নাটক বলতে হয় তা'হলে অক্ষম নাটক কাকে বলে জানিনা। আরো দৃষ্টান্ত দিতে পারি, কিন্তু দরকার বোধ করছি না।

আমার দ্বিতীয় বক্তব্য এই যে 'নবান্ন' নাটক হিসাবে—'নাটক' কথাটির উপর বিশেষ জোর দিয়ে বলছি—অক্ষম হলেও 'সীতা' বা 'আলমগীর'-এর মতন নিম্নশ্রেণীব রচনা নিশ্চয়ই নয়। 'নবান্ন' অক্ষম শুধু এই কাবণে যে এর শেষ অংশ পূর্ববর্তী অংশগুলি থেকে একেবাবে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে, ঐ অংশগুলিতে ঘটনাবিবর্তনের যে সূত্র পাওয়া যায় শেষ দৃশ্যে এসে তা' একেবারে তালগোল পাকিয়ে গেছে, ফলে নাটকটির স্বাভাবিক পরিণতি হয়েছে একেবারে পণ্ড। কিন্তু শেষ দৃশ্যটি বাদ দিলে যা বাকি থাকে তাকে যদিও সম্পূর্ণ নাটক বলা চলে না তবু একাধিক কারণে তা' নিঃসন্দেহ অসাধারণ রচনা। কেন অসাধারণ সে কথা স্বর্ণকমল বাবু ও কালিদাস বাবু দুজনেই বলেছেন ও এ বিষয়ে আমি তাঁদের সঙ্গে একমত; তাঁদেব সঙ্গে বিবোধ এই যে আমি নবান্ন দেখেছি শুধু সমঝদাবের দৃষ্টিতে নয়, সমালোচকেবও, তাই শেষ দৃশ্যের অসংগতি আমার চোখ এড়ায়নি।

কিন্তু এই শেষ দৃশ্যই আবার অন্যান্য পাঁচজনের মতন আমারও চোখে বোধ হয় সব চাইতে ভালো লেগেছে। এই দৃশ্যে রঙ্গমঞ্চে অবতীর্ণ হয়েছে পুরো একটি জনতা। এতগুলি লোককে ষ্টেজে নামালে গণ্ডগোলেব সৃষ্টি হওয়া খুবই স্বাভাবিক, বহুক্ষেত্রে হয়েও থাকে

তাই। এ ক্ষেত্রে কিন্তু এতগুলি লোককে যে ভাবে বাগ মানানো হয়েছে তাতে এই দৃশ্যা
পরিচালনায় ও পরিকল্পনায় অসাধারণ বাহাদুরির তারিফ না ক'রে পারা যায় না
এই বাহাদুরির ভাগীদার হিসাবে অন্যতম পরিচালক বিজন বাবুকে তাঁর প্রাপ্য দিতে
আমি একটুমাত্র কুণ্ঠিত হব না, যেমন হবনা অভিনেতা হিসাবে তাঁর প্রশংসা করতে
জায়গায় জায়গায় মনে হয়েছে যে বিজন বাবুর অভিনয়ে একটু যেন আতিশয্য এসেছে
কিন্তু এ সম্বন্ধে আমার মনে যথেষ্ট দ্বিধা আছে।

মোট কথা এই যে যদিও বিজন বাবু একটি সক্ষম নাটক লিখে উঠতে পারলেন না,
অর্থাৎ যে প্রতিশ্রুতি পাওয়া গেল নাটকটির প্রথম দিকে শেষ পর্যন্ত তা গেল ভেস্তে, ত
এমন একটি নাটক রচনার চেষ্টা তিনি করেছেন যা শুধু চেষ্টার গুণেই স্মরণীয়। অব
গুণ শুধু চেষ্টার নয়। সংলাপে, বিষয়বস্তুতে, ঘটনা-সমাবেশে, বিজন বাবুর কলম
কল্পনা এতদূর এগিয়েছে যে বাংলা রঙ্গমঞ্চে ও বাংলা সাহিত্যে তিনি নতুন হাওয়া এনেছে
এই কথা না বললে তাঁর প্রতি অবিচার হবে। কিন্তু এই নতুন আবহাওয়ার স্রষ্টা এক
বিজন বাবু নন, তাঁর সঙ্গে ও তাঁর পেছনে রয়েছে গণনাট্যসঙ্ঘ। এই সঙ্ঘের প্রেরণা
উদ্যম ছাড়া বাংলার রঙ্গমঞ্চে 'নবান্নের' অভ্যুদয় ছিল অসম্ভব। অভিনেতা অভিনেত্রীদে
অভিনয় কুশলতার উল্লেখ নিষ্প্রয়োজন, কেন না তা অবিসংবাদিত।

আরো একটু তর্ক থেকে গেল। স্বর্ণকমল বাবু, নবান্নকে নবাঙ্কুরের সঙ্গে তুলনা
ক'রে বলেছেন এর ত্রুটিগুলি 'অধিকাংশ তার birth-marks, নতুন ভুঁইফোড় নয়
নবাঙ্কুরের উপমাটি খুব জুৎসই মনে হয়না, কেননা পূর্ণ বৃক্ষে নবাঙ্কুরের দোষত্রুটি না বর্তি
পারেনা—এই হ'ল ইতিহাসের রীতি। কিন্তু ইতিহাসের দোহাই দিয়ে নবা
দোষত্রুটিকে birth-marks অর্থাৎ অনিবার্য বলে উড়িয়ে দেওয়া বা অন্তত মেনে নে
কি খুব সমীচীন? ইতিহাসের অমোঘ বিধানকে সাহিত্যিকের কলমের আগা
এইভাবে বিলম্বিত ক'রে সমালোচকের ভাত মারার চেষ্টা কি একটু বাড়াবাড়ি নয়
সে যাই হোক, এই কথা অবশ্যই স্বীকার করব 'নবান্ন' সত্যিকারের জননাট্যের পথ তৈ
ক'রেছে। এই খানেই তার মহত্তম স্বার্থকতা।

আমার শেষ কথা এই যে গণনাট্য সঙ্ঘ তাঁদের নামের সম্পূর্ণ উপযোগী নাটক আ
পর্যন্ত পেলেন না, কিন্তু তাতে তাঁদের অগ্রগতি বিন্দুমাত্র ক্ষুণ্ণ হয় নি। নিখুঁৎ গণনাট
রচনার আশায় বসে না থেকে উপস্থিত যা পাওয়া যায় তাই নিয়েই আসরে নাম
প্রয়োজন ছিল। গণনাট্যসঙ্ঘ সাহসের সঙ্গে আসরে নামলেন, বিজন বাবুও সাহসের সং
রচনা করলেন প্রথমে 'জবানবন্দী' ও পরে 'নবান্ন'। ঠিক গণনাটক বোধ হয় হল
কিন্তু ভবিষ্যতে যাতে পুরোদস্তুর গণনাটক হতে পারে তার অনুকূল আবহাওয়ার সৃ
হয়েছে। এখন গণনাট্য সঙ্ঘকে এগোতে হবে পরীক্ষণ ও বর্জনের মধ্য দিয়ে
'জবানবন্দী' বা 'নবান্ন' সার্থকতা অর্জন করল সাহিত্য হিসেবে নয়, গণনাট্য সঙ্ঘের এ
পরীক্ষণ ও বর্জনের পথকে প্রশস্ত করার জন্যে।

হিরণকুমার সান্যাল